আমাদের পরিবেশ

(পঞ্চম শ্রেণি)

সত্যমেব জয়তে

বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর । পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

ডি কে ৭/১, বিধাননগর, সেক্টর -২
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

Neither this book nor any keys, hints, comment, notes, meanings, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Books Act, 1977.

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১২
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৩
তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৪

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

পর্ষদ-এর কথা

নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণির 'আমাদের পরিবেশ' বইটি প্রকাশিত হলো। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' তৈরি করেন। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী 'আমাদের পরিবেশ' বইটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলি তৈরি করার ক্ষেত্রে 'জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫' এবং 'শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯' -এই দুটি নথিকে বিশেষভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা আর অন্বেষণ প্রক্রিয়াকে হাতেকলমে ব্যবহার করার যথেষ্ট পরিসর বইটির মধ্যে রয়েছে। শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দিয়ে কয়েকটি ভাবমূল (Theme)-কে ভিত্তি করে একদিকে যেমন বইটি রচিত, অন্যদিকে শ্রেণিকক্ষের চারদেয়ালের বাইরে যে বিশ্বপ্রকৃতির অবাধ ক্ষেত্র সেদিকেও শিক্ষার্থীর জানা-বোঝাকে সম্প্রসারিত করার প্রয়াস বইটিতে স্পষ্ট। আশা করা যায় বুনিয়াদি স্তরে শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান, সমাজ, ইতিহাস ও ভূগোল শিখনে পঞ্চম শ্রেণির 'আমাদের পরিবেশ' বইটি যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

একদল নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ বইটি প্রণয়ন করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। প্রখ্যাত শিল্পীবৃন্দ বিভিন্ন শ্রেণির বইগুলিকে রঙে-ছবিতে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

'আমাদের পরিবেশ' বইটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হবে। ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি কোণে বইটি যাতে যথাসময়ে পৌঁছে যায়, সেই ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার গ্রহণ করবে। বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের মতামত আর পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

জুলাই, ২০১৪

মানিক ভট্টাচার্য

সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন
ডি-কে ৭/১, সেক্টর ২
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০০৯১

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয়স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক - এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। আমরা এই প্রক্রিয়া শুরু করার সময় থেকেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ (NCF 2005) এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act 2009) এই নথি দুটিকে অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি আমাদের সমগ্র পরিকল্পনায় আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছি।

লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, '... শিখিবার কালে, বাড়িয়া উঠিবার সময় প্রকৃতির সহায়তা নিতান্তই চাই। গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, মুক্তবায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয়।' ('শিক্ষাসমস্যা') 'আমাদের পরিবেশ' পর্যায়ের বইগুলিতে আমরা উদার প্রকৃতির সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের সংযোগ তৈরি করার চেষ্টা করেছি। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রকৃতির সামনে নিয়মিত দাঁড়ায়, আমরা পাঠ্যপুস্তককে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছি। পঞ্চম শ্রেণি-র 'আমাদের পরিবেশ' বইটিতে একটি নির্দিষ্ট বিন্যাস রয়েছে। প্রকৃতি এবং মানবজীবনের বিভিন্ন সম্পর্ক এই বইয়ের মধ্যে বিধৃত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'আমাদের পরিবেশ' পর্যায়ের বইগুলিতে আমরা পরিবেশ পরিচয়ের সূত্রে বিজ্ঞান, ভূগোল এবং ইতিহাসের প্রাথমিক ধারণাগুলিকে সন্নিবিষ্ট করেছি।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তাঁদের নির্দিষ্ট কমিটি বইটি অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দফতর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভৃত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

অভীক মজুমদার

জুলাই, ২০১৪

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নিবেদিতা ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

পুস্তক নির্মাণ ও বিন্যাস

অধ্যাপক অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)　অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্যসচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

অধ্যাপিকা রত্না চক্রবর্তী বাগচী (সচিব, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ)

ড. দেবব্রত মজুমদার　ড. শীলাঞ্জন ভট্টাচার্য　ড. সত্যকিংকর পাল　ড. সন্দীপ রায়　অনির্বাণ মণ্ডল

দেবাশিস মণ্ডল　সুব্রত হালদার　সঞ্জয় বড়ুয়া　বুবি সরকার　তপন কুমার গোস্বামী

পরামর্শ ও সহায়তা

অধ্যাপক এ.কে. জালালউদ্দিন　শিরীণ মাসুদ　ড. দেবীপ্রসাদ দুয়ারী

অধ্যাপিকা মিতা চৌধুরী　পার্থপ্রতিম রায়　রুদ্রনীল ঘোষ

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস　ড. ধীমান বসু　সুদীপ্ত চৌধুরী

দেবব্রত মজুমদার　নীলাঞ্জন দাস　ড. শ্যামল চক্রবর্তী

অধ্যাপক সুমন রায়　প্রদীপ কুমার বসাক

পুস্তকসজ্জা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সমীর সরকার

প্রচ্ছদলিপি : দেবব্রত ঘোষ

সহায়তা : বিপ্লব মণ্ডল

বিশেষ কৃতজ্ঞতা : সুব্রত মাজী

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মানবদেহ	১-১৮
ভৌত পরিবেশ (মাটি, জল, জীববৈচিত্র্য)	১৯-৬১
পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ পরিচিতি	৬২-৮৩
পরিবেশ ও সম্পদ	৮৪-৯৭
পরিবেশ ও উৎপাদন (কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন)	৯৮-১১৯
পরিবেশ ও বনভূমি	১২০-১২৮
পরিবেশ, খনিজ ও শক্তি সম্পদ	১২৯-১৩৭
পরিবেশ ও পরিবহণ	১৩৮-১৪৮
জনবসতি ও পরিবেশ	১৪৯-১৫৮
পরিবেশ ও আকাশ	১৫৯-১৭১
মানবাধিকার ও মূল্যবোধ	১৭২-১৮০
আমার পাতা	১৮১-১৮২
পাঠ্যসূচি ও নমুনা প্রশ্ন	১৮৩-১৮৬
শিখন পরামর্শ	১৮৭-১৯০

এই পাঠ্যপুস্তক বিষয়ে কয়েকটি কথা

আমাদের শিক্ষাপ্রাণালীর রোগনির্ণয় ও তার চিকিৎসা বিষয়ে ১৮৯২ সালে 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন:

"ইহার প্রধান কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। ...একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমতো হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে ও স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।"

আমরা রবীন্দ্রনাথের এই রোগনির্ণয় ও চিকিৎসাবিধান মেনে এই 'পাঠ্যপুস্তক' তৈরি করার চেষ্টা করেছি। আমাদের আশা শিশু 'আনন্দের সহিত' এ-বই পড়বে। তাদের নিজেদের মধ্যে যেসব আলোচনা (কথা বলাবলি) করতে বলা হয়েছে তা 'আনন্দের সহিত' করবে। শ্রেণিকক্ষে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে তাদের কোলাহল ক্রমে তাদের আনন্দময় দলগত আলোচনায় রূপান্তরিত হতে থাকবে। পাড়ায় ও অন্যদের সঙ্গেও আলোচনা করবে 'আনন্দের সহিত'।

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫-এ বলা হয়েছে **"Intelligent guessing must be encouraged as a valid pedagogic tool. Quite often children have an idea arising from their everyday experiences, or because of their exposure to media, but they are not quite ready to articulate it in ways that a teacher might appreciate it. It is in this 'zone' between what you know and what you almost know that new knowledge is constructed. Such knowledge often takes the form of skills, which are cultivated outside the school, at home or in the community. All such forms of knowledge must be respected"**

বাড়ির ও পাড়ার শিক্ষিত মানুষদের কাছে তো বটেই, অনেকসময় অনেক নিরক্ষর কাছের মানুষদের থেকেও তারা ধারণা (idea) পাবে। তার আগে ও পরে 'আনন্দের সহিত' এই বই পড়ার ফলে তাদের নতুন জ্ঞান-গঠন প্রক্রিয়া এগিয়ে যাবে। এর ফলে শুধু তাদের 'পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি' পেতে থাকবে এমন নয়, আত্মবীক্ষণ ও পরিবেশবীক্ষণ বিষয়ে তাদের 'গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে ও স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ' করতে থাকবে।

তবে এত কিছু হঠাৎ হবে না। শিক্ষিকা ও শিক্ষক, অভিভাবিকা ও অভিভাবকদের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া এই সাফল্য অর্জন কোনোদিনই সম্ভব হবে না। তাই মুখ্যত তাঁদের উদ্দেশ্যেই এইসব কথা।

শিশুরা শ্রেণিকক্ষে কী করবে, শিক্ষিকা ও শিক্ষকরা কীভাবে তাদের সাহায্যকারী (facilitator) হয়ে উঠবেন তার উদাহরণ বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠায় রয়েছে। বাড়ির লোক ও পাড়ার লোকদের কাছে কী সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে তার উদাহরণও রয়েছে বইয়ের অনেক পৃষ্ঠায়।

হয়তো এরপর আর শিখন-পরামর্শ দরকার হবে না। তবু আমরা জানি, এই পথে আমরা সবাই প্রথম চলতে চাইছি। এত বিস্তৃত ক্ষেত্রে এপথে চলার কোনো অভিজ্ঞতার কথা আমাদের জানা নেই। তাই কিছু শিখন-পরামর্শ বইয়ের শেষে দেওয়া হল। আপনারাও ভাববেন, জানাবেন আপনাদের পরামর্শ।

আসুন, সবাই মিলে আমরা শিশুদের শৈশব কেড়ে না নিয়ে তাকে এমন বইয়ের সঙ্গে পরিচিত করাব যা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শিক্ষাপুস্তক' নয়, 'পাঠ্যপুস্তক'।

আমাদের পরিবেশ

আমার নাম ....

আমার মায়ের নাম ....

আমার বাবার নাম ....

আমার রোল নম্বর ....

আমাদের বিদ্যালয়ের নাম ....

আমাদের বাড়ির নম্বর ও রাস্তার নাম ....

....

আমাদের গ্রামের নাম/শহরের নাম ....

আমাদের জেলার নাম ....

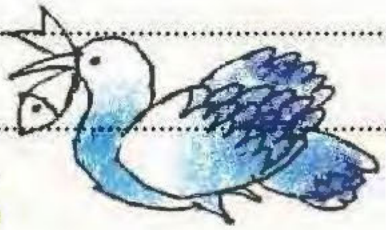

শরীরের বর্ম

ব্যাগ কিনতে সুজয় দোকানে গেছে। গিয়ে দেখা হয়ে গেল অণিমা আর ওর মা-এর সঙ্গে। দোকানদার বলছেন— ব্যাগ, জুতো ও বেল্ট সবই চামড়ার। তবে আজকাল চামড়ার অনেক বিকল্পও ব্যবহার হচ্ছে। মানুষও চামড়ার ব্যবহার কমাচ্ছে।

অণিমা ব্যাগটা দেখিয়ে হাসতে হাসতে বলল— চামড়া এত পুরু হয়?

পিছন থেকে সুজয় বলল— হ্যাঁরে, হয়। গন্ডারের চামড়া আরও পুরু!

পরদিন স্কুলে এসব বলল ওরা। দিদিমণি সব শুনে বললেন— জানো তো একসময়ে চামড়ার অনেক রকম ব্যবহার হতো। পশুর চামড়া শুকিয়ে তাতে লিখত মানুষ। চামড়ার পোশাক, জুতো ব্যবহার করত। জল নিয়ে যেতে চামড়ার তৈরি ব্যাগ ব্যবহার করত। তারপরে মানুষ বোঝে চামড়া বেশি ব্যবহারের বিপদ আছে। পশুরা তো মারা পড়েই। তার সঙ্গে চামড়ার বেশি ব্যবহারে পরিবেশ দূষিত হয়। চামড়া কারখানার নোংরা পড়ে জল নষ্ট হয়। হাওয়ায় দুর্গন্ধ ছড়ায় চামড়ার কারখানা থেকে। তাই আস্তে আস্তে চামড়ার ব্যবহার কমাতে হয়েছে।

রিনা বলল— শরীরে কোনো জায়গার চামড়া টান টান। কোনো জায়গার চামড়া কোঁচকানো। আবার কোথাও চামড়া পুরু, কোথাও পাতলা।

দিদিমণি জানতে চাইলেন— আমাদের শরীরের বর্ম কোনটা বলোতো?

সুজয় বলে উঠল— আমাদের চামড়া।

— ঠিক বলেছ। চামড়া বা ত্বক। তার নীচে শরীরের সবকিছু। মাংসপেশি, নার্ভ, শিরা-ধমনি।

পরাণ বলল— দিদি, বর্ম কেন বলব?

সুজয় বোঝাল— আঘাত থেকে বাঁচায় বর্ম। ত্বকও তেমনি। বাইরের আঘাত ও সূর্যের আলোর অদৃশ্য অতিবেগুনি রশ্মি থেকে বাঁচায়।

—চামড়ার নীচে মাংসপেশি, শিরা-ধমনি রয়েছে। ত্বক এদের বাঁচায়। নইলে সামান্য আঘাতেই রক্ত পড়ত। জানত, অনেক দিন আগে যুদ্ধেও চামড়ার ব্যবহার হতো। গণ্ডারের চামড়া দিয়ে পোশাক, ঢাল বানানো হতো। সেই পোশাক পরে যুদ্ধ করলে সহজে আঘাত লাগত না। তাই তাকে বর্ম বলা হতো। ঢালও শরীরকে আঘাত থেকে বাঁচাত। কোনো জায়গা ছড়ে গিয়ে ত্বকে আঘাত লাগলে রোগের জীবাণু সহজেই আক্রমণ করতে পারে।

মীনা বলল—শিরা-ধমনি সব নলের মতো, তাই না?

রফিক নিজের হাতদুটো উপুড় করে মীনাকে দেখাল। বলল— এই দেখ, কীরকম নল দেখা যাচ্ছে। চামড়ার নীচে ফুলে রয়েছে। নলগুলোর শাখাও রয়েছে।

— এগুলো শিরা না ধমনি?

— ওগুলো শিরা। ধমনি একটু ভিতর দিকে থাকে। শরীরের অনেক জায়গায় শিরাগুলো বেশ দেখা যায়।

দেখে নিয়ে লেখো

শরীরের কোন অংশের চামড়া কেমন তা দেখো। তা নিয়ে আলোচনা করো। তারপর লেখো :

শরীরের অংশের	চামড়া কেমন	চামড়ার নীচে শিরা দেখা যায় কিনা	চামড়ার নীচে আর কী আছে বলে মনে হয়
গাল	টান টান		
গলা		দেখা যায়, নীল রঙের	
হাতের তালু			

ত্বক কোথায় পাতলা, কোথায় পুরু

পরদিন। দিদিমণি আসার আগেই ত্বক নিয়ে কথা শুরু হলো।

আমিনা নিজের হাতটা দেখছিল। একসময় বলল— চামড়া যেখানে পাতলা, সেখানেই শিরাগুলো দেখা যায়। চামড়া যেখানে মোটা সেখানে দেখা যায় না। তাই হাতের চেটোর দিকে শিরা দেখা যায় না।

সবাই নিজের নিজের হাতের দু-পিঠ দেখে নিল। আমিনা ঠিকই বলেছে। কিন্তু চামড়া কোথাও পাতলা কোথাও পুরু কেন?

সুজয় বলল— হাতের কোন দিকটায় বেশি ঘষাঘষি হয়?

মীনা বলল— চেটোর দিকটায়।

রফিক বলল— তাই কী হাতের চেটোর দিকের ত্বক মোটা হয়ে গিয়েছে?

ইতু বলল— পায়ের তলার চামড়া আরো পুরু। গোড়ালির কাছটা সবচেয়ে পুরু। গোড়ালিতে কি বেশি ঘযাঘযি হয়?

মীনা বলল— হাঁটার কথা ভেবে দেখ। গোড়ালির উপর শরীরের সব ভার পড়ে। সেখানে বর্মটা মোটা না হলে চলে?

এদিকে সুজন রফিকের হাতের চামড়াটা দু-আঙুল দিয়ে ধরল। বলল—এইভাবে ধরে দেখ, কোথাকার চামড়া কতটা পুরু বুঝতে পারবি।

দেখে নিয়ে লেখো:

শরীরের নানা অংশের ত্বক কত পুরু তা দেখো। তারপর লেখো :

শরীরের অংশ	ত্বক পাতলা না পুরু	শরীরের অংশ	ত্বক পাতলা না পুরু
গাল	পাতলা		

ত্বকের উপর-নীচ

স্কুলের কাছে এসে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ল সুজন। হাঁটু আর কনুইতে লাগল। সবাই মিলে ধরে তুলে নিয়ে গেল। কনুইতে খানিকটা ছড়ে গেছে। এক জায়গায় একটু রক্ত বেরিয়েছে। হাঁটুতেও একটু ছড়েছে। একটু জল জল কিছু বেরিয়েছে। খানিকক্ষণ বরফ দেওয়া হলো। তারপর হেডস্যার ওযুধ দিলেন।

মীনা সব দেখছিল। সে ভাবল, ত্বকের কি দুটো স্তর আছে? একটা স্তরে জলের মতন কিছু থাকে? আর একটা স্তরে রক্ত? দিদি ক্লাসে এলে সে জানতে চাইল।

দিদি বললেন— ঠিকই দেখেছ। ত্বকের উপরের স্তরে রক্ত থাকে না।

রফিক বলল— ওই স্তরের উপরটা মরা। কেটে গেলেও কিছু হয় না। তাই না?

— হ্যাঁ, ভিতরের স্তরে আঘাত লাগলেই কিন্তু জ্বালা করবে।

মীনা বলল— পুড়ে গেলে খুব জ্বালা করে।

— তখন ঠান্ডা জল দিতে হয়। ধরো কবজির কাছটা পুড়েছে। খানিকক্ষণ ঠান্ডা জলে হাত রেখেছ। হাত তুললে আবার জ্বালা শুরু হলো। তাহলে আবার হাতটা ঠান্ডা জলে ডোবাতে হবে। যখন হাত তুলে নিলে জ্বালা করবে না তখন হাত তুলে নেবে। তাহলে চামড়ার ভিতরের স্তরে ক্ষতি হবে না।

—ফোসকা পড়ে যাবে যে!

— চামড়ার ওপরের স্তরটা গরমে মরে যায়। তখন নীচের স্তরটা থেকে জল বেরিয়ে আসে। দুটি স্তরের মাঝে সেই জলীয় তরল জমা হয়। তার ফলে জায়গাটা ফুলে ওঠে। এভাবে ফোসকা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গায় ঠান্ডা জল দেওয়া হলে নীচের স্তরটা গরম হতে পারে না। তখন ফোসকা নাও পড়তে পারে।

মীনা বলে উঠল— কিন্তু ফোসকা পড়লেও বেশি ক্ষতি নেই। তাতে চামড়ার ভিতরের স্তরটা বেঁচে যায়।

— বেশি পুড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।

বলাবলি করে লেখো:

আগে কবে কার চামড়ায় আঘাত লেগেছে তা ভেবে আলোচনা করে লেখো :

শরীরের অংশ	চামড়ায় আঘাতের কারণ	তখন কী করেছ	এরপর ওই রকম হলে কী করবে

কোঁকড়ানো আর কালো

স্কুলের একটা অনুষ্ঠানে এসেছেন আগের হেডস্যার। বয়স্ক মানুষ। পিনাকী দেখল, তাঁর মুখের চামড়ায় টানটান ভাব নেই। কপালের চামড়ায় ভাঁজ। পরদিন ক্লাসে স্যারকে এর কারণ জানতে চাইল।

স্যার বললেন— বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শরীর বাড়লে চামড়াও বাড়ে। মোটা হলেও তাই। বৃদ্ধ হলে শরীরটা ছোটো হতে শুরু করে। কিন্তু চামড়া কমে না। তখন চামড়া কুঁচকে যায়। হেডস্যারের তাই হয়েছে।

রিয়াজ বলল— আচ্ছা স্যার চামড়ার রং কেন আলাদা হয়?

—মেলানিন নামের একটা জিনিসের জন্য চামড়ার রং কালো হয়। অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকের ক্যানসার ঘটায়। মেলানিন অতিবেগুনি রশ্মি শুষে নিয়ে ক্যানসার আটকায়।

— তাহলে কালো চামড়া রোগের বিরুদ্ধে বেশি লড়াই করতে পারে?

— ঠিক তাই। আর রোদ শরীরে মেলানিন তৈরি করতে সাহায্য করে।

— সাহেবরা তো খুব ফর্সা। তাদের চামড়ায় মেলানিন নেই?

— আছে। তবে কম।

মীনা বলল— আমার বড়োজেঠুর গায়ের রং কালো। কিন্তু এখন অনেক জায়গায় চামড়াটা একদম সাদা হয়ে যাচ্ছে।

— ওসব জায়গায় মেলানিন তৈরি হচ্ছে না। অপুষ্টি বা অসুখে এমন হয়।

— তাহলে গায়ে রোদ লাগানো ভালো?

— হ্যাঁ। ত্বকে রোদ লাগালে ভিটামিন-ডি তৈরি হয়।

স্বপন বলল — স্যার, চামড়া থেকে তো ঘাম বেরোয়।

— ঘামে নুন আর শরীরের কিছু বর্জ্য থাকে। বর্জ্য বেরিয়ে যাওয়াটা ভালো। নুন বেরিয়ে যাওয়াটা খারাপ। বেশি নুন বেরিয়ে গেলে মাথা ঘোরা বা অজ্ঞান হওয়ার ঘটনাও ঘটতে পারে।

রিয়াজ বলল— চাচার খুব ঘাম হয়। ডাক্তারবাবু বলেছেন, একটু নুন জল খেতে।আজ তার কারণটা বুঝলাম।

— তবে জানত, একসময়ে চামড়ার রং দেখে মানুষের ভেদাভেদ করা হতো। বলা হতো, সাদা চামড়ার মানুষরা নাকি সভ্য। কালো চামড়ার মানুষরা নাকি অসভ্য। কালো চামড়ার মানুষরা নিজেদের সম্মানের জন্য অনেক লড়াই করে। শেষ পর্যন্ত লড়াই করে তারা নিজেদের সম্মান আদায় করেছে। নেলসন ম্যান্ডেলা, মহাত্মা গান্ধি, মার্টিন লুথার কিং এঁরা সবাই কালো মানুষদের সম্মানের জন্য লড়েছেন। চামড়ার রং দেখে মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ করা আজকের দিনে অপরাধের শামিল।

বলাবলি করে লেখো

চামড়ার অসুখ বিষয়ে নিজেরা আলোচনা করো। প্রয়োজনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্য নাও। তারপর লেখো :

শরীরের অংশ	চামড়ায় কী অসুখ হয়	সেই অসুখের লক্ষণ	সেই অসুখ হলে কী করেছ বা করবে

চুলের সাতকাহন

কৌশিকের মা চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। চিরুনিতে কিছু চুল উঠে এল। কৌশিক দেখল, চুলের গোড়াগুলো মোটা। ভাবল, চুলের গোড়াগুলো মাথার কোথায় আটকে থাকে? চামড়ার উপরের স্তরে? নাকি ভিতরের স্তরে? নাকি আরও গভীরে? অনেক প্রাণীর আবার গায়ে লোম বেশি। কিন্তু মাথায় চুল নেই। পাখির গায়ে পালক থাকে। মাছের আছে আঁশ। সাপেরও তাই। আবার ব্যাঙের গায়ে আঁশ, পালক বা লোম কিছুই নেই।

স্কুলে যেতে যেতেই ওরা বন্ধুরা এসব কথাই বলছিল। তৃষা বলল— মুরগির গায়ে কিছু পালক খুব ছোটো। লোমেরই মতো। ওগুলোর গোড়াগুলো চামড়ার নীচের স্তরে সেটা বোঝা যায়।

ক্লাসে এসব কথা বলল সবাই মিলে। দিদিমণি তৃষার দিকে তাকালেন। হেসে বললেন— তুমি এত সব জানলে কী করে?

—মুরগির গায়ে ওষুধ লাগাতে গিয়ে দেখেছি।

—লোম, চুল, পালক সবেরই গোড়া চামড়ার ভিতরের পর্দায়। চামড়া তো শরীরকে বাঁচায়। আবার চামড়াকেও প্রথম ধাক্কা থেকে বাঁচাতে হবে। তাই লোম, চুল, পালক, আঁশ তৈরি হয়েছে।

তৃষা বলল— মাথা আঁচড়াতে গেলে তো রোজই কিছু চুল উঠে যায়!

— ওঠে তো! পালক, লোম, চুল সবই ওঠে। চামড়া আবার তা তৈরি করে নেয়। তবে রোজ বেশ কিছু চুল স্বাভাবিক নিয়মেই পড়ে যায়।

নবীন বলল— বয়স বাড়লে চুল সাদা হয়ে যায় কেন?

— বয়স বাড়লে মেলানিন তৈরি কমে যায়।

রিনা বলল— কারো চুল কোঁকড়ানো, কারো কোঁচকানো, কারো সোজা!

— দেখো তো তোমাদের মধ্যে কতজনের চুল কেমন। খুঁজলে দেখা যাবে বিভিন্ন মানুষের চুলের রং ও ধরন তোমাদের থেকে অনেকটা আলাদা।

দেখেশুনে লেখো

তোমাদের কার চুল কেমন, কার কত চুল ওঠে তা দেখে আর গুনে লেখো :

চুলের ধরন		গড়ে দিনে নিজের কটা চুল উঠে যায়			
চুলের ধরন	কোন ধরন, কতজনের	দিন সংখ্যা	সারাদিনে কটা চুল পড়ল	চারদিনে মোট কত চুল পড়ল	গড়ে দিনে কটা চুল পড়ল
কোঁকড়ানো		১			
একটু কোঁচকানো		২			
সোজা সোজা		৩			
		৪			

শজারুর কাঁটা

নীলা কোনো পশুর মাথায় মানুষের মতো চুল দেখেনি। বিড়ালের গোঁফ আর ছাগলের দাড়ি দেখেছে। ওদের গোঁফ-দাড়ি কি মানুষেরই মতন? ওদের গোঁফ-দাড়ি কি পাকে? রিনাকে বলল এসব।

রিনা বলল—ওদের গোঁফ-দাড়ি বেশি বাড়ে না।

ওদের এসব কথা শুনে সুনীল বলল— চুল-গোঁফ-দাড়ি সবার সমান বড়ো নয়। কারো কম বাড়ে, কারো বেশি বাড়ে।

ক্লাসে এসব বলল ওরা। দিদিমণি বললেন — সুনীল তো ঠিকই বলেছে।

সাবিনা বলল—দিদি, কাকাতুয়ার ঝুঁটি কি চুল?

— দেখতে চুলের মতো হলেও পালকই। ওইরকম ঝুঁটির মতো হয়ে তৈরি গন্ডারের খড়্গ।

আসলে সেটা চুল।

— চুল কী করে হবে? খড়্গ তো শুনেছি খুব শক্ত।

— শক্ত হলেও জমাট বাঁধা চুল। লোমও শক্ত হয়। বলত কোন প্রাণীর গা- ভরতি শক্ত খাড়া খাড়া লোম?

রফিক বলল— শজারু। শজারুর লোম কাঁটার মতো। খুব শক্ত আর সুঁচাল হয়।

সুনীল বলল — বাদুড়ের গায়েও লোম আছে।

বলাবলি করে লেখো

মানুষের ও অন্য প্রাণীর লোম-চুল বিষয়ে আলোচনা করো। প্রয়োজনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্য নাও। তারপর লেখো :

মানুষের লোম-চুল		অন্য প্রাণীর লোম/চুল/পালক/আঁশ			
কাটলে বেশি বাড়ে কিনা		বেশি লোম কাদের	খুব কম লোম কাদের	বিশেষ ধরনের লোম-চুল কাদের	বিশেষ ধরনের পালক/আঁশ কাদের
না কাটলে কত বড়ো হয়					
চামড়ার কোন স্তরে গজায়					
এদের কাজ কী					
পাকলে কেন সাদা					

নখের নীচে রক্ত

অন্যমনস্ক হয়ে চলতে গিয়ে হোঁচট খেল পুনম। নখ উলটে রক্ত বেরোলো। খানিকক্ষণ বরফ লাগাতে বললেন বড়দি। তারপর ওষুধ দিলেন। বললেন— মাস দুয়েক পরে নতুন নখ গজাবে।

বিমল নখের নীচে রক্ত দেখে অবাক। সে ভাবত নখ কাটলে লাগে না। একথা শুনে নোরসাং বলল—কোনোদিন তোর নখ বেশি কাটা হয়ে যায়নি?

বিমল ভেবে বলল—একবার হয়ে গিয়েছিল। চামড়া কেটে যাওয়ার মতন লেগেছিল।

— আর একটু কাটলেই রক্ত বেরোত।

পিয়ালি বলল— নখের রং দেখ গোলাপি। এবার নখের একধার একটু টিপে দেখ। বিমল তাই করল। গোলাপি রংটা একদিক থেকে অন্যদিকে সরে গেল। তা দেখে বিমল বলল—ওই রংটা রক্তের জন্য! তাই না? রক্তটা অন্যপাশে সরে যাচ্ছে।

ক্লাসে ঢুকে পুনমের নখ উলটে যাওয়ার কথা শুনলেন দিদিমণি। বললেন—আঙুলকে বাঁচায় নখ। আবার আঙুলের অনেক কাজও করে নখ। নখ না থাকলে ছোটো জিনিস ধরা যেত না।

নোরসাং বলল—পায়ে কাঁটা ফুটলে নখ দিয়ে ধরে তুলতে হয়।

কৌশিক বলল— মাটিতে পিন পড়ে গেছে? নখ দিয়েই ধরে তুলতে হবে।

পুনম বলল— আমার মায়ের নখগুলো ফেটে ফেটে গেছে।

—এটা রক্তাল্পতার কারণে হতে পারে। রক্তাল্পতার জন্য নখের মাঝখানটা চামচের মতো হয়ে যেতে পারে। নখটা ফ্যাকাশেও হয়ে যেতে পারে। দেখবে ডাক্তাররা রোগীর নখ দেখেন।

রিনা বলল— নখের গোড়ায় নোংরা হলে পেকে যায়। পুঁজ হয়।

—ঠিক। নখ পরিষ্কার রাখা ও কাটা খুব দরকার। নোংরা জমে থাকলেই সেখানে জীবাণু বাসা বাঁধতে পারে।

বলাবলি করে লেখো

নখের কাজ, নখের যত্ন এসব নিয়ে আলোচনা করে লেখো :

নখ কী কী কাজ করে	নখ দেখে কী কী বোঝা যায়	কীভাবে নখের যত্ন করা দরকার

নরম নরম থাবার নীচে লুকানো তার নখ

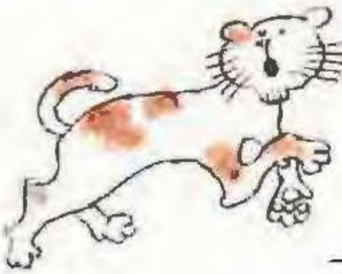

সোনম ভাবছিল বিড়ালের নখের কথা। এমনিতে নখগুলো দেখাই যায় না। কিন্তু কিছু ধরার সময় বেরিয়ে আসে।

বন্ধুদের সেকথা বলল। সিরাজ বলল— কুকুরেরও ওইরকম আছে।

কৌশিক বলল— কুকুরের ধারালো নখ আছে। কিন্তু তা থাবায় লুকানো থাকে না।

— ধারালো নখ অন্য অনেক জীবজন্তুর আছে।

— বেশিরভাগ পাখির নখই ধারালো।

— কেন বলত? ওরা নখ দিয়ে নানা জিনিস ধরে উড়ে যায় বলে?

— হতে পারে। হাঁস ওড়ে না। তাই হাঁসের পায়ে ওইরকম নখও নেই।

— পেঁচা, ঈগল শিকারি পাখি। ওদের নখ হুকের মতো। বাঁকানো আর সুঁচাল। জন শুনছিল। এবার বলল— গোরু, ছাগলের নখই ওদের খুর। সেগুলো ভোঁতা। ওরা মাছ বা পোকা ধরে না। তাই ধারালো নখ নেই।

দিদিমণিকে এসব কথা বলল সবাই। দিদিমণি বললেন— ঠিক। শিকারি পশুপাখিদেরই ওইরকম নখ হয়।

পুনম বলল— দিদি, মানুষ ছাড়া তো কেউ নখ কাটে না। তবু পশুপাখিদের নখ কেন বেশি বাড়ে না?

— দেখোনি, অনেক পশুপাখি নখ ঘষে। ঘষে ঘষে নখ বাড়তে দেয় না।

— দিদি, ত্বক-চুল-নখ সবাই শরীরের অন্য অঙ্গকে বাঁচায়।

— তবে এদেরও যত্ন করতে হয়। সাবান, জল দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। তেল, ক্রিম লাগাতে হয়। নখের যত্ন না নিলে জীবাণু ঢুকে নখকুনি হয়। চামড়ায় ফুসকুড়ি, দাদ-হাজা, চুলকানি হয়। চুলে খুসকি, উকুন হয়।

বলাবলি করে লেখো

১। বিভিন্ন প্রাণীর নখ সম্পর্কে নিজেরা আলোচনা করে, ভেবে লেখো:

নখ নেই এমন প্রাণী	খুরওলা প্রাণী	কিছুটা ধারালো নখওলা প্রাণী	খুব সুঁচাল নখওলা প্রাণী
	গোরু	মানুষ	বিড়াল

২। নখ, চুলের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করো। প্রয়োজনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্য নাও। তারপর লেখো:

নখ, চুলে কী কী সমস্যা হয়	তাতে কী কী কষ্ট হয়	তখন কী করলে ভালো হয়

ছোটো-বড়ো হাড়ের কথা

স্যার সোহমকে ডেকে একটা নল ধরতে দিলেন। বললেন—এটা বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে ধরো। সোহম ধরল। স্যার সবাইকে বললেন— আমাদের আঙুলগুলো দেখো। আঙুলে ক-টা জায়গায় ভাঁজ হয়েছে?

জাফর বলল — বুড়ো আঙুলে দুটো ভাঁজ। তর্জনীতে তিনটে।

জিকো বলল— দুটো আঙুলের গোড়া দু-জায়গায়।

রোকেয়া বলল — দু-জায়গা থেকে দুটো হাড় গেছে কবজিতে।

স্যার ওদের কথায় খুব খুশি হলেন। বললেন —ঠিক বলেছ। কবজি থেকে পাঁচ আঙুলে মোট ক-টা হাড়? গুনে নাও।

এই বলে স্যার একটা হাত আঁকলেন।

একটু ভেবে জিকো বলল— সারা গায়ে তো অনেক হাড়! কয়েক-শো হয়ে যাবে!

সোনাই বলল— সব হাড় কি এভাবে গোনা যাবে?

— তা না গেলেও এভাবে ধারণা করতে পারবে। হাড়ের মোট সংখ্যাটা একশোর কাছে, নাকি দুশোর বা তিনশোর।

অরূপ বলল— ঠিক ক-টা হাড় আছে তা কী করে জানা যায়?

—যেকোনো জীবের কঙ্কাল দেখে।

— মানুষের হাড়গুলো নানা মাপের। কনুই থেকে কবজি, কোথাও ভাঁজ নেই। কত বড়ো। আবার আঙুলের ডগার হাড় কত ছোটো।

অরূপ ডান হাতের বিভিন্ন জায়গা বাঁহাত দিয়ে টিপে দেখল। তারপর বলল— কিন্তু মানুষের কঙ্কাল দেখলে বোঝা যাবে কবজি থেকে কনুই দুটো হাড়। কিন্তু কনুই থেকে কাঁধ নলের মতন একটা হাড়।

— ঠিক। কোমর থেকে হাঁটু অবধি নলের মতো আরেকটা হাড় আছে। এভাবে হাত দিয়ে দেখো শরীরের কোথাকার হাড় কেমন।

দেখে বুঝে লেখো

বিভিন্ন জায়গার হাড়ের মাপ ও তাদের আকার বিষয়ে বোঝার চেষ্টা করো। তারপর লেখো :

কোন জায়গার হাড়	মাপ (ছোটো / মাঝারি / বড়ো)	কোন জায়গার হাড়	মাপ (ছোটো / মাঝারি / বড়ো)

অস্থিসন্ধির হিসেবনিকেশ

হাড়ের সংখ্যা গুনতে গিয়ে নতুন এক খেলা শুরু হলো। হাড়ের জোড় ক-টা! জোড়গুলো না থাকলে বল ধরা যেত না। ক্রিকেট খেলায় স্পিনার বল ধরে মুচড়ে ছাড়ে। কবজি পর্যন্ত সব আঙুল কাজ করে। কবজি থেকে আঙুলের মাথা পর্যন্ত ক-টা জোড়?

স্যার ক্লাসে এলে বল ধরার মতো করে আঙুল ভাঁজ করে দেখাল জন।

স্যার বললেন—হাড় হল অস্থি। জোড় হল সন্ধি। হাড়ের জোড়কে বলে অস্থিসন্ধি। সারা গায়ে কোথায় কোথায় অস্থিসন্ধি আছে? শরীরে হাত দিয়ে আর নরকঙ্কালের ছবি দেখে বোঝার চেষ্টা করো।

রঞ্জন বলল— এত হাড়। এদের আলাদা আলাদা নাম নেই?

খোপে কোথাকার হাড় কোনগুলো তা লেখো

— আছে। কয়েকটা নাম বলছি।

কনুই থেকে কবজি : আলনা ও রেডিয়াস।

কাঁধ থেকে কনুই: হিউমেরাস।

মেরুদণ্ড : ভার্টিব্রা বা কশেরুকা।

কোমর থেকে হাঁটু : ফিমার।

হাঁটুর নীচ থেকে গোড়ালি : টিবিয়া ও ফিবুলা।

— হাড়গুলো অস্থিসন্ধিতে কী দিয়ে লাগানো থাকে?

—দড়ির মতো একরকম জিনিস। তাকে বলে লিগামেন্ট। কাঁধ, কোমর, হাত ও পায়ের অস্থিসন্ধির মাঝখানে একরকম হড়হড়ে তরল থাকে। সেটা কমে গেলে হাড়ের নড়াচড়া করতে অসুবিধা হয়।

রিনা বলল— জিমনাস্টিকস করলে অনেক অস্থিসন্ধি খুব নমনীয় থাকে।

— ঠিক। আর অস্থি মজবুত করার জন্য ক্যালশিয়াম দরকার। দুধ, ডিমে তা আছে।

দেখে আর গুনে লেখো

১। শরীরের হাড়ের বিষয়ে দেখে আর গুনে লেখো:

এক হাতে কাঁধ থেকে কবজির আগে পর্যন্ত হাড়ের জোড় ক-টা? গুনে খাতায় লেখো:	
কাঁধ থেকে কবজি পর্যন্ত ক-টা হাড়? শরীরে হাত দিয়ে আর নরকঙ্কালের ছবি দেখে গুনে লেখো :	

২। অস্থি মজবুত করা ও অস্থিসন্ধিগুলো নমনীয় করা বিষয়ে আলোচনা করে লেখো:

অস্থি মজবুত হলে কী সুবিধা	কী করলে অস্থি মজবুত হয়	অস্থিসন্ধি নমনীয় হলে কী সুবিধা	কী করলে অস্থিসন্ধি নমনীয় হয়

পেশি নিয়ে কিছু কথা

শুভ্রকে কাকা পাঞ্জা লড়তে শেখাচ্ছিলেন। শুভ্র কাকার হাত চেপে ধরে অবাক। ইটের মতো শক্ত! শুভ্র বলল— তোমার হাত এত শক্ত হলো কী করে?

— পেশির জন্য। কাজ করায় হাড়কে সাহায্য করে। পেশি হাড়ের এক জায়গায় শুরু। আর এক জায়গায় শেষ। এমনিতে নরম। টানটান করলেই শক্ত হয়ে যাবে। কিছু টানতে গেলে পেশির জোর চাই।

— কী করে পেশি জোরালো হবে?

— মাছ-মাংস, ডিম, মাশরুম, ডাল, সয়াবিন, লেবু খাবে। একটু ব্যায়াম করবে। মাঝেমধ্যে হাতটা টানটান করবে, তারপর ছেড়ে দেবে। পেশি লম্বায় বাড়বে।

স্কুলে এসব কথা বলল শুভ্র। স্যার বললেন— হাতে অনেক পেশি আছে। লিখতে গেলে অনেক পেশির সাহায্য লাগে। ক্রিকেট খেলায় বল করতে আবার অন্যরকম। দেখার জন্য, পড়ার জন্য চোখের পেশি কাজ করে।

অজন্তা বলল— অন্য প্রাণীদেরও দেহে পেশি আছে?

— নিশ্চয়ই। বাঘের মুখের পেশির জোর খুব। পাখিদের ডানার পেশি খুব শক্তপোক্ত। কেঁচোর দেহের বেশিরভাগটাই শুধু পেশি।

—আমাদের হাড় না থাকলে কী হতো? চলাফেরা কেঁচোর মতো হয়ে যেত!

— তা বটে। আমাদের চোখে হাড় নেই। এর সঙ্গে লাগানো পেশিগুলো একে নড়াচড়া করায়। জিভও একটা পেশি। একাই অনেক কাজ করে। কোনো খাবার চেটে নিতে পারে। মুখের ভিতর চিবানোর সময় খাবারকে ওলোট-পালোট করে নিতে পারে। আবার গিলতেও জিভের সাহায্য লাগে। আর জিভ না থাকলে কথা বলা যায় না। আবার কানের লতিতেও পেশি। তবে সে কোনো কাজই করতে পারে না।

বলাবলি করে লেখো

মানুষ ও অন্য প্রাণীর শরীরের পেশি বিষয়ে আলোচনা করে লেখো:

মানুষের শরীরের পেশি		অন্য প্রাণীর শরীরের পেশি	
কোন জায়গার পেশি	কী করায় সাহায্য করে	কোন জায়গার পেশি	কী করায় সাহায্য করে
কাঁধের পেশি			
চোয়ালের পেশি			

স্টেথোস্কোপে শোনা

ডাক্তারবাবুরা বুকে স্টেথোস্কোপ দিয়ে দেখেন। সিধু ভাবল, অমন একটা জিনিস বানানো যায়? স্টেথোস্কোপের যে দিকটা বুকে ঠেকায় সেটা ছোটো ফানেলের মতো। ও একটা ফানেল আর রবারের নল দিয়ে স্টেথোস্কোপ বানাবার চেষ্টা করল।

ছোটোবোনের বুকে নলটা ঠেকিয়ে সিধু ফানেল কানে দিল। তারপর অবাক হয়ে শুনল। বুকে এত শব্দ হয়?

ভালো করে দেখার আগেই বোনকে মা ডাকলেন। বোন এক ছুটে চলে গেল। আবার একটু পরে ফিরে এল।

সিধু আবার এভাবে শুনল। এবার মনে হল শব্দটা বদলে গেছে।

পরেরদিন স্কুলে সবাইকে ও সেকথা বলল। দিদিমণি শুনে বললেন— ঠিকই শুনেছ। দৌড়ে গেলে আর দৌড়ে ফিরলে হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক শব্দটা বেড়ে যায়।

আশা বলল- হৃৎপিণ্ড কী?

—শরীরে রক্ত ছড়িয়ে দেওয়ার পাম্প। সারা শরীরে রক্ত যাওয়ার জন্য ছড়িয়ে আছে ধমনি। পাম্প করে ওই নল দিয়ে রক্ত পাঠায় বুকের ভিতরের একটা অঙ্গ। তার নাম হৃৎপিণ্ড।

রবিলাল বলল- সারা শরীরে রক্ত যাওয়ার দরকার কী?

— সারা শরীরে অক্সিজেন ও শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি পৌঁছে দেয় রক্ত। আবার ধরো, তোমার নাকে ফোঁড়া হয়েছে। সেখানে ফোঁড়ার অনেক জীবাণু। রক্তেও কিছু জীবাণু মিশেছে। কিন্তু তুমি ওষুধ খেয়েছ। ওষুধটা ফোঁড়ার জীবাণু মারতে পারবে। কিন্তু ফোঁড়ার কাছে ওষুধটা যাবে কীভাবে?

— রক্তের সঙ্গে গুলে যাবে? হৃৎপিণ্ড সেই রক্ত পাম্প করে নাকে পাঠাবে?

— এই তো রক্তের কাজ আর হৃৎপিণ্ডের কাজ বুঝেছ। তাছাড়া, রক্তেও রোগ আটকানোর মতো অনেক কিছু থাকে।

— তাই কিছু অসুখ ওষুধ না খেলেও সেরে যায়!

— ঠিক। এবার তোমরা বন্ধুরা সবাই সিধুর মতো স্টেথোস্কোপ বানাতে চেষ্টা করো। ছোটার আগে-পরে হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক শব্দের ছন্দ কীভাবে বদলায় তা দেখো।

দেখেশুনে ভেবে লেখো

স্টেথোস্কোপ বানিয়ে নানান কাজের পর হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক শব্দ শোনো। কোন কাজের পর সেই ধুকপুক শব্দের ছন্দ কীরকম হয় তা শুনে লেখো :

হৃৎপিণ্ডের শব্দ			অসুখ হলে রক্ত পরীক্ষা করে কেন
বিকালে খেলার পর	রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে	কেন ওই পরিবর্তন	

বাতাসে ওড়ে জীবাণু

রাস্তায় খুব ধুলো। কাল থেকে অনন্তকাকুর জ্বর। এবারে ধুলোর জন্য তাঁর হাঁচি শুরু হলো। কাকু ব্যস্ত হয়ে মুখে রুমাল চাপা দিলেন। নইলে ওঁর মুখ থেকে বাতাসে ইনফ্লুয়েঞ্জা বা অন্য কোনো অসুখের জীবাণু চলে যাবে।

সুভাষ ক্লাসে এসে একথা বলল। শেষে জানতে চাইল বাতাসে আর কোন কোন রোগের জীবাণু থাকে।

দিদিমণি বললেন— অনেক রকম রোগের জীবাণু থাকে। তবে যক্ষ্মা বা টিবি রোগের জীবাণু খুব মারাত্মক। ফুসফুস দিয়ে আমরা শ্বাস নিই আর ছাড়ি। ফুসফুসেই যক্ষ্মা রোগ বেশি হয়। অন্য কয়েকটি অঙ্গেও হয়।

সুভাষ বলল— কী করে বোঝা যায় যে ফুসফুসে যক্ষ্মা হয়েছে?

— প্রথম প্রথম বিকেলে জ্বর হয়। রাতে ঘাম, শ্বাসকষ্ট হয়। ঘুম থেকে ওঠার পর টানা কফ উঠতে থাকে। তারপর খাওয়ায় অরুচি, বুকে ব্যথা হয়। অসুখ একটু বাড়লে কাশির সঙ্গে কাঁচা রক্ত ওঠে। ক্রমশ ওজন কমতে থাকে।

— ওই কফ, হাঁচিতে রোগ ছড়ায়?

— হ্যাঁ। থুথু থেকেও ছড়ায়। সামনে দাঁড়িয়ে কথা বললেও ছড়ায়। তবে মনে রেখো যক্ষ্মা বংশগত রোগ নয়।

— এই রোগ কতদিনে সারে?

— বছরখানেক হাসপাতালে DOT চিকিৎসা করাতে হয়। তাহলে এখন পুরো সেরে যায়। ষাট-সত্তর বছর আগেও এর ভালো চিকিৎসা ছিল না। যারা পারত তারা ভালো খাবার খেত। যেখানে বাতাসে দূষণ কম সেখানে বিশ্রাম নিত। তাতেও ঠিক সারত না। তবে মাঝপথে ওষুধ খাওয়া থামিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। তাতে যক্ষ্মা আরো মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

সেবা বলল— কবে থেকে মানুষের এই রোগ হচ্ছে?

— সাত-আট হাজার বছর আগের মানুষের কঙ্কালেও এই রোগের জীবাণু পাওয়া গেছে।

রুনা বলল— তখন থেকেই যক্ষ্মার জীবাণুর কথা জানা ছিল?

—রোগটার কথা জানা ছিল। জীবাণু আবিষ্কৃত হয় প্রায় একশো ত্রিশ বছর আগে।

— তাহলে চিকিৎসা ষাট-সত্তর বছর আগে শুরু হলো কেন?

— কী দিয়ে একটা জীবাণু মারা যাবে তা জানা কি সহজ? কত পরীক্ষা করতে হয়! তার কী ফল হলো সেটা দেখতে হয়।

জলের সঙ্গে জীবাণু

তীর্থর খুব চিন্তা হলো। বাতাস থেকে যক্ষ্মার জীবাণু ওর শরীরে ঢুকে যায় যদি! একবছর ধরে ওষুধ খেতে হবে! তৃপ্তিমাসি নার্স। পাশের বাড়িতে থাকেন। একদিন মাসিকে এবিষয়ে জিজ্ঞেস করল। মাসি বললেন— জীবাণু সবার শরীরেই কমবেশি আছে। আবার শরীরের মধ্যেই তা প্রতিরোধের ব্যবস্থাও আছে।

— তাহলে লোকের যক্ষ্মা হয় কেন?

— অনেকে ধুলো-ধোঁয়া ভরা বাতাসে থাকেন। খুব পরিশ্রমও করেন। ঠিক মতো খান না। ফলে প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঠিকমতো গড়ে ওঠে না।

— আমার শরীরে প্রতিরোধের ব্যবস্থা ঠিকমতো হয়েছে?

— হয়েছে, তোমায় বিসিজি টিকা দেওয়া আছে! আমি নিজে টিকা দিয়েছি।

এমন সময়ে স্বপ্নার মা এসে বললেন— মেয়ে কাল রাত থেকে বমি আর পায়খানা করছে। একেবারে ঘোলা জলের মতো।

তৃপ্তিমাসি বললেন— নুন-চিনির জল বারবার খাওয়ান। ওর শরীরে নুন আর জল কমে যাচ্ছে। আগে সেটা পূরণ করুন। জলটা কুড়ি

মিনিট ফুটিয়ে ঠান্ডা করে নিন। এক গ্লাস ফোটানো জলে এক চামচ চিনি আর এক চিমটে নুন দেবেন। এটাই বাড়িতে তৈরি ওআরএস (ORS)। মাঝে মাঝে কয়েক চামচ করে খাইয়ে দেবেন। দূষিত জল পান করায় ওর এই বিপত্তি! তবে আঢাকা খাবার বা পানীয় খেলেও এমন বমি পায়খানা হতে পারে।

স্বপ্নার মা বললেন— দিদি, কলেরা নয়তো?

— পাতলা পায়খানা তো কত কারণেই হয়। কলেরায় পায়খানা হয় চাল ধোয়া জলের মতো। একটু আঁশটে গন্ধ থাকে। কাছে যাওয়া যায় না। ওষুধ না পড়লে বালতি বালতি বমি-পায়খানা হয়। এসব কিছু দেখলে তাড়াতাড়ি হসপিটালে নিয়ে যাবেন।

বলাবলি করে লেখো

বায়ু ও জলবাহিত জীবাণু থেকে তোমাদের বা বাড়িতে কার কী অসুখ হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করে লেখো:

অসুখের নাম	বায়ুবাহিত / জলবাহিত	রোগের লক্ষণ কী
১। টাইফয়েড		
২। পোলিও		
৩। নিউমোনিয়া		
৪। অ্যালার্জি		
৫। কৃমিঘটিত রোগ		
৬। মাম্পস		
৭। বাত		
৮। জল বসন্ত		

ওআরএস (ORS) কী কাজে লাগে, কীভাবে তৈরি করবে? ছবি এঁকে আর লিখে একটা পোস্টার তৈরি করো:

কেমনভাবে স্টেথোস্কোপ এল ?

সিধু আর তিতির ডাক্তারকাকুর স্টেথোস্কোপটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছিল। ওরা স্কুলে যে স্টেথোস্কোপগুলো বানিয়েছে সেগুলোর থেকেও এটা ভালো। ডাক্তারকাকু ওদের বললেন— স্টেথোস্কোপ আবিষ্কারের সঙ্গে একটা মজার গল্প জড়িয়ে আছে। গল্পের কথায় সিধু আর তিতির নড়েচড়ে বসল। কিন্তু একা একা গল্পটা শুনতে ওদের মন খারাপ হলো। বাকি বন্ধুরাও যদি শুনতে পেত গল্পটা তাহলে খুব মজা হতো। সেকথা ডাক্তারকাকুকে বলতেই তিনি একটা উপায় বার করলেন। ঠিক হলো এই শনিবার ডাক্তারকাকু ওদের স্কুলে যাবেন। ক্লাসের সবাইকে শোনাবেন স্টেথোস্কোপ আবিষ্কারের গল্প।

শনিবারে ডাক্তারকাকু স্কুলে এলেন। সবার বানানো স্টেথোস্কোপগুলো দেখলেন। খুবই ভালো বললেন। ওনার স্টেথোস্কোপটাও সবাই দেখল। তারপর ডাক্তারকাকু গল্পটা শুরু করলেন।

আজ থেকে দুশো বছরেরও বেশি আগের কথা। রেনে লিনেক নামে একটি ছোটো ছেলে ছিল। সব জিনিস খুব খুঁটিয়ে দেখার অভ্যাস ছিল তার। বড়ো হয়ে লিনেক ডাক্তার হন। সবসময় ডাক্তারির নানা বিষয় নিয়ে ভাবতেন তিনি। একসময় ফুসফুস নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতেন তিনি। তেমন একসময় একদিন বিকেলবেলা বাগানে পায়চারি করছেন লিনেক। হঠাৎ দেখলেন দুটি ছোটো ছেলে একটা মজার খেলা খেলছে। একটা ধাতুর নলে একদিকে একটা ধাতুর জিনিস দিয়ে আঁচড় কাটছে একজন। অন্যজন সেই ধাতুর নলটার অন্যদিকে কান লাগিয়ে সেই আঁচড়ের আওয়াজ শুনছে। এভাবে দুজনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই খেলাটা খেলতে লাগল। একমনে ওদের খেলা দেখছিলেন লিনেক। হঠাৎ তাঁর মাথায় একটা ভাবনা এল।

দৌড়ে নিজের ঘরে ফিরে এলেন তিনি। টেবিলের ওপর পড়েছিল লম্বা একটুকরো মোটা কাগজ। কাগজটাকে গোল করে পেঁচালেন লিনেক। তা দিয়ে লম্বা, সরু একটা নল বানালেন। জুড়লেন আঠা দিয়ে। এভাবেই তৈরি হল প্রথম স্টেথোস্কোপ। তবে কাগজের নল সহজে নষ্ট হয়ে যায়। আবার কাগজের ভিতর দিয়ে বুকের ধুকপুক শব্দ পুরোটা ভালো করে শোনাও যায় না। এবার ছুতোর ডাকলেন লিনেক। নিজের আঁকা স্টেথোস্কোপের নকশা ধরিয়ে দিলেন তার হাতে। ছুতোর ফাঁপা, সরু কয়েকটা কাঠের নল বানিয়ে দিল। সেই একনলা স্টেথোস্কোপই ছিল আদি স্টেথোস্কোপ। তারপর আস্তে আস্তে তার চেহারা বদলাতে থাকে। এক সময় সেটা এসে দাঁড়াল আজকের স্টেথোস্কোপের চেহারায়।

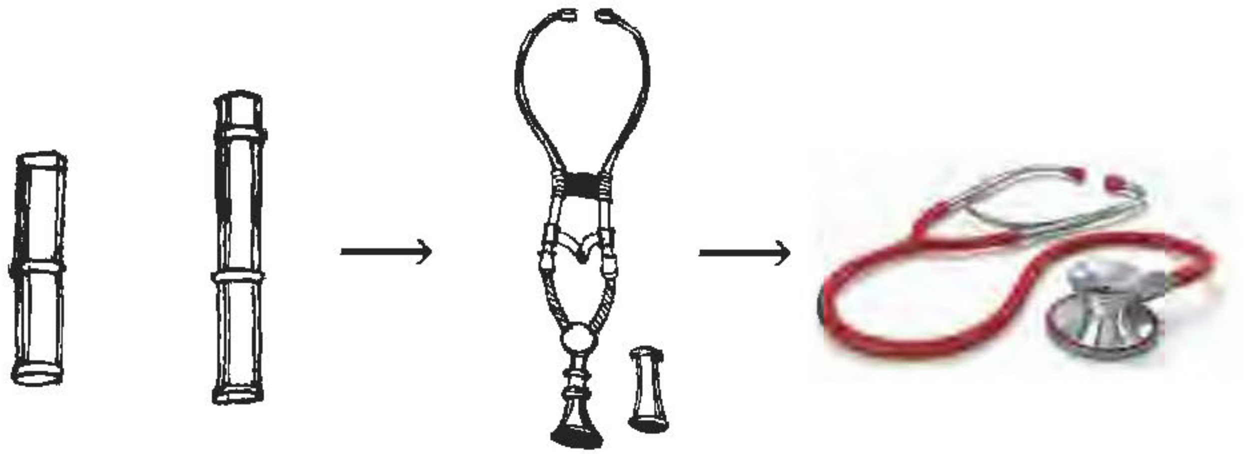

লিনেকের বানানো স্টেথোস্কোপ — প্রথম দু-নলা স্টেথোস্কোপ — আজকের স্টেথোস্কোপ

মাটির তলার মাটি

অজিতদের বাড়িতে টিউবওয়েল বসাচ্ছেন রতনকাকুরা। প্রথমে খানিকটা খুঁড়ে নিল। তারপর মাটিতে পাইপ বসানো শুরু হলো।
একটু পরেই অজিত দেখল পাইপের মুখ থেকে জল আর মাটি উঠছে। কাঁকর মাটি। বালি মাটি। মিহি মাটি।
ক্লাসে সেদিন মাটি নিয়ে কথা হচ্ছিল। অজিত কল বসানোর সময় দেখা মাটির কথা বলল। স্যার বললেন— কল বসানোর সময় তলার মাটি কেমন তা জানা যায়।
মিতা বলল— উপরের মাটি আর তলার মাটি কি আলাদা হয়?
— কিছুটা আলাদা তো হবেই। ওপরের মাটি মিহি। যত নীচের মাটি তত কাঁকর ও নুড়ি বেশি। গ্লাসে জল নাও। মাঠ থেকে খানিকটা মাটি নিয়ে এসো। সেটা গ্লাসের জলে গুলে থিতিয়ে নাও। বুঝতে পারবে।
অজিত আগেই প্রশ্ন করল— কী দেখা যাবে, স্যার?
— এই মাটিতে ভারি ও হালকা নানা কিছু আছে। ভারি গুলো নীচে থিতিয়ে পড়বে ও হালকাগুলো ওপরে ভেসে উঠবে।
জলে মাটি গুলে থিতিয়ে সব দেখা হলো। তারপর অজিত বলল— উপরের মাটি গুলে দেখলেও এইরকম দেখা যাবে?
— অনেকটা একইরকম হবে। উপরের শুকনো মাটি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখো।
রাবেয়া বলল— একইরকম হবে কেন? উপরের মাটিও কী এইরকম?
— মোটামুটি একইরকম হবে।

পরীক্ষা করে লেখো

কাছেপিঠে যে মাটির ঢেলা পাবে তা নিয়ে জলে গুলে পরীক্ষা করে লেখো। ভালো করে দেখো পর পর কী জমছে। তারপর পাশে লেখো :

একটা বড়ো কাচের গ্লাসে জল নিয়ে তাতে এক দলা মাটি গুলে দাও।

মাটি গোলার পর কী হয় দেখো। ঘণ্টা কয়েকপরে গ্লাসের উপরে ও পাশের দিকে দেখো। যা দেখছ তা আঁকো ও পাশে লেখো।

মাটি দেখা

পর দিন। স্যার বললেন— শুকনো মাটির দলা গ্লাসের জলে ফেলে কী দেখলে? এঁকে দেখাও তো!

সীমা বোর্ডে আঁকল। ছবিতে দেখাল, মাটির দলা জলে ফেলা আছে। তা থেকে বুজ বুজ করে বাতাস উঠেছে।

স্যার বললেন— বাঃ! মন দিয়ে দেখেছ তো! জলে গোলা মাটি থিতানোর পর কী ভাসছিল?

পরীক্ষা করে লেখো

জলে নানা জিনিস (লোহা, ইট ইত্যাদি) ফেলো। কী ঘটে দেখে পাশে লেখো: ⇒

জিনিসের নাম	কী ঘটল	কেন এমন ঘটল

রেহানা বলল— পাতার গুঁড়ো ছিল। গুঁড়ো চায়ের মতো। ফুলের পাপড়ির টুকরো, আরশোলার পা ছিল।

নবীন বলল— তুই কী করে বুঝলি কোনটা কী?

— আমার একটা লেন্স আছে। সেটা দিয়ে দেখলে বড়ো দেখায়।

— তাই বল! আমি তো খালি চোখে দেখেছি। এত কিছু তো বুঝিনি!

— লেন্স কিন্তু ইংরাজি কথা। বাংলায় বলে আতশকাচ। শুকনো মাটি নিয়ে দেখবে। যে যেখান থেকে পারো মাটি জোগাড় করো। মাটিটা ভালোভাবে ভাঙবে। তারপর ভালো করে দেখবে। তাতে কী কী আছে। দানাগুলোর আকার কেমন।

দেখে বুঝে লেখো

কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে মাটি এনে গুঁড়ো করে ভালো করে দেখে লেখো:

কোথাকার মাটি	কী দিয়ে দেখেছ	কী কী দেখেছ	সেগুলো কোথায় পাওয়া যায়	দানাগুলোর আকার কেমন

মাটি দিয়ে পাকা বাড়ি!

সবাই মন দিয়ে মাটি দেখল। একটু করে শুকনো গুঁড়ো মাটি নিয়ে এল। কী দেখেছে তা লিখেও আনল। কিন্তু সবার দেখা একরকম হলো না। সমীরের আনা মাটি দেখে স্যার বললেন— এত শক্ত মাটি এমন মিহি করে গুঁড়ো করলে কীভাবে?

— মুগুর দিয়ে ভেঙেছি। তারপর হামানদিস্তা দিয়ে গুঁড়ো করেছি। ময়দার মতো হয়ে গেছে। আলাদা আলাদা কণা বোঝাই যাচ্ছে না।

— এই হলো কাদার কণা। কণাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে একটু জল আর বাতাস থাকে। জল শুকোলে কণাগুলো গায়ে গায়ে লেগে শক্ত হয়ে যায়।

— ভাঙা খুব কঠিন! গুঁড়ো করে জল দিলেই আঠার মতো, যেন সিমেন্ট!

হরিশ বলল— তাহলে লোকে আর সিমেন্ট কিনবে না। এই মাটি দিয়েই পাকা বাড়ি গাঁথবে!

— আগে তাই করত। ওইরকম কাদায় মিহি বালি মিশিয়ে তাই দিয়ে ইট গাঁথত।

— এখনও তেমন বাড়ি আছে?

— অনেক বাড়ির একতলাই ওভাবে গাঁথা। তখন সিমেন্ট তেমন পাওয়া যেত না।

হরিশ বলল— সিমেন্ট পাওয়া যেত না? সে কত বছর আগে?

— সিমেন্ট প্রথম হয়েছে প্রায় দুশো বছর আগে। এদেশে তৈরি শুরু হয়েছে প্রায় একশো কুড়ি বছর আগে। আর বেশি ব্যবহার হচ্ছে সত্তর-আশি বছর হলো। তারপর একটু থেমে বললেন— এটা এঁটেল মাটি। এতে জল দিলে ঠিক কী হয় দেখতে হবে।

রাবেয়া নিজের আনা মাটির কিছু কণা দেখিয়ে বলল— মাটির এই কণাগুলো বেশ বড়ো বড়ো। খালি চোখেই বোঝা যাচ্ছে।

— এগুলো বালির কণা। কাদার কণার চেয়ে বড়ো। এই মাটিকে বলে বেলে মাটি। এতেও আমরা জল দিয়ে দেখব।

মিনতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল— স্যার, আমার আনা মাটির খানিকটা জলে গুললাম। ভালো করে থিতাল না। জলটা ঘোলাই রয়ে গেল।

মাটি দেখে স্যার বললেন— এটা দোঁয়াশ মাটি। বালি আর কাদা প্রায় সমান সমান। কিছুটা জৈব পদার্থ আর মাটির নানা অস্বাভাবিক উপাদানও এতে আছে।

— গোবর, মাছের কাঁটা, পচাপাতার কুচি, এগুলো তো জৈব পদার্থ। মাটির অস্বাভাবিক উপাদান কী?

— এই দেখো। পলিথিনের কুচি। অ্যালুমিনিয়ামের কুচি। পেনের রিফিলের টুকরো। পেনসিলের শিস। স্যার আতশ কাচ দিয়ে মিনতিকে এইসব দেখালেন। তারপর বললেন— এর কিছু জলে ডোবে। আবার কিছুটা ভাসে বা আধ-ডোবা হয়ে থাকে। জৈব পদার্থও তাই। সেজন্য জলে এই মাটি গুললে থিতানো মুশকিল।

পরীক্ষা করে লেখো

তোমার বাড়ির কাছাকাছি জায়গার শুকনো মাটি নাও। পরীক্ষা করে ওই মাটির উপাদান বিষয়ে লেখো:

তোমার ঠিকানা	কীভাবে গুঁড়ো করেছ	কী উপাদান দেখেছ	
		স্বাভাবিক উপাদান	অস্বাভাবিক উপাদান

মাটি ও জলের বোঝাপড়া

স্যার ক্লাসে এলেন। হাতে একটা ব্যাগ। তা থেকে একটা পলিথিনের কৌটো বের করলেন। তার মুখটা খোলা। কৌটোর পিছনদিকটা দেখালেন। অনেকগুলো ফুটো। এবার একটা ফিল্টার পেপার বের করে কৌটোটার তলায় বিছিয়ে নিলেন। তারপর বললেন—এটার ভিতর দিয়ে জল গলে যাবে, মাটির কণারা যাবে না। তারপর সমীরের আনা এক কাপ মাটি ঢাললেন। কৌটোটা একটা কাচের গ্লাসের উপর বসালেন। বললেন—সমীর, এর উপর জল ঢাললে। কী দেখা যাবে বলো?

সমীর বলল—মাটিটা ভিজবে। আর খানিকটা জল চুঁইয়ে নীচের গ্লাসে পড়বে।

রাবেয়া বলল— স্যার, আর দুটো কৌটো দেবেন? আমি আর মিনতি যে মাটি এনেছি তাতেও জল ঢালব।

স্যার আরও দুটো কৌটো, ফিল্টার পেপার দিলেন। রাবেয়া আর মিনতি সেই কৌটোগুলোর তলায় ফিল্টার পেপার বিছিয়ে নিল। তারপর নিজেদের আনা মাটি এক কাপ করে ঢালল।

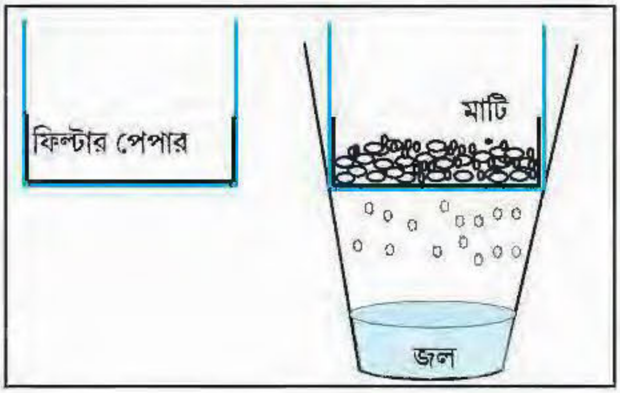

স্যার বললেন—এবার যে যা মাটি এনেছ তার উপর দু-কাপ করে জল ঢালো। তারপর দেখো কী হয়।

ওরা সবাই খুব সাবধানে জল ঢালল। স্যার বললেন— ভালো করে দেখো। কোন কৌটো থেকে আগে জল পড়া শুরু হয়। কোনটা থেকে বেশিক্ষণ ধরে জল পড়ে। আর কোনটা থেকে নীচের গ্লাসে বেশি জল জমে। তারপর যা দেখলে তা লেখো। আর তা থেকে কী কী বোঝা গেল তাও লেখো।

পরীক্ষা করে লেখো

সমীর, রাবেয়া আর মিনতির মতো করে এঁটেল, বেলে আর দোআঁশ মাটি নিয়ে পরীক্ষা করো। কী দেখেছ আর কী বুঝেছ লেখো। কীভাবে পরীক্ষা করেছ তা এঁকে দেখাও:

আগে জল পড়া শুরু হয়	বেশিক্ষণ ধরে জল পড়ে	নীচের গ্লাসে বেশি জল জমে	বোঝা গেল (এঁটেল/ বেলে / দোআঁশ: যেটা ঠিক সেটা লেখো)
			তাড়াতাড়ি জল বেরিয়ে যায় ______ মাটি থেকে।
			ভিজতে বেশি সময় লাগে ______ মাটির।
			বেশি জল বেরিয়ে যায় ______ মাটি থেকে।
			বেশি জল ধরে রাখতে পারে ______ মাটি।

পরীক্ষার ছবি আঁকো :

উপকার, অপকার : যত্ন ও পুষ্টি

সুধাময় দেখল মাটিতে সুতোর মতো কীসব রয়েছে। তবে সুতো নয়। স্যারকে দেখাল। দেখেই স্যার বললেন—এত কেঁচো। মাটিটা রোদে শুকিয়েছে। এরা মরে শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে।

মিনতি বলল— স্যার, ওগুলো তো মাটির স্বাভাবিক উপাদান?

—হ্যাঁ। কেঁচো মাটির সজীব জৈব উপাদান। এমন আরও অনেক ছোটো ছোটো জীব মাটিতে থাকে। কিছু খালি চোখে, কিছু আতশকাচ দিয়ে দেখা যায়। এছাড়াও এমন অনেক জীবাণুও মাটিতে থাকে যাদের এভাবেও দেখা যায় না। এরা সবাই মাটির মৃত জৈব উপাদানকে ভাঙতে সাহায্য করে। তার ফলে মাটি উর্বর হয়।

রিয়াজ বলল - সার দিলেও তো মাটি উর্বর হয়। নাইট্রোজেন সার, ফসফেট সার, কম্পোস্ট সার ।

—সার থেকে বিভিন্ন উপাদান নেয় গাছ। সব সারের মধ্যে অনেক উপাদান একসঙ্গো থাকে। তার মধ্যে থেকে গাছ নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম এসব উপাদান বেছে নেয়।

— তাতে মাটির সজীব উপাদান কীভাবে সাহায্য করে?

তপন বলল —কম্পোস্ট তো জৈব সার। অনেক ভাঙলে তবে গাছ নাইট্রোজেন, ফসফরাস পাবে। মাটির ভিতরের ছোটো ছোটো জীব এবং জীবাণুরা সেই কাজে সাহায্য করে। আধপচা পাতা ভাঙতেও সাহায্য করে।

স্যার বললেন—ঠিক বলেছ! কিন্তু তুমি এত জানলে কী করে?

— আমাদের জৈব সারের দোকান আছে। বাবা আলোচনা করছিল। আমি শুনে, বুঝে নিয়েছি। আগে জৈব সারই ছিল। রাসায়নিক সার অনেক পরে এসেছে।

মিনতি বলল— পলিথিন, প্লাস্টিক এগুলো কীভাবে ভাঙে?

— ভাঙে না। ওগুলো মাটিকে আলো-হাওয়া পেতে দেয় না। গাছের শিকড়গুলোকে মাটিতে ঢোকার সময় বাধা দেয়।

— শিকড় মাটিতে ঢুকতে না পারলে মুশকিল! ঝড়ে গাছ উলটে যাবে।

রিয়াজ বলল— ওগুলো মাটির শত্রু। বেছে এক জায়গায় জড়ো করে রাখতে হবে। দেখতে হবে, আবার যেন না উড়ে যায়। আর পলিথিনের ব্যবহারও কমাতে হবে।

বলাবলি করে লেখো

মাটি ভালো রাখা বিষয়ে আলোচনা করে লেখো:

মাটির উপকারী উপাদান	
কীভাবে উপকার করে	
মাটির ক্ষতিকর উপাদান	
কীভাবে ক্ষতি করে	
উপকারী উপাদান বাড়াতে আর ক্ষতিকর উপাদান কমাতে আমরা কী কী করব	

মাটি থেকেই সোনার ধান

আমন ধান রোয়ার জন্য জমিতে একটু জল দাঁড়াতে হয়। ধানের ছোটো চারা বীজতলা থেকে তুলে বসানো হয়। তবে আউশ ধানের জন্য বীজতলা দরকার হয় না।

রোয়ার আগে মাটিটা কাদা করতে হয়। টানা বৃষ্টি হলে নীচু জমিতে জল দাঁড়ায়। তখন বীজতলা থেকে বীজধান উপড়ে রুয়ে দেয়।

অপর্ণা চাষের কাজ দেখেনি। তাই বলল— বীজধান মানে কী?

সমীর বলে দিল—প্রথমে ছোটো জায়গায় ধান ছড়াতে হয়। এটা বীজতলা। ঘন হয়ে ছোটো ছোটো চারাগাছ বের হয়। সেই গাছগুলোকে বলে বীজধান। হাতখানেক হলে সেগুলো তুলে বসাতে হয়। বিঘতখানেক অন্তর সারি দিয়ে বসায়। সেই চারা বসানোকে বলে রোয়া।

স্যার বললেন— তাই যে মাটি সহজে কাদা করা যায় তাতেই সহজে জল জমে। সেখানেই ধান রোয়া যায়। সেই মাটিই ধান চাষের জন্য ভালো।

পরীক্ষা করে লেখো

তোমার কাছাকাছি যেখানে ধান চাষ হয়, সেখান থেকে কিছুটা মাটি সংগ্রহ করো। সেই মাটি কী ধরনের তা পরীক্ষা করে কী পেলে তা লেখো। কীভাবে পরীক্ষা করলে তার ছবি আঁকো ও লেখো:

মাটির উপর চা গাছ

শুধু ধান নয়, সব খাদ্যের জন্যই মাটি দরকার। তাই কি? মাছ, মাংস, ডিম তৈরি করতেও? হ্যাঁ, দরকার। কারণ, মাটি ছাড়া গাছ হবে না। গাছ অথবা শস্য খেলে তবেই তো প্রাণীদের মাংস হবে! পুকুরও তো মাটির উপরেই। তাই, মাটি ছাড়া মাছও হবে না। সকালবেলার চা থেকে সব খাবার পেতেই মাটি চাই।

রাবেয়ারা অবশ্য মাটির উপর চা-গাছ দেখেনি। শুধু শুনেছে দার্জিলিং-এর পাহাড়ে চা হয়। সেও কি আসলে মাটিতে?

স্যার বললেন— মাটিতে তো বটেই। দার্জিলিং-এর পাহাড়েও মাটি থাকে। তার উপরেই চা-গাছ হয়।

অজিত বলল— পাহাড়ে ধান, শাক-সবজি হয় না?

— হয়, সবেরই চাষ হয়। উঁচু তো। মে-জুন মাসেও ঠান্ডা। কপি হয়। পাহাড়ের ঢালে চাষের ছোটো ছোটো জমি তৈরি করে নেওয়া হয়। অনেকটা সিঁড়ির মতো। সেখানে জল আটকে ধান চাষও হয়।

ওরা এত জানত না। শ্যামল বলল - পাহাড়ে এত মাটি আছে?

—ধান বা শাক-সবজি চাষে মোটে এক-দেড় ফুট গভীর মাটি লাগে।

— বড়ো গাছ হয় না?

—বড়ো গাছও হয়। বড়ো গাছের শিকড় পাথরের ফাঁকে মাটিতে ঢুকে যায়। কখনও পাথর ফাটিয়েও ঢুকে যায়।

— পাথরের ভিতরে মাটি আসে কোথা থেকে?

—ভূমিকম্পে, সূর্যের তাপে, প্রবল বৃষ্টিতে পাথর ফেটে গুঁড়ো হয়। অনেক বছর ধরে অনেক কিছুর সঙ্গে তা মিশে মাটি হয়। মস, ফার্নরাও মাটি তৈরিতে সাহায্য করে। এভাবে মাটি তৈরি হতে হাজার হাজার বছর সময় লাগে। সেই মাটির কিছুটা পাথরের ফাটল দিয়ে ভিতরে চলে যায়। আবার কিছুটা বৃষ্টিতে ধুয়ে সমতলে এসে থিতোয়। তবে মনে রেখো পাহাড়, সমতল সর্বত্রই খাদ্য তৈরি করতে মাটি চাই।

বলাবলি করে লেখো

টবে বা মাটিতে ফুল বা শাক-সবজি চাষ বিষয়ে নিজেরা আলোচনা করে লেখো:

কীসের চাষ	চাষ করতে কতটা গভীর মাটি লাগে	কেমন ধরনের মাটি লাগে	কীভাবে সেই মাটি চাষের যোগ্য করা হয়

ধসে রাস্তা বন্ধ

রেডিয়োর খবরে দীপেন ধসের কথা শুনল। দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ির পথে ধস নেমেছে। সব গাড়ি ঘুরপথে যাচ্ছে। স্কুলে এসে সে অন্যদের বলল সেকথা। ধস কী? কীভাবে হয়? শেষে স্যারকে জিজ্ঞাসা করল।

স্যার বললেন — মাটি ধসে পড়া দেখোনি?

— পুকুর পাড়ের মাটি মাঝে মাঝে ধসে পড়ে।

—পুকুরের পাড় খাড়া। সেইরকম খাড়া পাহাড়ের রাস্তার ধার। উপরে দেখবে একটা বড়ো পাথর। হয়তো তার তলায় মাটি। উপরের পাথরটা অনেক দিন ধরে একটু করে সরছে। খুব বৃষ্টিতে তলার মাটিটা গলে গেল। পাথরটা পড়ে গেল। পড়ার সময় আরও কিছু গাছ-পাথর নিয়ে পড়ল। ভূমিকম্প হলেও পাহাড়ে ধস নামে।

রানু বলল— বড়ো গাছ থাকলে সহজে এমন হয় না। ঘাসের চাপড়া থাকলেও ধসে না।

সুবীর বলল— কী করে জানলি? তুই পাহাড়ে গিয়ে দেখেছিস?

— তা নয়। পুকুরের কথা বলছি। আমাদের পুকুরের পাড়ে একটা জামগাছ আছে। ঝড়বৃষ্টির পর পাশের মাটি ধসে পড়ে। কিন্তু, গাছটার গোড়ার কাছের মাটি ধসে না।

—এই তো বেশ দেখেছ। সব জায়গায় এমন পাড় ভাঙে। এভাবে মাটি সরে যাওয়াকে বলে ভূমিক্ষয়।

সাবিনা হেসে বলল - বুঝেছি। ভূমি তো মাটি। ক্ষয় হওয়া মানে নষ্ট হওয়া।

— কীভাবে ভূমিক্ষয় বাড়ে ভেবে দেখো। ধরো, একটা পলিথিন। তার উপরে মাটির যে কণা আছে তার সঙ্গে নীচের কণার ছোঁয়া থাকে না। ফলে জোর বৃষ্টি বা ঝড় হলে উপরের মাটি সরে যায়।

মিনতি বলল— সেইজন্যই বলে, পাহাড়ে পলিথিন, প্লাস্টিকের কাপ, ওযুধের মোড়ক এসব ফেলা যাবে না।

দীপেন বলল— আর গাছ কাটা যাবে না। মাটি ধরে রাখে এমন গাছ লাগাতে হবে। তাহলেই ধস কমবে।

বলাবলি করে লেখো

ভূমিক্ষয় ও তার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করে লেখো:

কী কী ভাবে ভূমিক্ষয় হয়	ভূমিক্ষয়ের ফলে কী কী অসুবিধা হয়	কী কী করলে ভূমিক্ষয় কমবে

চেনা চেনা জলাশয়

নাম তার মোতিবিল বহুদূর জল
হাঁসগুলি ভেসে ভেসে করে কোলাহল।
পাঁকে চেয়ে থাকে বক, চিল উড়ে চলে
মাছরাঙা ঝুপ করে পড়ে এসে জলে।

সহজ পাঠ প্রথমভাগ পড়ার সময় থেকেই কালাম মোতিবিলটা খুঁজছে। বাড়ির পাশের পুকুরেই হাঁসের দল ঘোরে। মাঝে মধ্যেই মাছরাঙা ছোঁ মেরে মাছ নিয়ে যায়। পাড়া ছেড়ে একটু গেলেই চখাচখির বিল। সেখানে বক পাঁকের মধ্যে মাছ খোঁজে। একদিন একটা চিল সাঁ করে এল। জল ছুঁয়ে নখে করে মাছ নিল। উড়ে গেল।

বিলের পাশ দিয়ে রাস্তা। তার ওপাশে একটানা নয়ানজুলি। ওটাও জলাশয়। মাছ আছে ওখানেও। নয়ানজুলিতে লোকেরা মাঝেমধ্যে মাছ ধরে। নিজেরা খায়, বিক্রি করে।

কালাম স্কুলে এসব বলায় দিলীপ বলল— গাঁয়ের শান-বাঁধানো পুকুরটার কথাই ভুলে গেলি! আর দক্ষিণপাড়ার মাছের ভেড়িগুলো?

স্যার বললেন— শুধু ওটা কেন? আরও জলাশয় আছে। তবে আজকাল অনেক পুকুরের চারপাশ পাকা করে দেওয়া হচ্ছে। তাতে কচ্ছপ, ব্যাঙের মতো অনেক জীবের বিপদ হতে পারে। বাড়ি থেকে স্কুলের পথের পাশের সবকটা জলাশয়ের মানচিত্র আঁকতে পারবে?

তিয়ান বলল— বোর্ডে আঁকব?

—আঁকবে। আগে বলত ঘরবাড়ি কীভাবে দেখাবে?

তিয়ান বলল— ওসব দেখাব না। জলাশয়-মানচিত্র তো!

কালাম বলল— তোদের তো দুটো রাস্তা। একটা রাস্তার পাশে বাঁওড় আছে। সেটা কীভাবে দেখাবি?

হাসি বলল— বাঁওড় কী?

রেবা বলল— নদীর বাঁকে খানিকটা জায়গা নদী থেকে আলাদা হয়ে বদ্ধজলা হয়ে যায়। তাকে বলে বাঁওড়।

আকাশ বলল— স্যার, পাহাড়ি অঞ্চলে ঝরনা আছে।

—তুমি আগে পাহাড়ি অঞ্চলে থাকতে, তাই না? পাহাড়ে অনেক ছোটো ছোটো ঝরনা আছে। তাদের বলে ঝোরা।

— সেখানকার জলাশয়-মানচিত্র আঁকব?

— নিশ্চয়ই আঁকবে।

বলাবলি করে লেখো

তোমার দেখা সবচেয়ে বড়ো জলাশয়ের কথা লেখো:

জলাশয়টার নাম ও ঠিকানা	সেখানে কী কী আছে	কী কী পশুপাখি সেখানে আসে	সেটা মানুষের কী কী কাজে লাগে

নতুন করে চিনছি আবার চেনা পুকুর-বিল

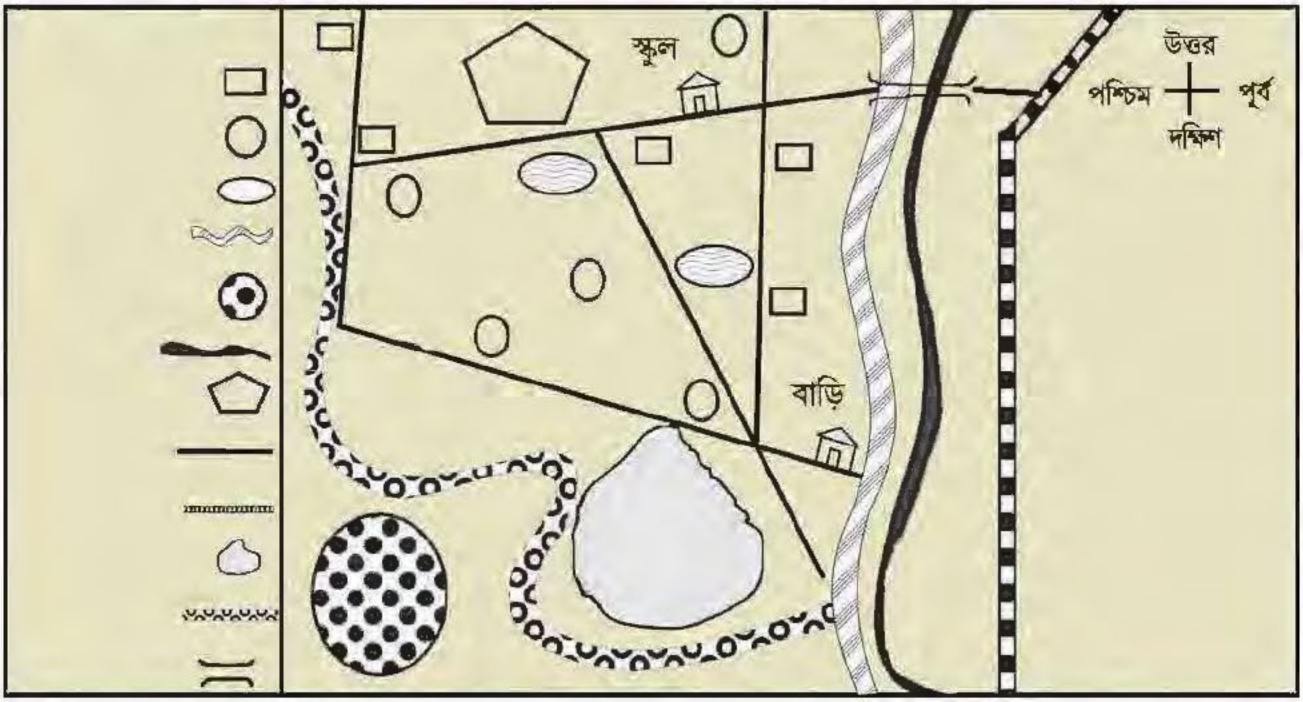

তিয়ানের জলাশয়-মানচিত্র আঁকা হয়ে গেল। মানচিত্রে সব জলাশয় রয়েছে। সাবির গুনল। শান-বাঁধানো পুকুর দুটো। সাধারণ পুকুর পাঁচটা। ডোবাও পাঁচটা।

তারপর একটা ছবি আঁকল। বলল— যেভাবে টিভিতে ক্রিকেট খেলায় ওভার প্রতি রান দেখায়, সেভাবে পুকুরের সংখ্যা দেখালাম।

স্যার বললেন— নদী আর নয়ানজুলি কটা করে দেখছ?

— একটা করেই।

— রাস্তাটা কি তিয়ান ঠিকঠাক দেখিয়েছে?

সুবোধ বলল— হ্যাঁ, স্যার। আমরা একসঙ্গে আসি। বর্ষাকালে ঘুরপথেই আসতে হয়। তখন আসতে প্রায় আধ-ঘন্টা লাগে। আর শীতে বা গরমে নদীর পাশ দিয়ে আসি। তখন মিনিট পনেরো লাগে।

— বেশ। তাহলে দূরত্বটা তিয়ান আন্দাজ করেছে ভালো। আর দিকটা?

— তাও ঠিক দেখিয়েছে। স্কুল থেকে ওদের বাড়িটা দক্ষিণেই পড়ে।

— তাহলে এটা স্কুলের কোন পাশের জলাশয় মানচিত্র?

তৃপ্তি বলল - দক্ষিণ-পশ্চিম। বাড়িটা দক্ষিণে। তবে পশ্চিমও দেখিয়েছে।

স্যার বললেন —ঠিক বলেছ। আচ্ছা, সাবির দু-রকম পুকুরের সংখ্যা দেখাল। ওইভাবে নদী আর ডোবা দেখাও।

সাবির বলল - স্যার, একটা ছবিতে সবই দেখানো যাবে। দু-রকম পুকুর, বিল, বাঁওড়, ভেড়ি, নদী – সব কিছুর সংখ্যাই।

— বেশ তাই দেখাও।

তুমি যেখানে থাকো সেখানে নদী আর ডোবা ক-টা করে আছে তা উপরে ডান পাশের খোপে দেখাও। সব কিছু ক-টা করে আছে তা নীচে দেখাও:

নতুন জলাশয়

সাবিনাদের বাড়িটা স্কুল থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে। এদিকটায় বিল-ভেড়ি কিছুই নেই। একটু শহরের দিক তো! নদীটাও উত্তর থেকে দক্ষিণে গেছে। শুধু বাড়ি আর পাঁচটা পুকুর। তার দুটো ঘাট শান-বাঁধানো।

সাবিনা রাস্তার পাশের জলের কলগুলো দেখতে লাগল। আট জায়গায় কল। তার মধ্যে তিনটে ভাঙা। জল পড়েই যাচ্ছে। দুটো কলে কেউ জল নিতে আসেনি।

পরদিন সবাই নিজের আঁকা মানচিত্র দেখাল। অন্তরাদের বাড়ি স্কুলের উত্তর-পশ্চিমে। তার মানচিত্রে অনেক ছোটো ডোবা রয়েছে। শিবা দেখিয়েছে দক্ষিণ-পূর্বটা। ওদিকে চারটে শান-বাঁধানো পুকুর। তিয়ান এঁকেছিল দক্ষিণ-পশ্চিমের মানচিত্র। অন্যরাও এঁকেছে। সাবিনা একাই এঁকেছে উত্তর-পূর্ব দিকের মানচিত্র। আসলে ওদিকের বেশি ছেলেমেয়ে এই স্কুলে পড়ে না।

স্যার চারদিকের চারটে মানচিত্র নিয়ে বোর্ডে লাগিয়ে দিলেন। বললেন— এই হলো স্কুলের চারপাশের জলাশয়-মানচিত্র। এটা ভালো করে দেখে নাও। কোথায় কোন জলাশয় আছে। তারপর নিজেরা আঁকবে।

অন্তরা বলল—স্যার, জলের কলটা কি জলাশয়?

স্যার হেসে বললেন— আমিও তাই ভাবছি! জলাশয় না হোক জলের উৎস তো বটে। একটা জলের কল থেকে রোজ কতটা জল পড়ে? তুমি যে ডোবা দেখিয়েছ তার সবচেয়ে ছোটোটা ভরতি হবে? একটু থেমে আবার বললেন,

— অনেকেই শহরে থাকে। তারা তো দু-একটা পুকুর ছাড়া জলাশয় দেখাতে পারবে না। সাবিনা ভালোই করেছে। শহরের জলের ট্যাঙ্ক, রাস্তার পাশের জলের কল আর পুকুর দেখিয়েছে। তার চিহ্ন ঠিক করেছে।

অন্তরা বলল— একটা কল থেকে একদিনে অনেক জল পড়ে। কতটা জল পড়ে তা কি হিসেব করা যায়?

— নিশ্চয়ই করা যায়। ভাবতে থাকো। কীভাবে করা যাবে।

তোমার স্কুলের চারপাশের জলাশয়-মানচিত্র নীচে আঁকো। আর একটা বড়ো কাগজেও আঁকো :

উত্তর
পশ্চিম — পূর্ব
দক্ষিণ

স্কুল

স্রোতের জল, স্থির জল

ফেরার পথে আকাশ বলল - পাহাড়ের বেশিরভাগ জলাশয়ে খুব স্রোত।
অন্তরা বলল— উঁচু-নীচু তো। যেখানেই নীচু পাবে জল সেদিকে হুহু করে যাবে।

রফিকুল বলল — বর্ষাকালে এখানেও মাঠের পাশে নালায় স্রোত হয়। নয়ানজুলিতেও স্রোত দেখা যায়। কোনদিক থেকে কোনদিকে জল যায় দেখেছিস? দেখলেই এখানকার জমি কোথায় উঁচু কোথায় নীচু বোঝা যাবে।

— নীচু জায়গাগুলোয় বৃষ্টির জল জমে। জলাশয় হয়ে যায়।

সাবিনা বলল - বাড়িতে ব্যবহার করা জলও পুকুরে পড়ে।

— তোদের ওদিকে পড়ে। চারপাশে পাকা ড্রেন। মাঝখানে পুকুর। তাই ড্রেনের জল আসে। গরমেও জল শুকোয় না।

রফিকুল বলল— ড্রেনের নোংরা জল পুকুরে জমে?

সাবিনা বলল— তবে জলটা তত নোংরা হয় না।

কিন্তু কেন হয় না?

স্যার বললেন — বাতাস বয়। বাতাসের অক্সিজেন জলে গুলে যায়। জলে-পড়া নোংরার সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে। সেগুলো ভেঙে দেয়।

— স্যার, রাসায়নিক বিক্রিয়া কী?

— দুধে লেবুর রস দিলে কী হয়? কাপড়ের দাগে লেবুর রস দিয়ে দেখেছ?

কমলা বলল - দুধ কেটে ছানা হয়ে যায়। ছানা আর ছানার জল আলাদা হয়ে যায়। ছানা আর দুধ হয় না।

তিতলি বলল— জামায় দাগ উঠছিল না। লেবুর রস দিতে উঠে গেল।

— এগুলোই রাসায়নিক বিক্রিয়া।

বলাবলি করে লেখো

আর কোথায় রাসায়নিক বিক্রিয়া হওয়া দেখেছ? এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো। তারপর লেখো:

কোথায় রাসায়নিক বিক্রিয়া হওয়া দেখেছ	তার ফলে রং বদলে যাওয়া বা বিক্রিয়ায় কী তৈরি হয়েছে বা অন্য কী ঘটেছে
চকচকে লোহার পেরেক বাতাসে ফেলে রাখলে	
কয়লা পোড়ানো হলো	
আলু কেটে ফেলে রাখা হলো	

জলশোধনের নানাকথা

কমলা বাড়ির কাছে পৌঁছে গেল। তবুও ভাবছে। জলের সব নোংরার সঙ্গে কি বাতাসের অক্সিজেন রাসায়নিক বিক্রিয়া করে? তাহলে পুকুরে গোরু স্নান করালে ক্ষতি কি? যে যা খুশি ফেলুক না! কিন্তু তাহলে কেন ওরকম বোর্ড লাগিয়েছে পুকুরের গায়ে? নাকি বুঝতে ভুল হলো!

পরের দিন। কমলা ওর ভাবনার কথা বলল। স্যার বললেন— সব কিছুর সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেন কী করে বিক্রিয়া করবে? প্রাকৃতিক জল শোধনে আরও অনেকের সাহায্য আছে। শুধু বাতাসের অক্সিজেন নয়।

জবা বলল— অনেক কিছু মাছে খেয়ে ফেলে।

— ঠিক বলেছ। আরও অনেক ছোটো-বড়ো জীব আছে। তারা কিছু নোংরা খায়। অন্যভাবেও জলে অক্সিজেন তৈরি হয়। এই অক্সিজেন আর বাতাসের অক্সিজেন মিলে কিছু নোংরা শোধন করে।

সতর্কীকরণ

পুকুরে গবাদি পশু স্নান করানো, মল-মূত্র পরিত্যাগ করা, বাড়ির আবর্জনা, পলিথিন ইত্যাদি ফেলা ও বাসন মাজা নিষিদ্ধ।

স্বপ্নার বাবা মাছ চাষ করেন। স্বপ্না বলল— মাছের ঘা সারাতে বাবা জলে একটা ওষুধ দেন। বাবা বলে ওতে জলও শোধন হয়।

— ওটা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট। দূষিত জিনিস তাড়াতাড়ি ভেঙে জলশোধন করে।

কমলা বলল— তবু কেন পুকুরে গোরুকে স্নান করানো বারণ? গোরুর থেকে নানারকম রোগ-জীবাণু ছড়াতে পারে বলে?

— সে তো বটেই। তাছাড়া বেশি রাসায়নিক পদার্থ দিলে অন্য ক্ষতি হবে। নোংরা ফেলা যতটা সম্ভব কমাতে হবে। তাতেও যেটুকু নোংরা হবে দুই পদ্ধতিতে শোধন করতে হবে।

স্বপ্না বলল - দুই পদ্ধতি মানে?

— একটা প্রাকৃতিক পদ্ধতি। আর একটা জলে রাসায়নিক দেওয়া। তোমার বাবা যা করেন। তবে আবার বলছি। ওইসব রাসায়নিক মেপে দিতে হয়। না হলে মাছ বা অন্য জীব মরে যাবে।

সাবিনা বলল — পুকুর না থাকলে আমাদের পাড়াটা তো নোংরা গন্ধে ভরে যেত!

— ঠিক তাই। আমরা নোংরা ফেলি, জলাশয় তার কিছুটা পরিষ্কার করে।

বলাবলি করে লেখো

জলাশয় নোংরা হওয়া ও তার শোধন করা নিয়ে আলোচনা করো। তারপর লেখো:

জলাশয়ে কী কী নোংরা মেশে	তার ফলে কী কী সমস্যা হয়	কী কী ভাবে জলাশয়ের জলশোধন হয়
১. কল-কারখানার বর্জ্য		
২. মরা জীব-জন্তুর দেহ		
৩. তরকারির খোসা		
৪. রাসায়নিক সার		
৫. পোকামারার বিষ		
৬. কাপড় কাচা সাবান		

ঘরের বাহিরে তাকিয়ে দেখা

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া

শান-পুকুরের ঘাট। সুবোধ আগেও এসে বসেছে। কিন্তু এমন করে পুকুরটা দেখেনি। ঘাটটা পূর্বদিকে। পাড়গুলো উঁচু করে বাঁধানো। সুবোধ এবার পাড় ধরে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে লাগল। চারপাশ ঘুরে আসতে কত-পা হয়। গুনে নেবে।

একটু এগিয়ে সুবোধ দেখল, পাড়ের পাশে কত রকম ঘাস, ঝোপ, ফুল। জলের মধ্যেও গাছ! শালুক ফুল, ছোটো ছোটো পানা। জলের খুব কাছে লতার মতো গাছ। খাঁজকাটা পাতা। ঠাকুমা মাঝে মাঝে এইরকম আনে। বলে ঢেঁকি শাক।

সুবোধ কখনও পাড়ের গাছপালা দেখতে দাঁড়াচ্ছে। তখনই লিখে রাখছে কত পা হল। পাড়ে তালগাছ। খানিক যাওয়ার পর বাঁশঝাড়। কোথাও পাড় ভেঙে জল ঢোকার নালা হয়েছে। মাঠ থেকে বর্ষায় জল ঢোকে। আর একটু এগিয়ে কলার ঝাড়। একটায় কাঁদি ধরেছে। একটায় মোচা বেরিয়েছে।

তারপর নিলুদার ঘর। নিলুদা পুকুরের মাছ, পাড়ের গাছপালা আর পাশের আম-কাঁঠালের বাগান পাহারা দেয়। সুবোধ আবার পা গুনে গুনে হাঁটতে শুরু করল।

পরদিন স্কুলে এসে সুবোধ বলল—স্যার, আমরা কোনোদিন কোনো জলাশয়ের মানচিত্র করিনি।

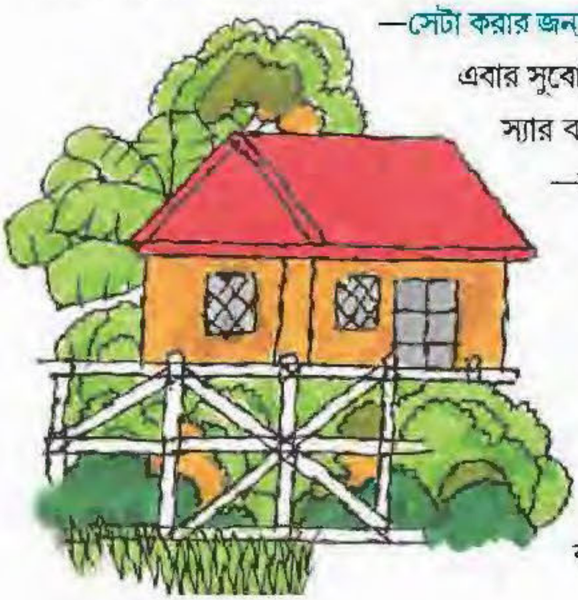

—সেটা করার জন্য আগে একটা জলাশয় খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

এবার সুবোধ ১৫৭০ পা হেঁটে শান-পুকুর ঘোরার কথা বলল।

স্যার বললেন— তোমার এক-পা মানে কতটা?

—আমার দশ-পা মানে তিন মিটার। আগেই দেখে নিয়েছি।

— ঘাটটা কোন দিকে দেখেছ? পুকুরের আকৃতিটা?

— ঘাটটা পূর্বদিকে। পুকুরটা দেখতে গোল মতন।

— তাহলে যা যা আছে তার চিহ্ন ঠিক করো। আঁকো আর বলে বলে দাও। সবাই শুনুক। এর পর সবাই একটা করে জলাশয় ভালো করে দেখবে। আর তার মানচিত্র আঁকবে।

সুবোধ দিকচিহ্ন দিয়ে আঁকা শুরু করল। কোনটা কীসের চিহ্ন তা বলে বলে আঁকতে লাগল। একটু পরে শান-পুকুরের মানচিত্র আঁকা হয়ে গেল।

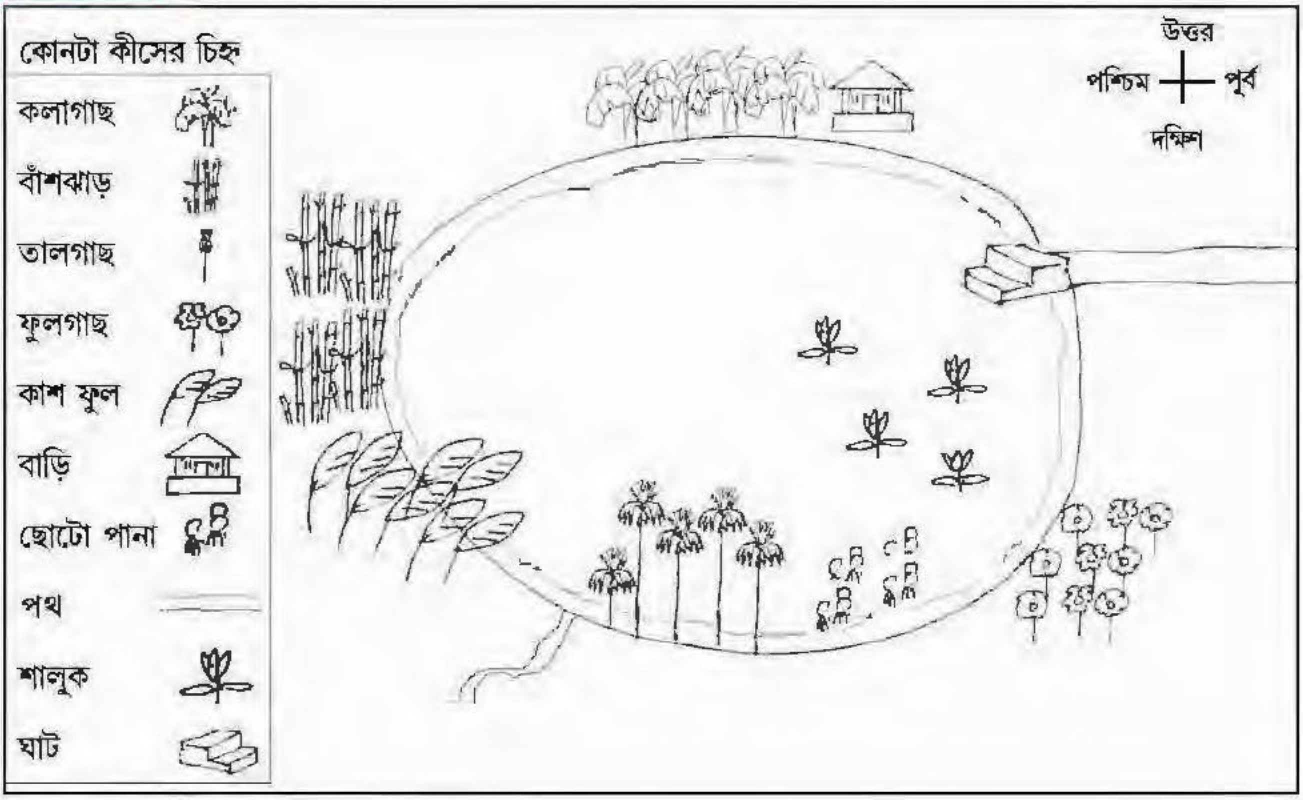

নিজের এলাকায় তোমার পছন্দমতো একটা পুকুর বা অন্য কোনো জলাশয়ের মানচিত্র আঁকো:

উত্তর

পশ্চিম — পূর্ব

দক্ষিণ

মাটির নীচের জল

পরদিনের ক্লাস। জবা বলল - আমাদের গাঁয়ে আরও বড়ো পুকুর আছে।

—সেই পুকুরেও কী জল ঢোকার অনেক নালা আছে?

— সেটার পাড় বেশি উঁচু নয়। বর্ষায় চারদিক থেকেই জল আসে।

— তাহলে ওটা পানীয় জলের পুকুর ছিল না। সুবোধ যে পুকুর দেখিয়েছিল তার পাড় উঁচু। পানীয় জলের জন্যই কাটা। পরে টিউবওয়েল চালু হয়েছে।

বীরু বলল— আগে টিউবওয়েল ছিল না?

— না, তখন কিছু পুকুর আলাদা করা থাকত। কেউ সেখানে স্নান করত না, নোংরা ফেলত না। এখনও দু-একটা এমন জায়গা আছে। সেখানে মাটির নীচে সহজে জল পাওয়া যায় না। অথবা মাটির নীচের জল খুব নোনতা।

রতন বলল— জানি, সুন্দরবনে। সাগরের কাছে তো। মাটির নীচে সাগরের জল চুঁইয়ে আসে। তাই জল নোনতা।

খালেদা বলল— এখানে মাটির নীচের জল কীভাবে এসেছে?

— হয়তো অনেক আগে থেকেই কিছুটা জল মাটির নীচে ছিল। তার সঙ্গে কিছুটা সাগরের জল চুঁইয়ে এসেছে। লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে এসেছে। একটু একটু করে, বালির ভিতর দিয়ে। কোথাও ছোটো কণার বালি। প্রায় কাদার কণার মতো। তাই নুন বেশি আসতে পারেনি।

— আর বাকিটা কীভাবে এসেছে?

— বলা কঠিন। বৃষ্টির জল চুঁইয়ে থাকতে পারে।

— নীচের জল তুললে বৃষ্টির জল আবার ঢুকে যাবে?

—সেটা সহজে হবে না। এসব হতে বহু বছর লাগে। অনেক নীচের স্তরে বৃষ্টির জল খুব সহজে যাবে না।

— তাহলে তো টিউবওয়েলে পরে আর পানীয় জল উঠবে না।

তিতলি বলল — মিনি ডিপ টিউবওয়েল দিয়ে লোকে নিজের খুশি মতো চাষের জল তুলছে।

সাবিনা বলল — খোলা কল দিয়ে তো জল পড়েই যাচ্ছে!

সুবোধ বলল — অনেক লোকালয়ে সব কাজেই মাটির নীচের জল ব্যবহার হয়। আবার গ্রামে মাটির নীচের জল তুলে ধান চাষ হয়। এভাবে মাটির নীচের জলের স্তর নেমে যাচ্ছে। তার ফলে পানীয় জল দূষিত হচ্ছে।

বলাবলি করে লেখো

কী কী কাজে মাটির নীচের জল ব্যবহার করলে ভালো হয়? এ নিয়ে নিজেরা আলোচনা করো। তারপর লেখো :

কী কী কাজে নীচের জল ব্যবহার হয়	কোন কোন কাজে মাটির নীচের জল ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই	অন্য কোন কাজে কোথাকার জল ব্যবহার করা যায়

জল নষ্ট আর জলকষ্ট

সাবিনা ফেরার পথে আবার সেই দৃশ্য দেখল। একটা জলের কল খোলা রয়েছে। কেউ জল নিতে আসেনি। সাবিনা কলটা বন্ধ করে দিয়ে এল।

তারপর হাঁটতে হাঁটতে পাড়ায় ঢুকল। হঠাৎ ওর নজরে পড়ল একটা খোলা পাইপ দিয়ে জল পড়েই যাচ্ছে। ভালো করে দেখল। দেখে বুঝল, যে ট্যাঙ্কে এসে জল জমে, এটা সেই ট্যাঙ্ক।

পরদিন স্কুলে ও এসে এসব কথা বলল। শুনে কেয়া বলল,

— আমাদের পাড়ায়ও জল নষ্ট হয়। সজলধারার জল এসেছে গত বছর। পাড়ায় ঢোকার মুখে একটা কল। দশদিনের মধ্যে কেউ ভেঙে ফেলেছে। এখন জল আসলে একটানা জল পড়ে। সকালে আমরা লম্বা লাইন দিয়ে জল ভরি। দুপুরে দু-একজন করে আসে। জল নেয়। স্নান করে। বাকি জলটা পড়ে নষ্ট হয়।

অনন্ত বলল—এক-দুই বালতি করে জল নিলে হয়? সারাদিন চলে?

— আমরা ওই জলটা খাই। অন্য সব কাজ পুকুরের জলে হয়।

— রান্না? চাল ধোয়া, আনাজপাতি ধোয়া?

—পুকুরের জলেই ওসব হয়। তবে সম্ভব হলে সেগুলো আবার কলের জলে ধোয়া ভালো।

জবা বলল— কেন? অত জল নষ্ট হয়। সেটা নিতে পারিস!

কেয়া বলল— অত দূর থেকে বেশি জল আনা মুশকিল।

স্যার শুনছিলেন। এবার বললেন— রান্নায় জল অনেকক্ষণ ফোটে। তবুও রান্নাটা পুকুরের জলে না করাই ভালো।

অনন্ত বলল— শশা কেটে খাবি। ওটা তো আর জলে ফোটাবি না। চিড়ে ভিজিয়ে খাবি। সেটাও জলে ফুটবে না। এসব কাজে একদম পুকুরের জল ব্যবহার করিস না।

বলাবলি করে লেখো

বাড়িতে কী কাজে কোন উৎসের জল ব্যবহার করা উচিত? ভালো করে ভেবে, আলোচনা করে লেখো:

পানের জল		মুখ ধোয়া	
চাল ও আনাজ ধোয়া		বাসন ধোয়া	
কাঁচা খাবার, ফল ধোয়া		কাপড় কাচা	
মুড়ি-চিঁড়ে ভেজানো		ঘর মোছা	
রান্না করা		স্নান করা	

জল হলো নষ্ট, টিউবওয়েলের কষ্ট

অন্তরা আর সুজন যাচ্ছিল। ওরা দেখল অচেনা দুজন ছেলেমেয়ে টিউবওয়েল পাম্প করে জল খাচ্ছে। ওদেরই সমবয়সি। ভাবল, ওরা কতটা জল খাচ্ছে, আর কতটা ফেলছে? মাপা যাবে? অন্তরা গুনল, মেয়েটা দশবার পাম্প করল। সুজন গুনল, ছেলেটা দশ ঢোক জল খেল। অন্তরা বলল - কাল একটা গ্লাস আনবি। আমি দশবার পাম্প করে জল তুলব। কত গ্লাস জল হয় দেখব। তুই দশ ঢোক জল খাবি। কত গ্লাস জল হয় দেখব। বোঝা যাবে, ওভাবে জল খেলে কতটা জল নষ্ট হয়!

স্কুলে ওরা সেকথা বলল। স্যার বললেন — বেশ তো। ওইভাবে তোমরাও মাপবে।

মেপে আর হিসেব করে লেখো

টিউবওয়েল থেকে জল পান করার সময় কতটা জল নষ্ট হয় তা নিয়ে মেপে লেখো:

দশবার পাম্প করে কত গ্লাস জল উঠেছে	কত গ্লাস জল দশ ঢোকে পান করো	কতটা জল নষ্ট হয়েছে	তোলা জলের কত ভগ্নাংশ জল নষ্ট হয়েছে

বৃষ্টির জল ধরো

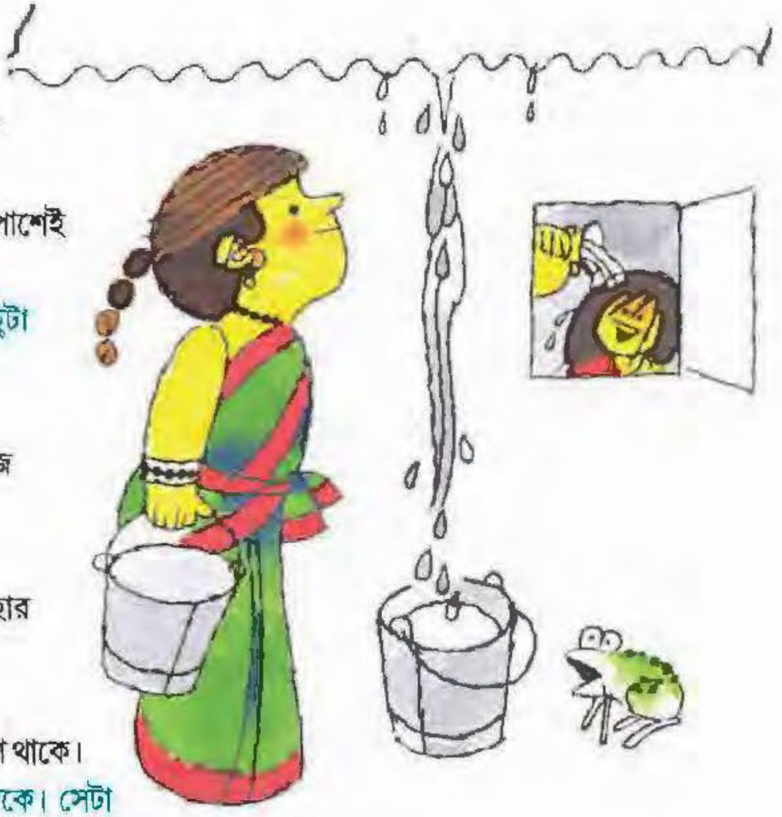

সুজন বলল— স্যার, কল থেকে জল পড়ে জলটা কোথায় যায়? সব কি নষ্ট হয়?

কেয়া বলল— কলতলাটা দেখিসনি? চাতালটার পাশেই পড়ে। ভিজে যায়। পিছল হয়।

—ওই জলের বেশিটাই বাষ্প হয়ে যায়। কিছুটা মাটিকে নরম রাখে।

— বর্ষাকালে বৃষ্টির জলও এভাবে নষ্ট হয়।

সুজন বলল— বৃষ্টির জল ঘরের নানা কাজে লাগানো যায় না?

— তাহলে তো খুব ভালো হয়।

— টিনের চাল থেকে যে জল পড়ে তা ব্যবহার করা যায়।

— নিশ্চয়ই।

— বৃষ্টি শুরুর পর প্রথম দিকে খানিকটা জলে নোংরা থাকে।

— শুরুতে বৃষ্টির জলে খুব সামান্য অ্যাসিড থাকে। সেটা ধরবে না। খানিক পর থেকে জল নেবে।

সাবিনা বলল— ছাদের পাইপ থেকে যে জল পড়ে সেটা নেওয়া যাবে?

— সেটাও অনেক কাজের উপযোগী। পুকুরের জলের চেয়ে অনেক ভালো। নোংরা দেখলে কাপড় বা গামছা দু-তিন ভাঁজ করে তা দিয়ে জল ছেঁকে নেবে। তবে এসব জল রান্নায় বা পানের জন্য ব্যবহার কোরো না। তবে গাছের গোড়ায় ঐ জল দেওয়া যায়। অনেক জায়গায় বহুতল বাড়িতে বৃষ্টির জল ধরার ব্যবস্থাও আছে।

খোঁজ করে লেখো

খোঁজ করে দেখো কারা বর্ষাকালে নানাভাবে জল ধরেন,
কে, কীভাবে জল ধরেন, তা নিয়ে কী করেন, জেনে লেখো:

যাঁরা বৃষ্টির জল ধরেন তাঁদের নাম	কতটা জল ধরে রাখেন	কীভাবে জল ধরেন	বৃষ্টির জল দিয়ে কী করেন

জল নষ্টের হিসেবনিকেশ

সাবিনা ঠিক করল, একদিনে একটা ট্যাপকল থেকে কতটা জল পড়ে তা মাপবে। বাড়ি পৌঁছে ও ট্যাপকলটা খুলে বালতি ভরল। এক মিনিটে ভরে গেল বালতি। এবার হিসেব করতে বসল। হিসেব করে বুঝল রোজ প্রায় পাঁচশো বালতি জল পড়ে।

স্কুলে গিয়ে স্যারকে বলল সাবিনা। স্যার বললেন— মোট কত লিটার হবে? তোমার বালতিতে কত লিটার জল ধরে?

সাবিনা আগেই একদিন মেপে দেখেছে। বালতিতে ছয় বোতল জল ধরে। এক লিটারের বোতল। তাই বলল—ছ-লিটার।

দীপু বলল— একদিন দেখলে হয়। লোকে কত সময় জল নিচ্ছে। কতটা জল নষ্ট হচ্ছে।

> ট্যাপে জল থাকে ছ-টা থেকে ন-টা। এগারোটা থেকে একটা। চারটে থেকে সাতটা। মোট আট ঘণ্টা।
> এক মিনিটে এক বালতি জল।
> ষাট মিনিটে ষাট বালতি জল।
> ৮ঘণ্টায় (৬০ × ৮ =) ৪৮০বালতি জল।

স্যার বললেন— দল করে কাজ করলে সেটা করাই যায়।

সাবিনা ভাবল, আমিও তো বেসিনের কল খুলে মুখ ধুই। আমিও কি জল নষ্ট করি? স্যারকে সেকথা বলতেই স্যার বললেন— অনেকেই জল নষ্ট করেন। কিন্তু খেয়ালই করেন না। জল নষ্ট করলে পরে পানীয় জলও পাওয়া যাবে না।

বলাবলি করে লেখো

কী কাজে কতটা জল খরচ করো তার মোটামুটি একটা মাপ বোঝার চেষ্টা করো। কী কাজ কীভাবে কম জল দিয়ে করা যেত তা ভাবো। আলোচনা করো। তারপর লেখো:

জল ব্যবহার করে করা কাজ	কীভাবে জল ব্যবহার করো	কীভাবে কাজটা করলে জল খরচ কমবে

কত গভীরের জল

বিশু একবার রাজুমামার বাড়ি গিয়েছিল। সেখানে টিউবওয়েল খুব কম। গ্রামে একটা মাত্র টিউবওয়েল। খুব লম্বা হাতল। আর কিছু কুয়ো আছে। তাও অনেক দূরে দূরে। গ্রামের মানুষ কুয়োর জলও খান। সকালবেলা মা-দিদিরা দলবেঁধে হাঁড়ি কলশি নিয়ে জল আনতে যান। কুয়ো বা টিউবওয়েলে। অনেকে আধঘণ্টাও হাঁটেন।

স্কুলে একথা বলল বিশু,শুনে সবাই অবাক। স্বপ্না বলল— অন্য সব কাজের জল কোথায় পান?

— পুকুরের জল দিয়েই সব কাজ করেন। তাও বেশি জল পান না। গ্রামে একটা বড়ো পুকুর আছে। সেখানেই স্নান করেন।

— সেও তো বাড়ি থেকে অনেক দূর! সেখান থেকেই সব কাজের জল বয়ে আনেন?

— তাছাড়া আর উপায় কি?

সাবিনা বলল — সারাদিনে একজন নিজের ব্যবহারের জন্য এক কি দুই বালতির বেশি জল পান না?

আকাশ বলল — আমার মাসির বাড়ির কাছে এক পাইপের টিউবওয়েল আছে। কুড়ি ফুটের একটা পাইপ, নীচে ফিল্টার, উপরে কল। ওঁরা সব কাজই ওই টিউবওয়েলের জল দিয়ে করেন।

তিয়ান বলল — ওই জল খাওয়া ঠিক নয়।

স্যার বললেন — ঠিক বলেছ। মাটির নীচের জল হলেই তা পানের যোগ্য হবে, এমন নয়। ওই স্তরে উপর থেকে চুঁইয়ে জল যায়। পুকুরের জলও চুঁইয়ে যায়।

ভেবে, মেপে, খবর নিয়ে লেখো

১। চান করা বাদে তুমি দৈনিক কত লিটার করে জল ব্যবহার করো? তা ভেবে বা মেপে লেখো:

পানের জন্য	মুখ ধোয়ায়				বাথরুমে ও অন্য কাজে
	সকালে	দুপুরে খাওয়ার পর	রাতে খাওয়ার পর	অন্য সময়	

২। তুমি যে জল পান করো তা কত গভীর স্তরের জল? খবর নিয়ে লেখো। যে জলের ট্যাঙ্ক থেকে পাঠানো জল পান করো, ওই জলের ট্যাঙ্ক কতদিন অন্তর পরিষ্কার করা হয় সে বিষয়ে খোঁজ নিয়ে লেখো:

তুমি কত গভীরের জল পান করো	যে জলের ট্যাঙ্ক থেকে পাঠানো জল পান করো তা কতদিন অন্তর পরিষ্কার করা হয়

মাঝখানে কেউ যায় না

দীপুদের বাড়ির উত্তরদিকে মাঠ। ওদিকে মিনিট পাঁচেক হাঁটলে একটা জলাভূমি। কখনও সেখানকার জল শুকোয় না। আবার গভীর জলও হয় না। ওখানকার মাটিও চাষজমির মতো নয়। অনেক গাছ আছে। শোলা, পানা, হলকলমি, ঘাস, লতাপাতা ভরতি। কলমি শাক, ঢেঁকি শাক, কচু গাছও আছে। অনেকে ওসব তুলে হাটে বেচেন।

অনেক বক, মাছরাঙা, পানকৌড়ি, চিল, শামুকখোল, ডাহুক, কাদাখোঁচা দেখা যায়। বড়ো বড়ো সাপও নাকি আছে। সন্ধ্যার দিকে শেয়াল, বেজি, ভোঁদড় দেখা যায়। আগে নাকি কুমিরও থাকত। মাঝখানে কেউ যায় না। অনেকে ধারে-ধারে মাছ ধরতে যায়। শোল,শাল, মাগুর,শিঙি, কই, পাঁকাল, বোয়াল মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া পায়। সুদামদা মাছ ধরতে গিয়ে মস্ত একটা কচ্ছপ পেয়েছিলেন। সেটা আবার জলেই ছেড়ে দিলেন। কচ্ছপ ধরা যে বেআইনি!

পাড়ার লোকরা জলাটাকে বলে কুবিরদহ। চারপাশ ঘুরে আসতে গেলে আধ ঘন্টা লাগবেই।

ওটা কি জলাশয়? — জানতে চাইল দীপু।

স্যার বললেন— হ্যাঁ, তবে জলাভূমি বলাই ভালো। আসলে ওটা হয়তো বুজে যাওয়া বিশাল দিঘি কিংবা বাঁওড়। আবার মরা নদী বা বিলও হতে পারে। ওর তলার কোনো জায়গার সঙ্গে হয়তো মাটির নীচের জলের যোগ আছে। তাই কিছুতেই জল শুকোয় না। আবার অতিবৃষ্টির জল মাটির নীচেও চলে যায়।

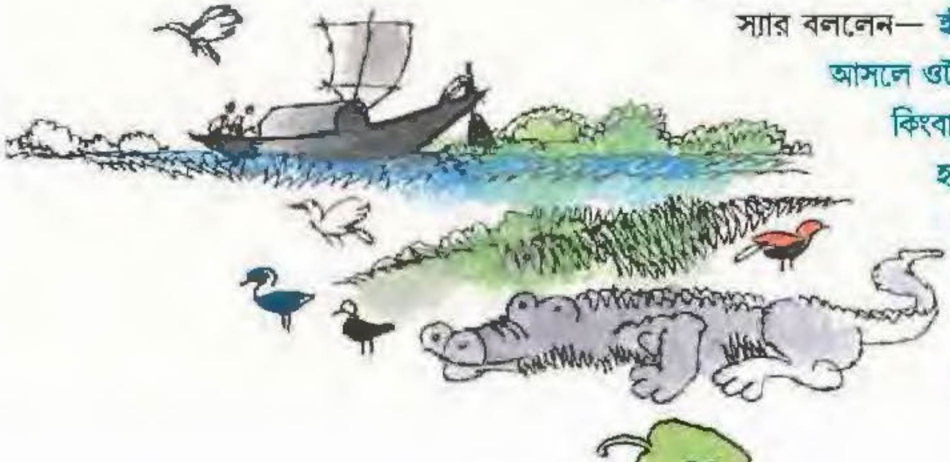

অনন্ত বলল— ওখানে শীতকালে অনেক নতুন ধরনের পাখি আসে। কালো-সাদা ছোপওয়ালা মাছরাঙাও দেখেছি। কাছেপিঠে ওইরকম জায়গা আর নেই।

—খুব কাছে হয়তো নেই। কিন্তু এইরকম জলাভূমি অনেক আছে। এই ব্লকেই হয়তো দশ-কুড়িটা। গোটা রাজ্যের কথা বললে হাজার কয়েক হয়ে যাবে। তার মধ্যে চারটের নাম করতেই হবে। সেগুলো খুব বড়ো। নানা কারণে খুব বিখ্যাত। দূর থেকেও লোকে দেখতে যায়।

— সেগুলো কোথায়?

কোনটা কোথায় আর কী নাম তা বোর্ডে লিখে দিলেন স্যার। সবাই পড়ল।

দীপু বলল— একটা জলাভূমি, একটা বাঁধ, একটা ঝিল, একটা বিল?

— এক-এক জায়গায় এক-একরকম নাম। তোমাদেরটা দহ। আবার কোথাও পটস, কোথাও তাল। কোথাও চাউরস কোথাও মোনস, কোথাও ডাল।

— নাম আলাদা হলেও আসলে জলাভূমিগুলো কি একইরকম?

— অনেকটা। খুব বড়ো হলে তাতে নৌকা চলে। মাঝে কিছু উঁচু জায়গাও থাকে। নদীর চড়া ধরনের। জীবজন্তু অনেক বেশি থাকে।

> **পূর্ব কলকাতার জলাভূমি**
> **পুরুলিয়ার সাহেববাঁধ**
> **হাওড়ার সাঁতরাগাছি ঝিল**
> **কোচবিহারের রসিক বিল**

কলকাতার ঢাল পূর্বদিকে

আবির আর ফতেমা পূর্ব-কলকাতার জলাভূমি দেখেছে। ওদের দুজনের বাবা আর বুবলাকাকু ওখানে মাছ চাষ করেন। নোংরা জলে মাছ চাষ হয়। কাকু বলেন— নোংরা জলে মাছ চাষের এত বড়ো জায়গা আর নেই। সারা কলকাতার নোংরা এখানে জমে। তাই চারপাশটা ভরাট হয়ে আসছে। ভরাট হয়ে বাড়িঘর হচ্ছে। রাস্তা হচ্ছে। ওইসব রাস্তা দিয়েই ওরা একদিন চারপাশ ঘুরেছে। কাকুর মোটরসাইকেলে করে । কী বিরাট জায়গা! এক ঘন্টারও বেশি সময় লেগেছিল মনে হয়।

স্যারকে এসব বলল ওরা। স্যার বললেন— খুব ভালো কথা। এর এখনকার অবস্থা সবাইকে তোমরাই বলবে। আমি আগের কিছু কথা বলি।

তারপর স্যার কিছুটা বললেন। কিছুটা বোর্ডে লিখলেন।

> ১৮৫৭ সাল (উইলিয়াম ক্লার্কের পরিকল্পনা):কলকাতার আবর্জনা ও নোংরা জল পূর্বে পাঠানো শুরু।
> ১৮৬০ সাল: আবর্জনা-মেশা নোংরা জলে মাছ চাষ শুরু।
> ১৮৭২ সাল: মাছের ঘাট তৈরি।
> ১৯১৮ সাল: পাকাপাকিভাবে মাছচাষ শুরু।
> ১৯২৯ সাল: বাণিজ্যিকভাবে মাছচাষ শুরু।

— তিনশো বছর আগে কলকাতার নোংরা গঙ্গায় ফেলা হতো। তাতে গঙ্গা ভরতে লাগল। বন্যার ভয় বাড়ল। মাপজোখ করে দেখা গেল কলকাতার ঢাল পূর্বদিকে। দেড়শো বছর আগে ঠিক হলো শহরের নোংরা পূর্বদিকে ফেলা হবে। আর নোংরা জল পাম্প করে বিদ্যাধরী নদী দিয়ে পাঠানো হবে। যাবে বঙ্গোপসাগরে। সেই মতো কাজ শুরু হলো। এতে বিদ্যাধরীর স্রোত কমে গেল। এই অংশে নদীটা ক্রমে ছড়িয়ে পড়া বদ্ধজলা হয়ে গেল। প্রথম প্রথম অল্প মাছ চাষ শুরু হল। তারপর একসময় মাছ চাষের বিরাট জায়গা হয়ে গেল এখানটা।

সোনাই বলল— ওখানে মাছ ছাড়া আর কোনো জীবজন্তু নেই?

— আছে। শামুক, সাপ, পোকা, পাখি, শিয়াল, জলার বেজি আছে। অনেক সময় ভাম-বিড়াল, কাদার কচ্ছপও দেখা যায়। নৌকা করে জলে ঘোরার সময় নানারকম জল-পাখিও চোখে পড়ে।

তোমরা কাছের একটা জলাভূমি ঘুরে আসবে। দেখতে গিয়ে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলবে। দেখে এসে অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করবে। আগে যারা গিয়েছেন তাঁদের কথা শুনবে। তারপর লিখবে :

জলাভূমির নাম:	দেখতে যাওয়ার তারিখ:
ঠিকানা:	আর কী কী কাজে ব্যবহার হয়:
দৈর্ঘ্য: প্রস্থ:	পাশে কী কী গাছ আছে:
জল কোথা থেকে আসে:	কী কী পাখি দেখা গেল:
বর্ষাকালে কত গভীর জল হয়:	কী কী পশু দেখা গেল:
কতদিন জল জমা থাকে/ কমে গেলে কতটা জল থাকে:	মাঝে চড়া/ ঢিবি আছে কিনা:
জলের রং কেমন:	অন্যান্য বিষয়:
জলে কী গাছ আছে:	
জল কী কাজে ব্যবহার হচ্ছে:	

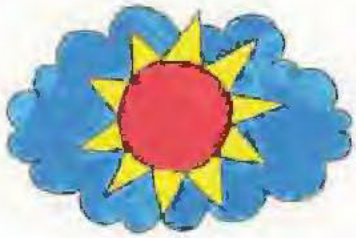

উদ্ভিদ আর প্রাণীদের নিয়ে জীবজগৎ

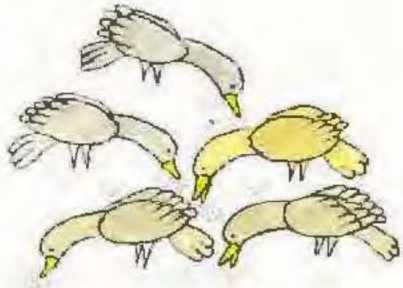

ভোরবেলা দাদুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিল পিকু। চারদিকে সবুজ গাছপালা। নীল আকাশে সূর্য।

দাদু বললেন— সূর্যের আলো, মাটি, জল, বাতাস। এরই মাঝে গড়ে উঠেছে বিচিত্র উদ্ভিদজগৎ। অনেক বছর আগে। পাশাপাশি সৃষ্টি হয়েছে প্রাণীজগতের। পোকামাকড়, অনেকরকম পাখি, ছাগল, গোরু, ভেড়া, খরগোশ, হরিণ। ঘাস, পাতা, গাছ, ফুল, ফল খেয়ে তারা বেঁচে থাকে। আবার বাঘ, সিংহ, নেকড়ে তাদের খেয়ে বাঁচে।

এই পর্যন্ত শুনেই পিকু বলল— মানুষ এসেছে অনেক পরে, তাই না? মানুষ তো সবই খায়। গাছের মূল থেকে ফুল,ফল, বীজ।

হরেকরকম মাছ। নানা প্রাণীর মাংস, দুধ। মৌমাছির তৈরি করা মধু।
দাদু বললেন— মানুষের দরকার সবাইকে। গোটা জীবজগৎ টিকে না থাকলে মানুষের সবচেয়ে অসুবিধা।
স্কুলে সব শুনে দিদিমণি বললেন— উদ্ভিদ আর প্রাণীদের মধ্যে কে কার উপর নির্ভর করে তা কি ভেবেছ?

বলাবলি করে লেখো

উদ্ভিদ ও প্রাণীদের খাদ্য বিষয়ে আলোচনা করো। তারপর লেখো :

গাছ কী কী দিয়ে খাদ্য তৈরি করে	কোন গাছ কোন প্রাণীকে খাদ্য জোগায়	তৃণভোজীদের কারা খায়	কোন প্রাণীরা উদ্ভিদ ও প্রাণীদের খায়

বুনো থেকে পোষা হলো

নাসরিনরা সাঁতরাগাছির ঝিলে পাখি দেখতে গিয়েছিল। শীতের সময় পাখিগুলো আসে। এই পাখিরা যেখানে থাকে সেখানে আরও বেশি শীত। তাই সেখান থেকে চলে আসে। কম শীতের দেশে দু-মাস কাটিয়ে আবার ফিরে যায়।

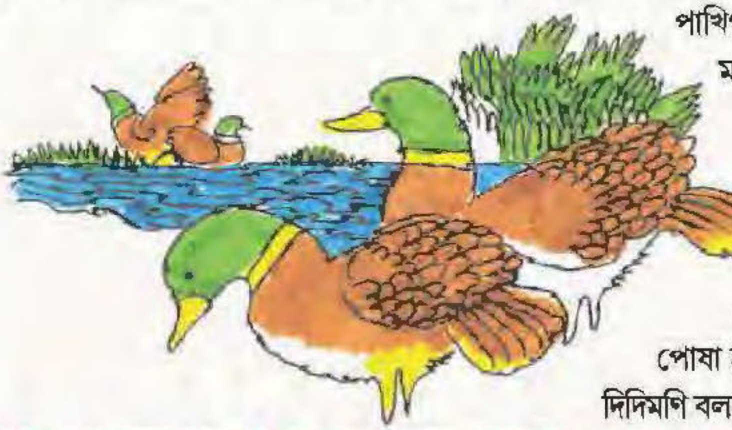

পাখিগুলো দেখে নাসরিন অবাক। বলল— এত হাঁসের মতো দেখতে! কতকগুলো তো আমাদের পোষা হাঁসের মতো।

দিদিমণি বললেন— হাঁসই তো, তবে এরা বুনো হাঁস। বুনো হাঁস পোষ মেনেই তো পোষা হাঁস হয়েছে।

নাসরিন মানতে চাইল না। বলল— আমাদের পোষা হাঁসগুলো তো পোষা হাঁসের ডিম ফুটিয়েই হয়েছে।

দিদিমণি বললেন— ঠিকই বলেছ। হাঁস পুষলে ডিম পাওয়া যাবে। তাই ভেবে মানুষ বুনো হাঁসকে পোষ মানাতে চেয়েছিল। সহজে খাবারদাবার পেয়ে একদল বুনো হাঁস পোষ মেনেছিল।

রবিন বলল— বুঝেছি। সেগুলো পোষা হাঁস হলো। আর বুনো হাঁসের অন্য দলগুলো বুনোই রয়ে গেল।

সমীর বলল— দিদি, মোরগের বেলায়ও এমন হয়েছে। জলদাপাড়ার বনে লাল বনমোরগ দেখেছি। সেটা অনেকটা অমিনাদের মোরগটার মতো দেখতে।

—ঠিক বলেছ। জলদাপাড়ার জঙ্গলে বড়ো বড়ো কালো গোরুর মতো জন্তুও আছে। নাম 'গৌর'। অনেকে বলেন ভারতীয় বাইসন। আমাদের দেশি গোরুরা আগে ওদের মতোই ছিল।

নাসরিন বলল— তার মানে, সব পালিত পশুই একসময় বুনো ছিল। কেউ কেউ এখনও বুনো রয়ে গেছে।

— তবে পশু-পাখি পোষ মানানোর একটা ইতিহাস আছে। সব পশু-পাখি এক সময়ে পোষ মানেনি। কুকুর নাকি প্রথম পোষ মেনেছিল। তারপর মানুষ দেখল গোরু, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া এদের পোষ মানালে অনেক সুবিধা। চাষের কাজে, যানবাহন হিসাবে তাদের ব্যবহার হতে পারে। তবে আজকাল কিছু কিছু মাছ, মৌমাছিদেরও মানুষ পোষ মানাচ্ছে।

বলাবলি করে লেখো

কোন কোন পশু ও পাখি পোষ মেনে পালিত পশু-পাখি হয়েছে?
তাদের থেকে কী পাওয়া যায় তা আলোচনা করে লেখো:

পালিত পশুর নাম	তাদের থেকে কী কী পাওয়া যায়	পালিত পাখির নাম	তাদের থেকে কী কী পাওয়া যায়

কে বন্য কে পোষা

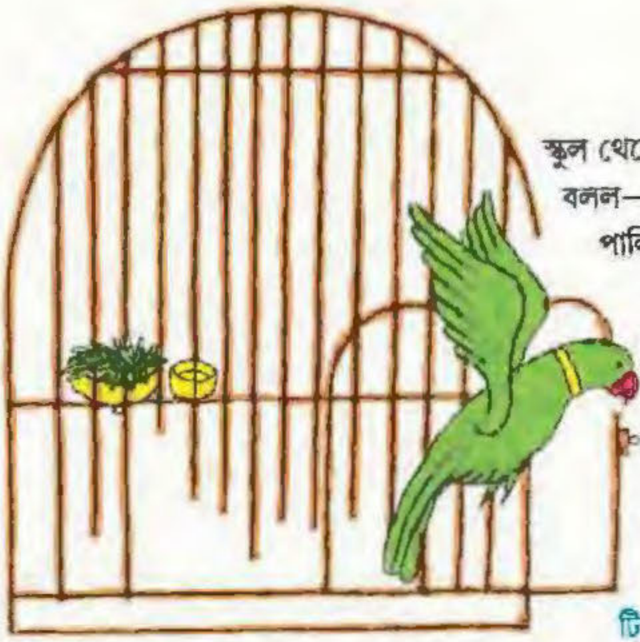

স্কুল থেকে ফেরার পথে 'পালিত' শব্দটা নিয়ে কথা শুরু হলো। তপন বলল— যে পশুদের মানুষ থাকার জায়গা দেয়, খেতে দেয়, তারাই পালিত পশু। সেরকম পালিত পাখিও হয়।

সোনাই বলল— মানুষ তাদের শিকারি প্রাণীর থেকে বাঁচায়। অসুখ হলে চিকিৎসা করায়।

তহমিনা বলল— মানুষ নিজেদের দরকারে ওদের পালন করে। গোরু দুধ দেয়। হাঁস-মুরগি ডিম-মাংস দেয়।

— তা ঠিক। তবে ভালোবাসাও আছে। টিয়ার কথা ধরো। টিয়ার কি ডিম-মাংস কিছু খাই? তাও তো আমরা পুষি!

পরদিন স্কুলে একথা উঠল। দিদিমণি বললেন— আগে বলো, টিয়া কি পালিত? হাঁস আর টিয়া কি একইভাবে থাকে?

সোনাই বলল— টিয়াকে শুধু ভালোবেসে পুষি আমরা। দেখতে সুন্দর তো! তাই হয়তো টিয়ার বেশি আদর।

— বেশ। ধরো, তুমি হাঁসকে সন্ধ্যাবেলা ডাক দাওনি। ওরা কি জল ছেড়ে ঘরে আসবে?

— সে তো মাঝে মাঝে হয়। জল থেকে ডাকতে যেতে দেরি হয়। ওরা নিজেরাই চলে আসে।

— টিয়ার বেলায়? সকালবেলা হাঁসদের ছেড়ে দিচ্ছ। তেমনি, টিয়াকেও খাঁচা থেকে ছেড়ে দাও। সে সন্ধ্যায় ফিরে আসে কিনা দেখো।

সোনাই কিছু বলার আগেই রফিক বলল— না দিদি। ফিরবে না। চাচা একটা টিয়া পুষেছিল। একদিন খেতে দিয়ে খাঁচার দরজা লাগায়নি। উড়ে গেছে। আর ফেরেনি।

— আসলে ও নিজের ইচ্ছায় খাঁচায় ছিল না। ও পোষ মানতে চায় না। বন্য হয়েই থাকতে চায়।

তপন বলল— কিন্তু, টিয়া কী করে বন্য হবে? কাউকে কামড়ায় না। কোনো ক্ষতি করে না।

— কোনো বন্যপশুই অকারণে ক্ষতি করে না। নিজেদের খাবার জোগাড় করে। বাধা পেলে সাধ্যমতো লড়াই করে। ঝড়-বৃষ্টি থেকে বাঁচতে থাকার জায়গা চায়। তা কেড়ে নিলে রাগ করে। পারলে লড়াই করে। কামড়ে দেয়। তাদের ক্ষতি করতে গেলে তবেই আক্রমণ করে।

— তাহলে কোনো পাখিই পোষা যাবে না? কারো যদি পাখি ভালো লাগে!

— তুমি পাখিকে খেতে দেবে। খাবার দেবে। গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেবে। তার যখন খুশি সে খেয়ে যাবে। তখন তাকে দেখবে।

সোনাই বলল— টিয়া যদি বন্য হয় তাহলে আমরা অনেক বন্যপ্রাণী দেখি।

— ঠিকই। মাঝে মাঝেই দেখো। হাতি, বাঘ, ভালুক এরা তো বন্য প্রাণী বটেই। জঙ্গলে যারা থাকে তারাই শুধু বন্য তা নয়। সাপ, বেজি, কাক, চড়াই — সবই বন্য।

বলাবলি করে লেখো

যে সব বন্য পশুপাখি দেখতে পাও তাদের নাম ও পরিবেশে তাদের ভূমিকা বিষয়ে লেখো:

প্রায়ই দেখা বন্য পশুর নাম	পরিবেশে তাদের ভূমিকা কী	প্রায়ই দেখা বন্য পাখির নাম	পরিবেশে তাদের ভূমিকা

বাড়ির কাছেই এত উদ্ভিদ

নানাদিকে বন্য পশুপাখি খুঁজে বেড়াচ্ছে সবাই। সন্ধ্যাবেলা সত্য পুকুর পাড়ের কাছে গিয়ে দেখল অনেক ঝোপ। তার ভিতর কী একটা জন্তু ছুটে পালাল।

তখন ঝোপের গাছগুলোকেই সত্য দেখল অনেকক্ষণ ধরে। চার রকমের গাছ। একটা তো ফার্ন। ঠাকুমা সেটাকে বলেন ঢেঁকি শাক। খেতে বেশ ভালো। বাকি তিনটে অচেনা। একটায় ফুলও ফুটেছে। ভাবল, একটা করে ডগা ছিঁড়ে নিয়ে যাব। জানার জন্য ছিঁড়লে দিদিমণি কি আর রাগ করবেন?

স্কুলে গিয়ে দিদিকে দেখাতে হলো না।পাতাগুলো দেখে স্বপ্নাই সব বলে দিল। হেলেঞ্চা, কুলেখাড়া আর ব্রাহ্মী। সব শুনে দিদিমণি বললেন— উদ্ভিদ চেনাটাও তো মজার ব্যাপার। যত পারো গাছ দেখো।

সত্য বলল— গাছ চেনাটাই সহজ। গাছ তো আর ছুটে পালাতে পারবে না!

— হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পারবে। কোনটা দেখলে তা খাতায় লিখে রাখবে।

দেখেশুনে লেখো

১। চারটে গাছ সম্পর্কে লেখো, ছবি আঁকো :

ঢেঁকি শাক	হেলেঞ্চা	কুলেখাড়া	ব্রাহ্মী

২। একটা গাছের ছবি আঁকো। তার পাতা, ডাল, গুঁড়ি চিহ্নিত করো। সেগুলো থেকে কী কী উপকার পাওয়া যায় লেখো :

গাছের ছবি (পাতা, ডাল, গুঁড়ি)	আমরা তার থেকে কী উপকার পাই

ঘরের কাছে কত প্রাণী

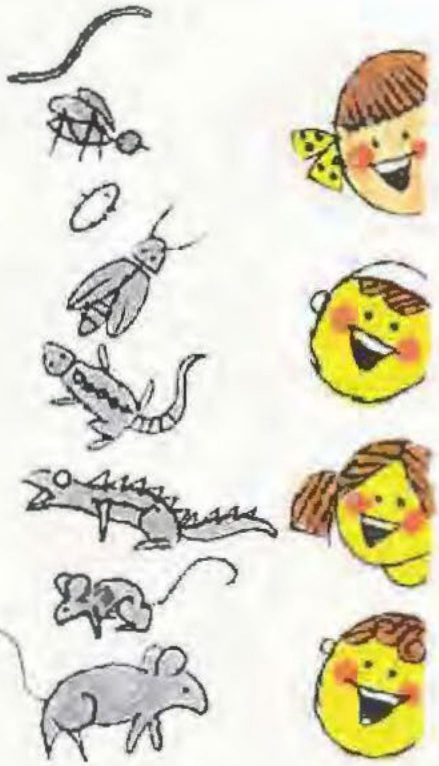

উদ্ভিদ আর প্রাণী। দুইই দেখছে সবাই। খাতায় উদ্ভিদের নাম লিখছে। পশুপাখিদের নাম লিখছে। তাদের ছবি আঁকছে। কোন তারিখে কোনটা দেখেছে তাও লিখে রাখছে।

রুমা একদিন একটা প্রাণী দেখল। মাপে বড়ো হুলো-বেড়ালের মতো। রং কালো, মুখটা কুকুরের মতো সরু। লেজটা লম্বা আর লোমশ। পরদিন ক্লাসে দিদিমণিকে জানতে চাইল, ওটার নাম কী?

দিদিমণি বললেন— ওটা গন্ধগোকুল। ভাম-বেড়ালও বলে।

আমিনা বলল— ওটা তো বন্যপশু। কিন্তু পিঁপড়ে? আমরা পুষি না, তবু তারা ঘরবাড়িতেই থাকে।

— কিন্তু ওরা পোষা নয়, পোষ মানেনি। ওরাও বন্য।

সুদাম বলল— কেন্নো, মশা, উই, আরশোলাও বাড়িতে থাকতে চায়। তাড়ালেও আবার আসে। তবু ওরা বন্য?

রফিক বলল— টিকটিকি, গিরগিটি, মাকড়সা এরাও ওই রকম।

মথন বলল— গিরগিটি, মাকড়সা ঝোপঝাড়েও থাকে।

অলিভিয়া বলল— ইঁদুর-ছুঁচোরাও বুনো। ওরা বাড়িতে আসে খাবারের খোঁজে। মানুষ দেখলেই পালায়।

স্বপ্না বলল— টিকটিকিও পালায়। তাই টিকটিকিও বুনো, পোষা নয়।

— তোমরা কত বন্যপ্রাণী চেনো! শুনেই আমার আনন্দ হচ্ছে।

দয়াল বলল— দিদি, আমি দশ-বারো রকম সাপও চিনি।

— সে তো খুব ভালো কথা। তুমি নানারকম সাপের ছবি আঁকবে। সবাইকে চেনাবে। ওরা লিখবে কোনটার কী নাম।

গণেশ বলল— ওরে বাবা! আমি সাপ দেখলেই ছুট দেব। শুনেছি সাপের ছোবল খেলেই মৃত্যু।

দয়াল বলল— মোটেই না। বেশিরভাগ সাপের কামড়ে মানুষ মরে না। তাছাড়া অকারণে সাপেরা কামড়ায়ও না। আমরা ওদের ভয় পেয়ে মারি। ওরাও আমাদের ভয় পেয়ে কামড়ায়।

— সেটা ঠিক। তবে সাপও বুনো। কোনো সাপই পোষা নয়।

বলাবলি করে লেখো

বাড়ির পোষা প্রাণী, বাড়িতে আসা বুনো-প্রাণী আর ঝোপ-জঙ্গলের বুনো-প্রাণী এই তিন ভাগে চেনা প্রাণীদের ভাগ করে নাম লেখো:

বাড়ির পোষা প্রাণী	বাড়িতে আসা বুনো-প্রাণী	ঝোপজঙ্গলের বুনো-প্রাণী

শিখব সবাই মিলে, চিনব সবাইকে

অনেকেই অনেক গাছ চেনে না। প্রাণী চেনে না। তাই নাম লিখতে পারে না। বর্ণনা লিখে আনে। স্বপ্না, দয়াল, ফিরোজ এবং আরো কেউ কেউ অনেক নাম বলে দেয়। দিদিমণিও বলে দেন। যে যতটা পারে দেখে আসে। বলে, লিখে আনে।

রিনা বলল— প্রাণীরা নানারকমের। কেন্নোর পা গুনে শেষ করা যাবে না। কেঁচোর আবার পা নেই।

মিতা বলল— সাপের গায়ে লোম নেই। ওদের গা চকচক করে।

— সাপের গা ভরতি আঁশ।

রিনা বলল— শুঁয়োপোকার গা-ভরতি শুঁয়ো। গায়ে লাগলে খুব চুলকানি হয়। ওদের দেখতেও বিচ্ছিরি।

মিতা বলল— প্রজাপতির গায়ে দুটো ডানা। দেখতে কী সুন্দর।

— ওই শুঁয়োপোকাগুলোই পরে প্রজাপতি হয়।

মিতা বিশ্বাস করল না। বলল—তা আবার হয় নাকি? শুঁয়োগুলো যাবে কোথায়?

দিদিমণি বললেন — রিনা কিন্তু ঠিকই বলেছে। অনেক দিন ধরে শুঁয়োপোকা লক্ষ করলে বুঝতে পারবে।

আসিফ বলল— আমরা শুধু ডাঙার প্রাণীদের কথা বলছি। জলের মাছ ব্যাংগুলোও তো আছে।।

— ঠিকই। জলে আছে হরেকরকম মাছ-ব্যাং। আরও অনেক প্রাণী। তোমরা জলের প্রাণীদেরও দেখো। তাদের শরীরেরও বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো। তাদের স্বভাব নিয়ে আলোচনা করো।

বলাবলি করে লেখো

নতুন করে যেসব প্রাণীদের চিনেছ তাদের কথা লেখো:

প্রাণীদের নাম	কী খায়	কোথায় থাকে	অন্য বৈশিষ্ট্য (ধীরে চলে/ দ্রুত চলে/ নিশাচর/ শিকারি/ নিরীহ ইত্যাদি)

কে মেরুদণ্ডী, কে অমেরুদণ্ডী

দিদি আর জেঠিমা দীনুদের 'হোছনা পুকুর' থেকে জল ছেঁকে মাছ ধরছেন। দীনু জলের প্রাণী দেখতে গেল। মৌরলা, পুঁটি আর ট্যাংরা মাছ উঠল। তাছাড়া ছোটো চিংড়ি, একটা গলদা চিংড়িও উঠল। গেঁড়ি শামুক, ছোটো-বড়ো আরও দু-তিনরকম শামুক উঠল। কয়েকটা ব্যাঙাচি। আরও কত রকমের পোকা।

দীনু বলল— জেঠিমা, জলে এতরকম পোকা থাকে? এগুলোর কী নাম?

জেঠিমা অবাক। বললেন— জলের পোকার নাম? সবার নাম থাকে নাকি? আর, এতরকম বলছিস? পরশুদিন পুকুরে বড়ো জাল ফেলা হবে। সেদিন দেখবে আরও কতরকম পোকা। জলের পোকার কি আর শেষ আছে?

স্কুলে এসে দীনু এসব কথা বলল।

মিতা বলল - রুই মাছের গা আঁশে ঢাকা। কিন্তু

ট্যাংরার আঁশ নেই।

রিনা বলল— আবার ট্যাংরার কাঁটা আছে। রুইয়ের কাঁটা নেই। আছে পাখনা।

— ট্যাংরার কাঁটাগুলো এক ধরনের পাখনাই। রুইয়ের সাতটা পাখনা। কাঁটা আর পাখনা মিলে ট্যাংরারও সাতটাই।

পঙ্কজ বলল—রুই মাছের ভিতরে ট্যাংরার চেয়ে কাঁটা বেশি।

রঞ্জন বলল— মাছের ভিতরের কাঁটা কি আমাদের হাড়ের মতো?

রিনা বলল - তা তো বটেই। দুটোরই মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত একটা কাঁটা আছে।

— ওটাকে বলে মেরুদণ্ড। যাদের ওইরকম একটা হাড় আছে তাদের বলে মেরুদণ্ডী প্রাণী।

— আমাদেরও তো আছে। তাহলে মানুষ মেরুদণ্ডী প্রাণী?

— নিশ্চয়ই। আরও অনেক প্রাণীই মেরুদণ্ডী। মেরুদণ্ড নেই, এমন প্রাণীও আছে।

— চিংড়ি মাছেরই তো কোনো কাঁটা নেই।

— ঠিক, চিংড়ির কাঁটা নেই। চিংড়ি অবশ্য মাছ নয়। চিংড়ি একটা অমেরুদণ্ডী প্রাণী।

— অন্য পোকাগুলোরও মেরুদণ্ড নেই। শামুকের মেরুদণ্ড নেই। কেঁচো, প্রজাপতিরও মেরুদণ্ড নেই।

বলাবলি করে লেখো

যেসব মেরুদণ্ডী আর অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেখেছ তাদের বিষয়ে আলোচনা করে লেখো:

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের নাম	অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের নাম	দুই রকম প্রাণীর মধ্যে কি কি পার্থক্য দেখা যায়

চেনা গাছের আচার-আচরণ

ইতুরা ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকে। বারান্দায় টবে কতগুলো গাছ লাগিয়েছে। ছুটিতে দেশের বাড়ি যাবে। গাছগুলো রোদে শুকিয়ে যেতে পারে! তাই ইতু টবগুলো ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। ফিরে এসে দেখল সব টবের গাছই জানালার দিকে হেলে পড়েছে। ইতু ভালো করে দেখল। জানালার একটা জায়গায় ভাঙা আছে। সেখান দিয়ে দুপুর থেকে রোদ ঢোকে।

স্বপনদের করলা গাছগুলোয় দুই-তিনটে করে পাতা হয়েছে। ওর বাবা চেরা বাঁশ আর কঞ্চি দিয়ে মাচা করে দিলেন। স্বপন ভাবল, এ তো লতানো গাছ! মাচায় উঠবে কী করে? তাই ও রোজ গাছটাকে দেখতে লাগল। কয়েকদিন পরে গাছটার গা থেকে সবুজ সুতোর মতো বেরোলো। কয়েক দিন পরে সেটা একটা বাঁশকে জড়িয়ে ধরল। গাছটা যত বড়ো হতে থাকল ততই গা থেকে ওইরকম সবুজ সুতো বেরোতে থাকল। বাঁশটাকে জড়িয়ে ধরে গাছটা মাচায় উঠতে লাগল।

স্বপন স্কুলে বলল ব্যাপারটা। সোনাই বলল— তুই এতদিনে দেখলি! লাউ-কুমড়ো লতা ওইভাবে মাচায় ওঠে।

দিদিমণি বললেন— সুতোর মতো ওটাও একটা পাতা। ওকে বলে আকর্ষ। অনেক লতানো গাছের আকর্ষ হয়।

স্বপন বলল— মাচায় ওঠার জন্য আকর্ষ তৈরি করে, তাই না?

—ঠিক বলেছ। লতানো গাছ। খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে না। পাশের শক্ত কিছু ধরে দাঁড়াতে চায়। তাই আকর্ষ বের করে।

— লতানো গাছ ছাড়া কোনো গাছ এমন করে না?

— আকর্ষ বের করে না। তবে দরকার মতো অন্য উপায় নেয়।

নাসরিন বলল— বটগাছ ঝুরি নামায়।

ইতু বলল— বটের চারপাশে ডাল। মোটা ডালগুলো ভারে ভেঙে যেতে পারে। সেগুলোর ভর দেওয়ার কিছু চাই। তাই ঝুরি নামায়, তাই না?

— ঠিক বলেছ। এটা বটগাছের একটা বিশেষ আচরণ।

দেখেশুনে লেখো

আর কোন গাছ এমন বিশেষ আচরণ করে? যে যা দেখেছ, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করো। তারপর লেখো:

গাছের নাম	লতানো/শক্ত গুঁড়ি	বিশেষ আচরণ	কেন ওই আচরণ

খুব চেনা প্রাণীর আচার-আচরণ

সেদিন খুব গুমোট গরম। বারান্দায় বসে পড়ছিল ফতেমা। হঠাৎ দেখল, বারান্দার কোণ ধরে সার বেঁধে পিঁপড়েরা যাচ্ছে। তাদের মুখে ছোটো সাদা পুঁটলি। ফতেমা ভালোভাবে দেখতে গেল। বারান্দার নীচে মাটির গর্ত থেকে সারিবন্ধ ভাবে পিঁপড়েরা চলেছে। ঘরের দেয়ালের একটা ফাটলে ঢুকে যাচ্ছে। মুখে ওই রকম একটা ছোট্ট গোল, সাদা থলি।

ফতেমা ভাবল ওরা খাবার নিয়ে যাচ্ছে। গরমের জন্য অন্য জায়গায় খাবার রাখতে যাচ্ছে? হঠাৎ দেখল নানা আসছে। নানাকে বলল— দেখো, পিঁপড়েরা অন্য জায়গায় খাবার রাখতে যাচ্ছে।

নানা হেসে বললেন— ওদের খাবার নয়। ওরা উঁচু জায়গায় ডিম সরাচ্ছে। আজ বৃষ্টি হতে পারে।

সত্যিই সেদিন বিকালে বৃষ্টি হলো। ফতেমা বুঝল, বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা পিঁপড়েরা হয়তো বুঝতে পারে। সেইমতো সাবধানও হয়।

রিঙ্কির দাদু কাকদের রুটির টুকরো দিচ্ছিলেন। একদিন রিঙ্কি দেখল একটা কাক রুটির টুকরোটা খেল না। মুখে করে উড়ে গেল। বসল কুলসুমদের বাড়ির টালির ছাদে। খানিক এদিক-ওদিক দেখল। তারপর রুটির টুকরোটা ঠোঁট দিয়ে গুঁজে দিল দুটো টালির ফাঁকে। রিঙ্কি দাদুকে সব দেখাল। দাদু বলল— ও খাবার লুকিয়ে রাখল। পরে খাবে। এখন বোধহয় খিদে নেই।

পরে রিঙ্কি অনেকবার দেখেছে কাক খাবার লুকিয়ে রাখে।

দেয়ালে টিকটিকিকে দেখছিল প্রতীক। টিউবলাইটের পাশে একটা টিকটিকি। কাছাকাছি এলেই পোকা ধরছে। আর একটা টিকটিকি ছোটো। কিছুটা দূরে আছে। হঠাৎ একটা ফড়িং এসে বসল দুজনের মাঝখানেই। সেটাকে ধরতে গেল দুজনই। কিন্তু ফড়িংটা উড়ে গেল। বড়ো টিকটিকিটা পড়ল ছোটোটার ঘাড়ে। তার লেজ কামড়ে ধরল। লেজটা ছিঁড়ে গেল। ছেঁড়া লেজটা লাফাতে লাগল।

তবে সে পালিয়ে গেল। কদিন বাদে প্রতীক দেখল তার লেজের ঘা শুকিয়ে গেছে। তারপর লেজটা বাড়তেও লাগল। প্রতীক বুঝল, টিকটিকির লেজ কেটে গেলে আবার গজায়।

ক্লাসে এসব গল্প বলল তিনজনে। দিদিমণি বললেন— বাঃ! চেনা প্রাণীদের নতুন করে চিনছ তোমরা।

বলাবলি করে লেখো

আর কোন প্রাণীর বিশেষ আচরণ দেখেছ তা নিয়ে আলোচনা করে লেখো:

কোন প্রাণী নিয়ে ঘটনা	ঘটনার বিবরণ	সেই প্রাণী সম্পর্কে কী বুঝলে

আধ-চেনা প্রাণীর আচার-আচরণ

ছিপ দিয়ে মাছ ধরেন মিশরকাকু। অনীক আজ সঙ্গে গেল। অনীক একটা ছোটো ছিপে পুঁটি মাছ ধরছে। হঠাৎ একটা জায়গায় জল নড়ে উঠল। কাকু দেখতে গেলেন। ফিরে এসে একটা ছোটো পুঁটি নিলেন। মাঝারি ছিপের বঁড়শিতে তাকে বেঁধালেন। অনীক বলল— একি! মাছ নষ্ট করছ কেন?

কাকু কিছু বললেন না। ছিপ নিয়ে ফিরে গেলেন আগের জায়গায়। পুঁটিটা জলে ফেলে নাড়াতে লাগলেন। একটু পরেই জলে খুব শব্দ। আধমিনিট পরে কাকুর ছিপে একটা শাল মাছ। ফিরে এসে বললেন— এরা শিকারি মাছ। শোল, শাল, ল্যাটা। নড়তে থাকা মাছ দেখলেই খাবে।

অনীক স্কুলে এসে সেকথা বলল। দিদিমণি বললেন— মাছ হলো তোমাদের আধা-চেনা প্রাণী। এক একজন একেকটা মাছ বিষয়ে জানো। নিজেরা আলোচনা করলে সবার ধারণা ভালো হবে।

মথন বলল— শুধু মাছ? সাপ, ব্যাং, বাদুড়, কাঁকড়া, প্রজাপতিও আধ-চেনা।

দয়াল বলল— সাপের নাম শুনলেই সবাই ভয় পায়! নানারকম সাপের কামড়ের দাগ কেমন দেখতে তাই ক-জন জানে?

— এবার সবাই জেনে নেবে। তারপর প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য শুনলেই বুঝতে পারবে কোন প্রাণী সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

বলাবলি করে লেখো

নীচের কোন বৈশিষ্ট্য কোন প্রাণীদের? তাদের বিষয়ে নীচে লেখো আর খাতায় ছবি আঁকো:

প্রাণীর একটা বৈশিষ্ট্য	প্রাণীর নাম	অন্য আচার -আচরণ
খোলশ-ছাড়া প্রাণী		
গর্তে থাকা প্রাণী		
বুকে হেঁটে বেড়ানো প্রাণী		
সুন্দর লেজওলা প্রাণী		

স্থানীয় প্রাণীর হারিয়ে যাওয়া

মিনার কাকুর সঙ্গে অনীক বাজারে গেল। মাছ চিনবে। বাজারে অনেক রুই, কাতলা, বাটা, গ্রাসকার্প আছে। এসব মাছের নাকি চাষ হয়। পুঁটি, মৌরলা, খলসে, বেলে কম। এদের চাষ করা হয় না। শোল, শাল, ল্যাটা, বোয়াল খুব কম। এরা শিকারি মাছ। চাষ করা মাছের ছানাদের খেয়ে নেবে। তাই এদের বিশেষ করে মারা হয়।

অনীক ভাবল, কিছুদিন পরে কি আর এসব মাছ দেখা যাবে? স্কুলে এসে সকলকে সেকথা বলল।

দিদিমণি বললেন— ঠিক ভেবেছ। কিছুদিন পরে এগুলো হয়তো থাকবে না।

দয়াল বলল— ছোটো ডোবা-পুকুরে রুই-কাতলা চাষ হয় না। সেখানে আগে শোল-চ্যাং থাকত। কিন্তু মাঠ থেকে কীটনাশক-ধোয়া জল যাচ্ছে সেখানে। তার ফলে মরে যাচ্ছে মাছেরা।

— শুধু তো মাছ নয়। আরও অনেক জীবজন্তুই কমে গেছে। শকুনরা মরা জন্তুর মাংস খেত। পরিবেশে দুর্গন্ধ হতো না। এখন গোরুদের ব্যথা কমানোর ওষুধ দেওয়া হয়। তাই তাদের মাংসেও বিষ।

মথন বলল — শকুনরা সেই মাংস খেয়ে হারিয়ে যাওয়ার মুখে?

— হ্যাঁ। অনেক গাছও শেষ হয়ে যাচ্ছে। এমনি ফাঁকা জায়গা পড়ে থাকলে অনেক রকম গাছ গজায়। কিন্তু সব জায়গা পরিষ্কার করে চাষ হচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে সর্পগন্ধা, মেহেন্দি, মুক্তোঝুরি — এই সব ঔষধি গাছ। বড়োদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানার চেষ্টা করো গত পঞ্চাশ বছরে জীববৈচিত্র্য আর অন্য বিষয়ের কী কী পরিবর্তন হয়েছে।

— দিদি, জীববৈচিত্র্য কী?

দিদিমণি বললেন— এই যে আমরা চারপাশে নানারকম উদ্ভিদ আর প্রাণী দেখি সেটাকে বলে জীববৈচিত্র্য।

বলাবলি করে লেখো

গত পঞ্চাশ বছরে তোমার কাছাকাছি অঞ্চলের পরিবেশে বিভিন্ন পরিবর্তন বিষয়ে খোঁজ নিয়ে আলোচনা করে লেখো:

স্থানীয় বিষয়	পঞ্চাশ বছরে কতটা (খুব/সামান্য) বেড়েছে বা কমেছে	তাতে স্থানীয় জীবদের কী সুবিধা/অসুবিধা হয়েছে
জনসংখ্যা	খুব বেড়েছে	
প্রাণী		
উদ্ভিদ, জলাশয়,কৃষিজমি		
রাস্তা		
বিদ্যুতের খুঁটি		
কারখানা		
যানবাহন		
রাসায়নিক সার ব্যবহার		
কীটনাশক ব্যবহার		
অন্যান্য বিষয়		

জীববৈচিত্র্য বিষয়ে এঁকে আর লিখে তোমার
পছন্দমতো একটা পোস্টার তৈরি করো:

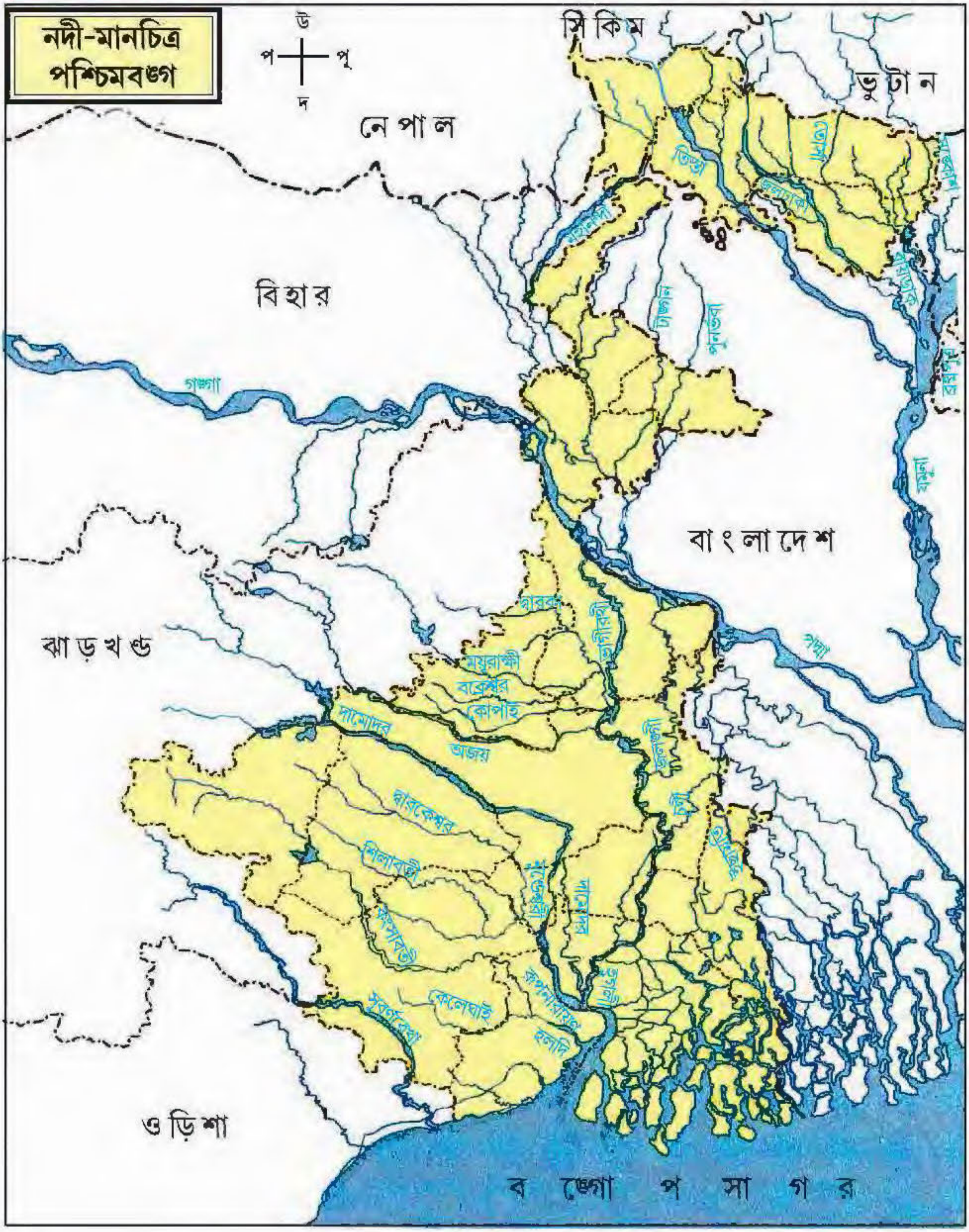
নদী-মানচিত্র
পশ্চিমবঙ্গ
উ
প
পু
দ
সিকিম
ভুটান
নেপাল
বিহার
বাংলাদেশ
ঝাড়খণ্ড
ওড়িশা
বঙ্গোপসাগর
গঙ্গা
তিস্তা
দ্বারকা
ময়ূরাক্ষী
বক্রেশ্বর
কোপাই
দামোদর
অজয়
দ্বারকেশ্বর
শিলাবতী
কংসাবতী
সুবর্ণরেখা
কেলেঘাই
রূপনারায়ণ
হলদি
পদ্মা

জমির ঢাল বা ভূমির ঢাল

বৃষ্টি থামার পর অন্তরা বেরোলো। স্কুলে যাবে। পথে রফিকুলের সঙ্গে দেখা। হাঁটতে হাঁটতে ওরা কালভার্টের কাছে পৌঁছে গেল। কালভার্টের উপর দুজন লোক বসে আছে। তলার পাইপ দিয়ে জল যাচ্ছে। উত্তর থেকে দক্ষিণের মাঠে।

সেটা দেখিয়ে রফিকুল বলল— দেখ, দক্ষিণের মাঠটা উত্তরের মাঠটার চেয়ে নীচু। উত্তরের সব জলই যাচ্ছে দক্ষিণে। তার মানে জমির ঢাল উত্তর থেকে দক্ষিণে।

অন্তরার বেশ মজা লাগল। স্কুলে গিয়ে সে এসব বলল। স্যার বললেন— সবাই নিজেরা দেখবে। এখানকার জমির ঢাল বা ভূমির ঢাল বুঝতে পারবে।

পশ্চিমবঙ্গের নদী-মানচিত্রটা দেখছিল আকাশ। সে বলল— নদীগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণে আসছে। তাহলে উত্তর থেকে দক্ষিণে ঢাল। এ তো বোঝাই যাচ্ছে!

অশেষ বলল— দামোদর পশ্চিম থেকে পূর্বে এসেছে। তারপর দক্ষিণে গিয়ে গঙ্গায় মিশেছে। তাই না স্যার?

— তবে যেখানে দামোদর মিশেছে সেখানে ওই নদীর নামটা হুগলি নদী। অনেকেই অবশ্য গঙ্গা বলেন।

অন্তরাও নদী-মানচিত্রটা দেখছিল। সে বলল— নদীগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণে বা পশ্চিম থেকে পূর্বে গেছে। তাহলে ভূমির ঢাল উত্তর থেকে দক্ষিণে আর পশ্চিম থেকে পূর্বে।

মানচিত্রে উঁচু জায়গা, নীচু জায়গা

রফিকুল বলল - স্যার, মানচিত্রে চিহ্ন দিয়ে ভূমির ঢাল বোঝানো যায়?

— ভেবে দেখো। এক দিকটা উঁচু। আর একটা দিক নীচু। এটা দেখাতে হবে। নানারকম রং ব্যবহার করলে কি সুবিধা হতে পারে?

অন্তরা বলল— হ্যাঁ স্যার। উঁচু জায়গা একটা রঙে দেখাব। নীচু জায়গা অন্য রঙে দেখাব।

— বেশ। আজ তোমার চেনা জায়গার ঢাল জেনেছ। সেটার উঁচু-নীচু বোঝানোর মানচিত্র এঁকে দেখাও।

অন্তরা দু-দিকের মাঠের ভূমির ঢাল বুঝিয়ে মানচিত্র এঁকে দিল।

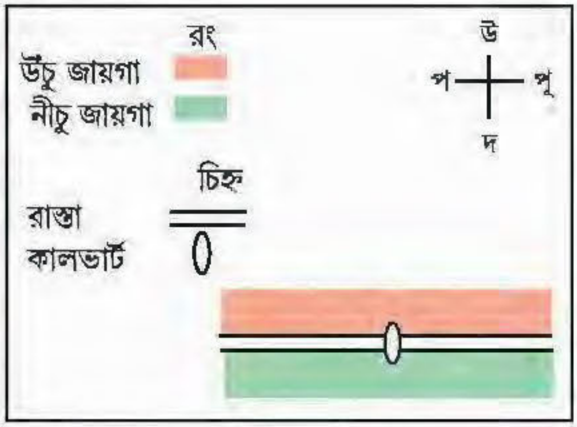

দেখেশুনে লেখো

কাছাকাছি অঞ্চলের ভূমির ঢাল দেখে একটা ছবি এঁকে কোন দিক থেকে কোন দিকে ঢাল বুঝিয়ে দাও:

তোমার ঠিকানা	দেখার তারিখ	কোথায় দেখেছ	কোন দিক থেকে কোন দিকে ঢাল	ভূমির ঢাল বোঝানোর মানচিত্র
				উঁচু জায়গা নীচু জায়গা উ, প, পু, দ

পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল

বর্ধমান জেলার চিত্তরঞ্জনে মালতি অনেকবার গেছে। সেখানে তার মামার বাড়ি। মালতি বলল— ওখানে ভূমি সবজায়গায় সমতল নয়। ঢেউ খেলানো ভূমির মাঝে মাঝে উঁচু টিলা আর পাহাড় দেখা যায়।

অন্তরা বলল— আর যেখানে পাহাড় নেই সেখানকার মাটি?

— বেশিটাই কাঁকর, পাথর মেশানো লালমাটি। অনুর্বর।

স্যার এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিলেন। এবার বললেন— এটাকে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল বলে। পুরুলিয়ার পুরোটাই এইরকম। বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম আর বর্ধমানের পশ্চিম দিকটাও তাই। মানচিত্র দেখো। বুঝতে পারবে। এখানকার মাটি লালচে।

রহমান বাঁকুড়ায় গেছে। সে বলল— বাঁকুড়ার চারিদিকে শালগাছের জঙ্গল। সেই শালপাতা দিয়ে প্লেট, বাটি বানানো হয়। মালতি বলল— অন্য গাছও আছে। মেহগনি, পলাশ, পিয়াল, ইউক্যালিপ্টাস, সোনাঝুরি, কেন্দু।

পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কেমন মাটি ও কত উঁচু ভূমি

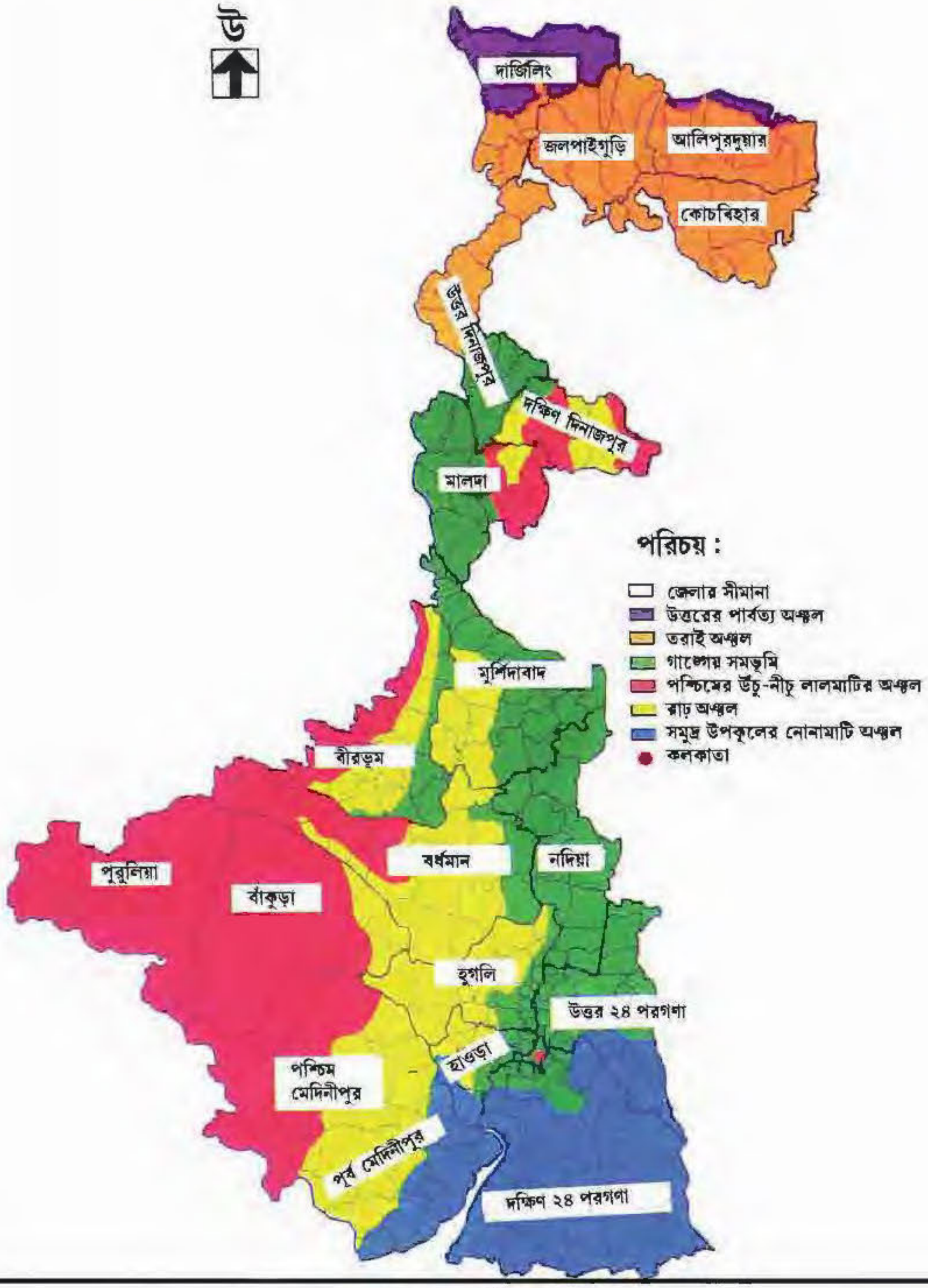

বলাবলি করে লেখো

ফলের গাছ নয়, বনের গাছ। কী কী দেখেছ? তা নিয়ে নীচে লেখো :

মেহগনি, পলাশ, মহুয়া, গামার, শিশু, আকাশমণি— এর মধ্যে কী কী গাছ দেখেছ? নাম লেখো। পাতার ছবি আঁকো।	আমরা ফল খাই না, এমন গাছ আর কী কী দেখেছ? নাম লেখো। পাতার ছবি আঁকো।

রাঢ় অঞ্চল

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে রফিকুলের আত্মীয়ের বাড়ি। সে বলল— বাঁকুড়ার পূর্ব আর দক্ষিণ দিকে কিন্তু জমি বেশ উর্বর।

— বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম দিক থেকে পূর্বে বয়ে গেছে দ্বারকেশ্বর নদ। পরে সেটা দক্ষিণ দিকে বেঁকে হুগলি জেলায় ঢুকেছে। আর দ্বারকেশ্বরের দক্ষিণে শিলাবতী নদী দক্ষিণ-পূর্বে গেছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের কাছে তারা মিলেছে। নাম হয়েছে রূপনারায়ণ। ওই অঞ্চলের কিছু অংশেও এই ধরনের উর্বর জমি।

অন্তরা অনেকবার দুর্গাপুরে গেছে। সে বলল— বর্ধমানের পূর্বদিকটাও তো উর্বর সমভূমি!

— হ্যাঁ। দামোদর তখন সমভূমিতে। হুগলির কাছাকাছি দামোদর থেকে বেরিয়েছে মুণ্ডেশ্বরী। মানচিত্রটা দেখো।

আবিদ বলল - একটু পশ্চিম ঘেঁসে দক্ষিণে গিয়ে মুণ্ডেশ্বরী মিশেছে রূপনারায়ণে। দামোদর হাওড়া জেলার ভিতর দিয়ে দক্ষিণে গেছে। মিশেছে হুগলি নদীতে। রূপনারায়ণও গেঁওখালিতে মিশেছে হুগলি নদীতে।

— ঠিক বলেছ। এর একটু পশ্চিম দিয়ে দক্ষিণে গেছে কেলেঘাই আর কংসাবতী নদী। এরা মিশে তৈরি হয়েছে হলদি নদী। সেটা হলদিয়াতে গিয়ে হুগলী নদীর সঙ্গে মিশেছে।

বরুণ একবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছিল। সে বলল— বীরভূমের পূর্বদিকটাও তো একইরকম।

স্যার বললেন— ওখানে রয়েছে ময়ূরাক্ষী নদী আর অজয় নদ। মানচিত্র দেখো। বুঝতে পারবে।

— এই নদীগুলো বর্ষার সময় পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের জল বয়ে আনে। তারপর সমতলে বন্যা হয়।

— এই অঞ্চলটাকে বলে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল। সব জায়গায় উর্বর মাটি। বেশিটা দোঁআশ। কিছুটা এঁটেল। ভূমি প্রায় পুরোটা সমতল। উত্তর আর পশ্চিম ধার বরাবর ভূমি ক্রমশ উঁচু হয়েছে। সেদিকে মাটি লালচে, ভূমি কিছুটা ঢেউ খেলানো। যত পূর্বে আর দক্ষিণে যাবে তত সাধারণ মেটে রং-এর মাটি দেখতে পাবে।

— রাঢ় অঞ্চলের বনজঙ্গল?

স্যার হেসে বললেন— সেসব কেটে চাষ-আবাদ করা হয়ে গেছে আগেই। তবে গত তিরিশ-চল্লিশ বছরে অনেক গাছ লাগানো হয়েছে। শাল, সেগুন, শিশু, মেহগনি, শিরীষ, আকাশমণি, কদম, বাবলা — বনের নানারকম গাছ। নানা জায়গায় রাজ্যের বন-দফতর গাছ লাগিয়েছে। এভাবে কয়েকটা নতুন বন তৈরি হয়েছে। ওদিকে গেলে রাস্তার ধারে ধারে দেখতে পাবে।

বলাবলি করে লেখো

তুমি যেখানে থাকো সেখানকার ভূমির ধরণ, মাটি, বন, নদী কেমন? নীচে লেখো:

সেখানকার ভূমির ধরণ কেমন — মালভূমি, সমভূমি না পার্বত্য ?	
নদী আছে কিনা, থাকলে কোন নদী, সারাবছর জল থাকে কিনা ?	
সেখানকার ভূমির ঢাল কী ধরনের? কম না বেশি?	
সেখানকার মাটির রং কী ?	
বন আছে কিনা, থাকলে তাতে কী গাছ আছে, নতুনভাবে কী কী গাছ লাগানো হয়েছে ?	
সেখানে চাষবাস হয় কিনা — হলে কী কী ফসল ফলে ?	

বরফ-গলা জলের নদী

ঈশানের মামাবাড়ি নদিয়া জেলায়। সেখানে অনেক নদী। গঙ্গা খুব চওড়া। তাছাড়া জলঙ্গী, মাথাভাঙা, চূর্ণি, ইছামতিও রয়েছে।

মামা বলেছিলেন — গঙ্গা হলো নিত্যবহ নদী। অর্থাৎ সবসময় বয়ে যায়। সারাবছর জল থাকে।

একথা শুনে স্যার বললেন — পর্বতের মাথায় জমা বরফ গলে গঙ্গার জল আসে।

ঈশান বলল— পর্বতের মাথায় বরফ জমে কেন?

—পুকুর-নদী-সমুদ্রের জল সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে ওপরে উঠে যায়। ওপরের বাতাস ঠান্ডা। তাই সেই বাষ্প জমে জল হয়। পর্বতের মাথায় ঠান্ডা বেশি বলে তুষারপাত হয়, তুষার জমে বরফ হয়ে যায়। সূর্যের তাপে কিছুটা বরফ গলে। জল হয়ে খাড়া পর্বতের ঢাল বেয়ে নেমে আসে। এইরকম অনেকগুলো ছোটো ছোটো জলধারা মিশে বড়ো নিত্যবহ নদী তৈরি করে। জলপাইগুড়ি জেলায় তিস্তাকে যেমন দেখায়।

— এভাবেই কি গঙ্গাও তৈরি হয়েছে?

— এভাবেই হয়েছে। তবে গঙ্গা অনেক দূর থেকে আসছে। উত্তরাখণ্ড রাজ্যের গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ গুহা থেকে এর শুরু। উত্তরপ্রদেশ, বিহারের মধ্যে দিয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় ঢুকেছে। তারপর দুটো ভাগ হয়ে গেছে। বেশি চওড়া ধারাটা চলে গেছে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে। তার নাম পদ্মা। আর অন্য ধারা পশ্চিমবঙ্গের ভেতর দিয়ে গেছে। এই ধারাটার নাম ভাগীরথী। হুগলি জেলায় এর নাম হুগলি নদী। শেষে ডায়মন্ডহারবার, হলদিয়া পেরিয়ে আরও দক্ষিণে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে।

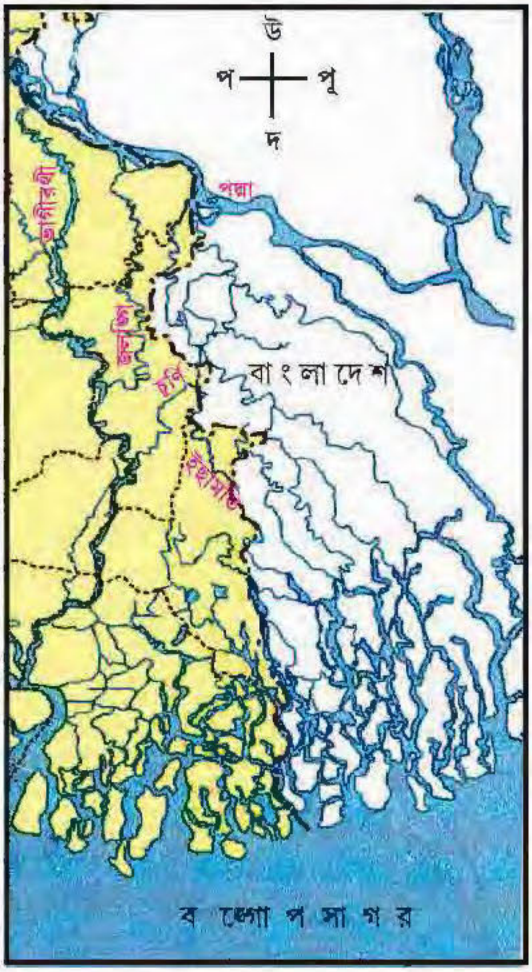

দেখে বুঝে লেখো

নদী-মানচিত্র দেখে নদীগুলোর সম্পর্কে লেখো:

নদীর নাম	কোথা থেকে শুরু হয়ে কোথায় মিশেছে
চূর্ণি	
জলঙ্গী	
ইছামতি	

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি

অন্তরা বলল— কম চওড়াটাই আমাদের গঙ্গা? তাহলে পদ্মাটা কত চওড়া?

— কোনো কোনো জায়গায় মাঝনদী থেকে পাড় দেখা যায় না। মনে হয় সমুদ্রের কূল নেই।

রফিকুল বলল — ভাগীরথী আর পদ্মার মাঝে অনেকটা জায়গা!

— দুই নদীর পলি জমেই মাঝখানের ভূখণ্ডটা তৈরি হয়েছে। এটাকে বলে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ।

রিনা বলল - ওখানকার মাটি খুব উর্বর?

—একেবারে দক্ষিণে সুন্দরবনের নোনা মাটি। বাকিটা সুজলা সুফলা শস্য - শ্যামলা। সমতল আর সমতল। শেষই হয় না। আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি কোথায় ছিল জানো তো?

— কলকাতার জোড়াসাঁকোয়। গঙ্গার খুব কাছেই।

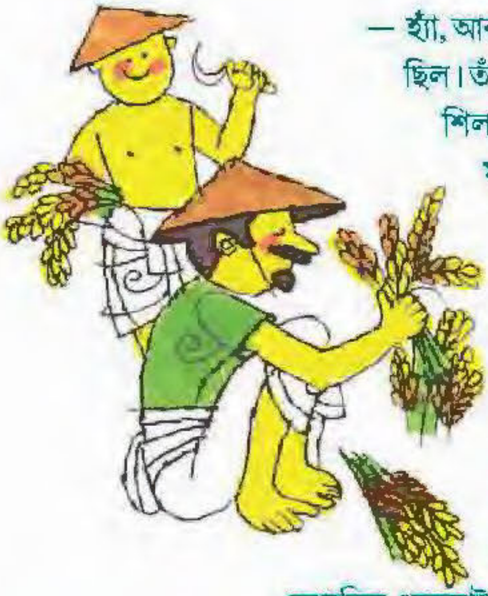

— হ্যাঁ, আবারপদ্মার গায়ে একটা জায়গার নাম শিলাইদহ। সেখানে তাঁর বাবার জমিদারি ছিল। তাঁকে সেই জমিদারি দেখার ভার দিয়েছিলেন তাঁর বাবা। তাই কলকাতা থেকে শিলাইদহ যাওয়া-আসা করতেন তিনি। সম্ভবত এই অঞ্চল দেখেই তিনি মাতৃভূমিকে সোনার বাংলা বলে একটা বিখ্যাত গান লিখেছিলেন।

অনেকে মিলে বলে উঠল— গানটা জানি,স্যার। *আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।*

—গানটা ১৯০৫ সালে লেখা। ইংরেজরা বাংলাকে দু-ভাগ করে দিয়েছিল। দুটো আলাদা প্রদেশ। সেই ঘটনাকে বলে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ।

অরুণ বলল — স্যার ইংরেজরা বাংলাকে দু-ভাগ করেছিল কেন?

—ইংরেজরা ভারতবর্ষকে শাসন করত। ভারতবর্ষের লোকেরা ইংরেজদের এই শাসন মেনে নেয়নি। তারা চাইত দেশের লোকেই দেশ চালাবে। তাই দেশের মানুষ একজোট হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। ইংরেজরা চেয়েছিল একজোট হওয়া মানুষকে আলাদা করতে। বাংলাকে দু-ভাগ করে দিয়ে সেই ভাগাভাগি শুরু করতে চেয়েছিল ইংরেজ শাসকরা। বাংলার মানুষ এই ভাগাভাগি মেনে নেয়নি। সবাই মিলে প্রতিবাদ করে। বিদেশি জিনিসপত্র ব্যবহার করা বন্ধ করে দেয় লোকেরা। চরকা কেটে সুতো বানিয়ে সেই থেকে নিজেরা কাপড়-জামা বানায়। রবীন্দ্রনাথও বাংলাভাগের বিরোধিতা করেন। তার প্রতিবাদে এই গানটা তিনি লিখেছিলেন ।এখন আবার ওই গানটা খুব বিখ্যাত। কেন বলত?

সবাই মিলে বলল— ওটা তো বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত!

— গাছ,লতা, ফুল,ফল আর হরেক ফসলের এই সমভূমি। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর থেকে এই ব-দ্বীপের পশ্চিম অংশটা পশ্চিমবঙ্গ। রংবেরঙের প্রজাপতি, পাখি, মৌমাছি আর গাছপালার সঙ্গে গাঁথা এখানকার মানুষের জীবন।

নদীতীরের সভ্যতা

মানচিত্র দেখতে দেখতে রফিকুল বলল — কিন্তু গঙ্গা তো নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পশ্চিম সীমায়। ইছামতি পূর্ব সীমার কাছে। মাঝে তো নদী নেই। এই ভূমি এত উর্বর হলো কীভাবে?

স্যার বললেন— আগে নদী ছিল। বিদ্যাধরী, সুতি, যমুনা, নোয়াই। বিদ্যাধরী এখনও আছে। তবে এখন তা ছোটো নদী। অন্যগুলো আর নেই। বিদ্যাধরীর কাছে এক জায়গায় মাটি খুঁড়ে অনেক কাল আগের ঘরবাড়ি, বাসনপত্র পাওয়া গেছে।

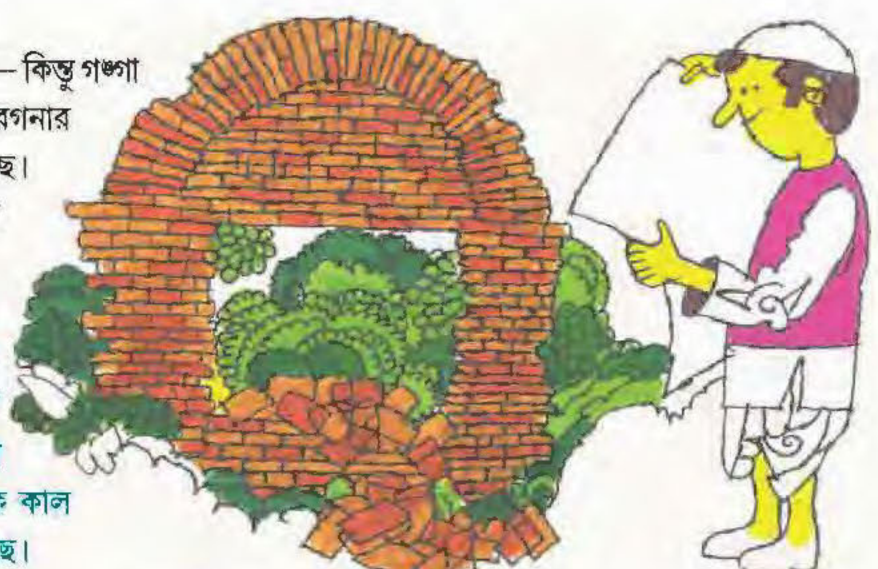

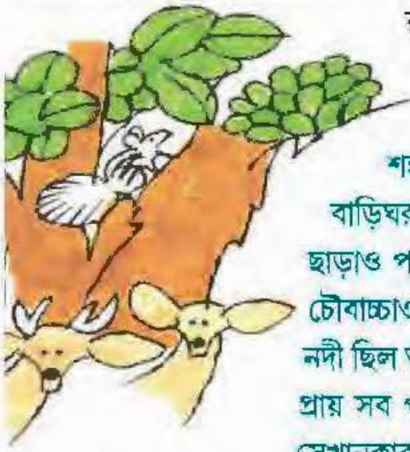

রঞ্জন বলল— জানি, চন্দ্রকেতু রাজার দুর্গ ছিল। ওখানকার লোকজন গড় বলে। কী পাতলা পাতলা ইট। পর পর তিনটে বসালেও এখনকার দুটোর মতো পুরু হবে না!

—হ্যাঁ, তখন সেখানে অনেক বড়ো কোনো নদী ছিল। পুরোনো দিনের কিছু কিছু শহর আজও দেখা যায়। সেইসব শহরে মানুষ ইটের বাড়ি বানাত। যেমন, হরপ্পা সভ্যতার বাড়িঘর। সেগুলো পোড়া ইট দিয়েই বানানো হয়েছিল। আগুনে পোড়া ইট। ঘর-বাড়ি ছাড়াও পথঘাট বানাত ইট দিয়ে। নর্দমাগুলোও ইটের হতো। জল ধরে রাখার বড়ো বড়ো চৌবাচ্চাও ইটের তৈরি হতো। জানো, সেই পুরোনো যুগে নদীর ধারেই সভ্যতা গড়ে উঠত। নদী ছিল তাদের মায়ের মতো। তাই ওইসব সভ্যতাকে **নদীমাতৃক সভ্যতা** বলা হয়। পৃথিবীর প্রায় সব পুরোনো সভ্যতাই নদীর ধারে গড়ে উঠেছিল। তবে নদীর বন্যায় অনেক সময়ে সেখানকার বাসিন্দাদের ক্ষতিও হতো। তবুও, নদীর ওপর নির্ভর করেই মানুষ বেঁচে থাকত।

রুবি বলল — স্যার সভ্যতা মানে কী?

— সভ্য মানুষের নানান কাজকর্মকে একসঙ্গে বলে সভ্যতা। ধরো, একসময়ে মানুষ আজকের মতো অনেক কিছু পারত না। পোশাক পরতে জানত না। নিজেদের খাবার নিজেরা তৈরি করতে পারত না। থাকার জন্য বাড়ি-ঘর বানাতে পারত না। পড়ালেখা জানত না। টাকা-পয়সার লেনদেন ছিল না। সহজে যাতায়াত করতে পারত না। তারপরে অনেক সময় ধরে এর সবগুলোই মানুষ শিখেছে। সেই শেখার ধাপগুলো একটু একটু করে সভ্য হওয়ার ধাপ। সেইসব ধাপ পার করে মানুষ আজকের অবস্থায় দাঁড়িয়েছে।

— কিন্তু স্যার, এই অঞ্চলে বন নেই?

— উত্তর চব্বিশ পরগনার পারমাদানে একটা পুরোনো বনখণ্ড আছে। আর নতুনভাবে তৈরি করা বন আছে নদিয়ার বেথুয়াডহরিতে। সেখানে শাল, সেগুন, মেহগনি, শিশু, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, কদম গাছ আছে। অনেক হরিণ, কাঠবিড়ালি আছে।

বলাবলি করে লেখো

তোমার কাছাকাছি কোথায় পুরোনো সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গেছে? সেখানকার কথা লেখো। নিজের জানা না থাকলে বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করে জেনে লেখো:

জায়গার নাম	কী কী পাওয়া গেছে (পোড়ামাটি /ধাতু/অন্যান্য কোন জিনিস), ছবি আঁকো

সুন্দরবন

অন্তরা বলল— এদিকে বড়ো কোনো পুরোনো জঙ্গল নেই?

স্যার বললেন— আছে তো। গাঙ্গেয় সমভূমির দক্ষিণ অংশটাই বিরাট বন। সুন্দরবন। অবশ্য তার বেশির ভাগটাই বাংলাদেশে। উত্তর-চব্বিশ পরগনার অল্প কিছু অংশ আর দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ-পূর্ব দিকের প্রায় পুরোটা জুড়ে সুন্দরবন। এই অঞ্চলের ভূমির ঢাল খুবই কম।

অন্তরা বলল— রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার তো এই বনেই আছে?

এই অঞ্চলে আবিরের মাসির বাড়ি। সে বলল— আছে তো। ওই বাঘ আর সুন্দরী গাছ। এই বনের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রাণী আর উদ্ভিদ। এটা খুব নীচু জায়গা। শুধু নদী আর নদী। মাতলা, বিদ্যাধরী, কালিন্দী, রায়মঙ্গল। চলাফেরা করতে গেলে বারবার নৌকা চড়তে হয়।

— এখানে আরও অনেক নদী আছে। একটা নদী থেকে আর একটা বেরিয়েছে। কিছু দূরে গিয়ে আবার একটায় মিশেছে।

রফিকুল বলল— তবে শেষপর্যন্ত সব নদী বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

অন্তরা বলল — এখানকার মাটিতে খুব নুন। মাটিতে বালি কম, কাদার ভাগ বেশি। মাটির তলার জলও নোনতা।

— তার কারণও সমুদ্র। এখানকার মাটির নীচের জলের স্তরের সঙ্গে সমুদ্রের সরাসরি যোগ রয়েছে যে! বনের পুরোটাই সাগরের খুব কাছে। অনেক দ্বীপ রয়েছে। মানচিত্র দেখলেই ভালো বুঝতে পারবে।

সবাই মানচিত্রটা ভালো করে দেখতে লাগল। স্যার আবার বললেন— পশ্চিমবঙ্গের অংশটায় ১০২টি দ্বীপ আছে। তার মধ্যে আটচল্লিশটায় ঘন বন রয়েছে। বসতি নেই। চুয়ান্নটায় মানুষ বেশ কিছু বন কেটে বসতি করেছে।

ঈশান বলল— কীভাবে সাগরের মধ্যে এত বড়ো বন হলো?

—প্রচুর পলিমাটি গোলা জল ভাগিরথী, পদ্মা ও অন্যান্য নদী দিয়ে বয়ে যেত। এই অঞ্চলে ভূমির ঢাল কম। তাই সেই পলি জমে জমে দ্বীপ তৈরি হয়ে যায়। তারপর বন। এভাবে সাত-আট হাজার বছর ধরে এই বন গড়ে উঠেছে। নদীর জল

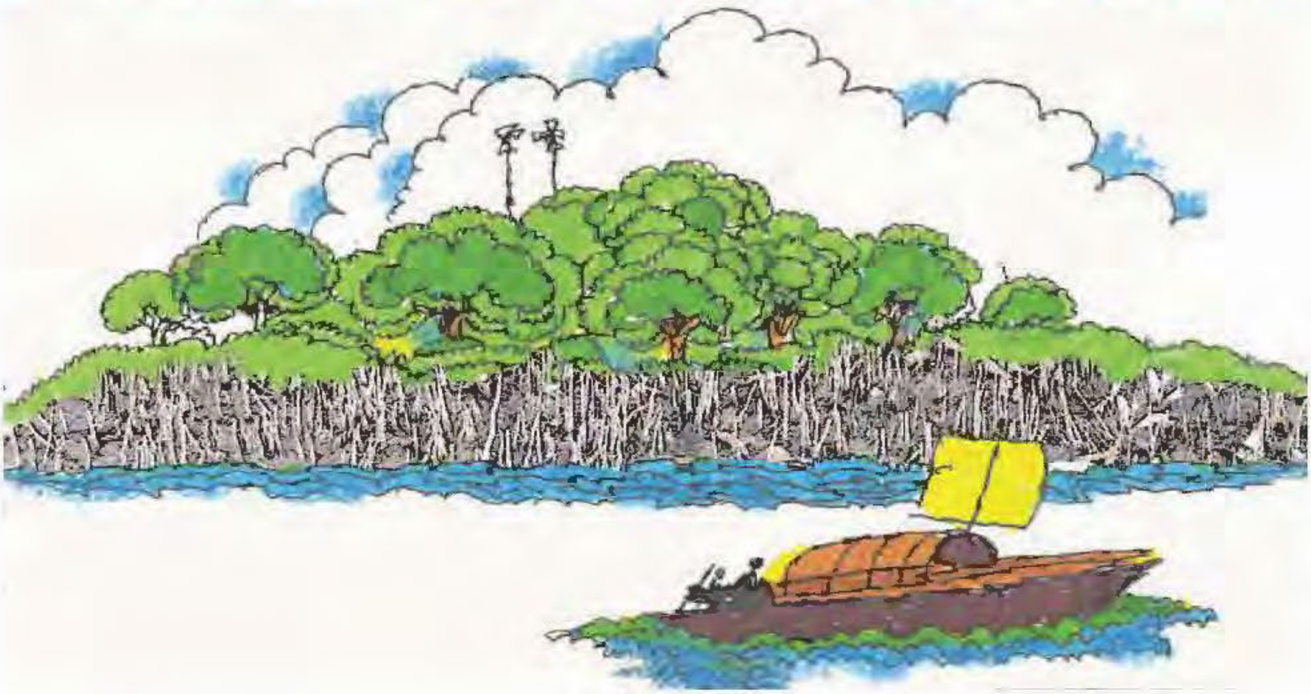

আর সমুদ্রের জল মিশে আছে এই অঞ্চলে। ওই ঈষৎ নোনা জল আর কাদায় জন্মায় একধরনের গাছ। তাদের দু-রকম মূল। মাটির গভীরে যায় ঠেসমূল। তা গাছকে মাটিতে আটকে রাখে। আর একরকম মূল মাটি থেকে উপরে ওঠে। তার সাহায্যে বাতাস থেকে অক্সিজেন নেয় গাছ। তাকে বলে শ্বাসমূল। এই ধরনের গাছকে বলে ম্যানগ্রোভ জাতীয় গাছ।।

আবির বলল— এখানে গেঁওয়া, বাইন আর গরান গাছ আছে।

— ঠিক বলেছ, ওগুলোই ম্যানগ্রোভ গাছ। এছাড়া আছে হেতাল, গোলপাতা। এখানকার জলে কামট আছে, খুব লম্বা খাঁড়ির কুমির আছে। ডাঙায় মেঠো বিড়াল, বুনোশুয়োর, চিতল হরিণ আছে। এখানে একশো বছর আগেও চিতাবাঘ, জাভান গন্ডার, বুনো মহিষ, বারশিঙ্গা পাওয়া যেত।

— এখানকার লোক নানারকম কাজ করেন। চাষ, মধু সংগ্রহ। নৌকা তৈরি করা ও চালানো। মাছ ও মীন ধরা, কাঁকড়া শিকার।

ফতেমা বলল— দিদি, ওই মীন থেকেই তো ভেড়িতে গলদা চিংড়ি আর বাগদা চিংড়ির চাষ হয়। মেয়েরাই বেশিরভাগ নদীতে নেমে মীন সংগ্রহ করেন।

বলাবলি করে লেখো

সুন্দরবন সম্পর্কে বাড়িতে, পাড়ায় ও স্কুলে বড়োদের সঙ্গে কথা বলো। তারপর লেখো :

সুন্দরবনে ঝড়ের সমস্যা কেমন	সুন্দরবনে যাতায়াত কীভাবে হয়	বাঘ না থাকলে সুন্দরবনের কী হতো

কোথায় উঁচু, কোথায় নীচু

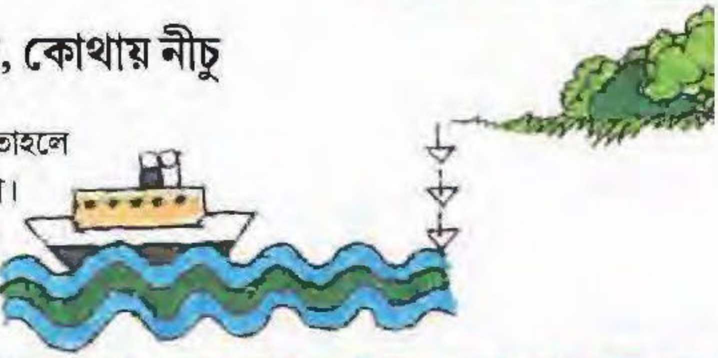

স্কুল থেকে ফেরার সময় রফিকুল ভাবল সুন্দরবনটা তাহলে সবচেয়ে নীচু জায়গা। তারপর গাঙ্গেয় সমভূমিটা। তারপর রাঢ় অঞ্চলটা। পশ্চিমের মালভূমিটা সবচেয়ে উঁচু। কিন্তু কতটা উঁচু? কোন লেভেল থেকে মাপা যায়? পরদিন ক্লাসে এসব জানতে চাইল।

স্যার বললেন— সমুদ্রের জলের তল থেকে উচ্চতা মাপতে হয়। তোমরা সবাই এক মিটারের চেয়ে একটু বেশি লম্বা। তাহলে সুন্দরবন সমুদ্রজলের তুলনায় কত উঁচু হতে পারে?

ঈশান বলল — ২-৩মিটার হবে।

— তুমি যেখানে গেছ, সেখানে তাই। তবে ৪-৫ মিটার উঁচু জায়গাও আছে। বেশিরভাগ জায়গার উচ্চতা কমবেশি ৩মিটার হতে পারে।

রেখা বলল— গাঙ্গেয় সমভূমি আর একটু উঁচু। সমুদ্রজলের তুলনায় ১০-১৫ মিটার হবে?

— উত্তর ২৪ পরগনায় ৫-৬মিটার উচ্চতার জায়গা আছে। আবার মুর্শিদাবাদে ১৮-২০মিটার উচ্চতার জায়গা আছে। মোটামুটি এই অঞ্চল ১২-১৪মিটার উঁচু ভাবতে পারো।

এমিলি বলল— রাঢ় অঞ্চল তো আরো উঁচু। ৫০-১০০মিটার হতে পারে?

— ঠিক বলেছ। তবে পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল রাঢ় অঞ্চলের থেকেও বেশ উঁচু। ৫০মিটার থেকে ২০০মিটার উচ্চতায় বিভিন্ন জায়গা। বেশিরভাগ জায়গার উচ্চতা১০০-৫০০ মিটার ধরতে পারো।

— তাহলে সব অঞ্চলের উচ্চতাই আমরা জেনে নিলাম।

— সব বলা যাবে না। দক্ষিণবঙ্গের সব অঞ্চলের উচ্চতা জানা হলো। মুর্শিদাবাদ থেকে দক্ষিণের অংশটার কথাই আমরা বলেছি। এই অঞ্চলটাকে দক্ষিণবঙ্গ বলে।

বলাবলি করে লেখো

দক্ষিণবঙ্গের কোন পাঁচটা জেলা তোমার কাছাকাছি? সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সেই জেলাগুলোর সবচেয়ে উঁচু আর নীচু জায়গার উচ্চতা বিষয়ে আলোচনা করে লেখো:

তোমার ঠিকানা	কাছের জেলাগুলোর নাম	সবচেয়ে উঁচু জায়গার উচ্চতা	সবচেয়ে নীচু জায়গার উচ্চতা

উত্তরবঙ্গের উঁচু-নীচু জায়গা ও নদী

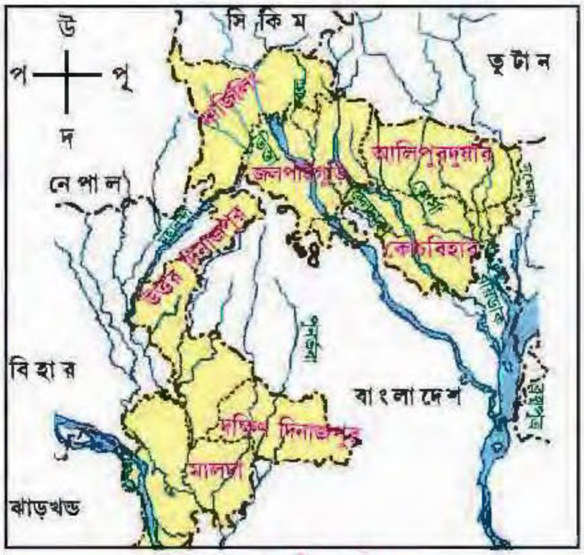

উত্তরবঙ্গের নদী-মানচিত্র

রফিকুল বলল— উত্তরবঙ্গে তো আরো উঁচু জায়গা আছে।

স্যার উত্তরবঙ্গের একটা মানচিত্র দেখালেন। বললেন— মানচিত্রে উত্তরবঙ্গের নদীগুলো দেখো।

আকাশ বলল— উত্তর দিকটা হিমালয় পর্বতের অংশ।

— দার্জিলিং জেলার উত্তর দিকটা দেড় হাজার মিটারেরও বেশি উঁচু। জলপাইগুড়ির উত্তর দিকের উচ্চতা প্রায় এক হাজার মিটার।

রফিকুল মানচিত্রটা দেখছিল। সে বলল— তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, মহানন্দা, সঙ্কোশ — এগুলো বরফগলা জলের নদী?

আকাশ বলল— তা তো বটেই। খাড়া উপর থেকে জল নামছে। খুব স্রোত।

— নদীগুলো দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুর দুয়ার আর কোচবিহারের ঢালু জায়গা দিয়ে গেছে।

রফিকুল বলল— ঢালু জায়গাও আছে? পর্বতের পরই সমতল নয়?

— পর্বতের পর কিছুটা ঢালু। তারপর সমতল। কোচবিহারের কিছু জায়গার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০-৪০মিটার। পুরো জায়গাটায় মাঝে মাঝে উঁচু-নীচুও আছে।

অন্তরা মানচিত্র দেখতে দেখতে বলল— এখানে আরো নদী আছে। কালজানি, রায়ডাক। এরাও পলি বয়ে আনে?

— পলি আনে। তার সঙ্গে পাহাড় থেকে বালি, নুড়ি-পাথর আসে। তাই মাটিতে বালি,নুড়ি পাথর বেশি। মাটি স্যাঁতস্যাঁতে। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির দক্ষিণ অংশ, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরের উত্তর অংশের জমির এই বৈশিষ্ট্য। এই অঞ্চল তরাই অঞ্চল নামে পরিচিত।

বলাবলি করে লেখো

উত্তরবঙ্গে তোমার কাছের পাঁচটা জেলার নাম, ভূমি ও নদী বিষয়ে আলোচনা করে লেখো :

তোমার ঠিকানা	কাছের জেলাগুলোর নাম	জেলার ভূমি কেমন	ওই জেলায় কী কী নদী আছে

পর্বতশ্রেণি, পর্বতশৃঙ্গ

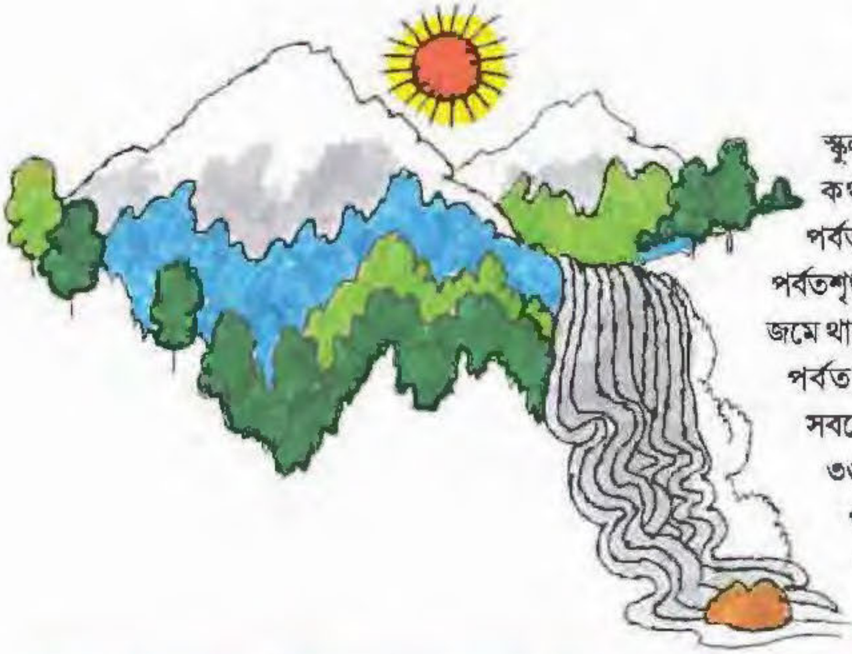

স্কুল থেকে ফেরার সময় আকাশ পর্বতশ্রেণির কথা বলল। পর্বতশ্রেণিগুলোয় উঁচু উঁচু পর্বতশৃঙ্গ থাকে। শৃঙ্গগুলো খুব খাড়া। উঁচু পর্বতশৃঙ্গগুলো সাদা হয়। কেন-না তার উপর বরফ জমে থাকে। শেষে বলল— দার্জিলিং-এ সিংগালিলা পর্বতশ্রেণি আছে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ সান্দাকফু। তার উচ্চতা ৩৬৩০মিটার।

পরদিন ক্লাসে এসব শুনে অন্তরা বলল— ওখান থেকে কোনো নদী হয়নি?

স্যার বললেন— ওইসব জায়গা থেকে ছোটো বড়ো ঝরনা হয়ে বরফগলা জল গাড়িয়ে নীচে আসে। ওইরকম অনেক ঝরনার জল মিলেই নদী হয়। অনেক সময় একাধিক জায়গা থেকে জল এসে একটা জায়গায় জমে। সেখান থেকে নদীর ধারাটা তৈরি হয়। আর সেটাকেই লোকে বলে নদীর জন্মস্থান। এমন একটা জায়গা দার্জিলিং জেলার ডাওহিল। সেখানে মহানন্দার জন্ম।

আকাশ বলল— দার্জিলিং যেতে গেলে তো পর্বতের বনের মধ্যে দিয়েই যেতে হয়। জলপাইগুড়িতে জলদাপাড়ায় বন আছে। সেখানে অনেক হাতি, একশৃঙ্গ গন্ডার আছে। এ অঞ্চলে আর কোথাও বন-জঙ্গল নেই?

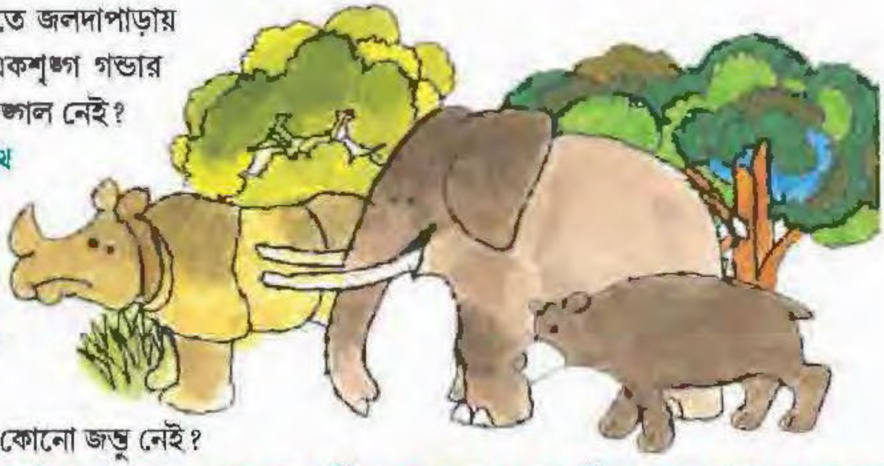

— ঠিকই বলেছ। পর্বতে ওঠার পথে সর্বত্রই কম-বেশি বন আছে। জলপাইগুড়ির উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে সর্বত্রই ঘন বন। সেখানেই আছে বক্সা-জয়ন্তি পাহাড়। আর বিখ্যাত বক্সার বাঘবন।

আয়ুব বলল— ওখানে বাঘ ছাড়া আর কোনো জন্তু নেই?

— হ্যাঁ। ভালুক, হাতি, হরিণ, অজগর, বাইসন আছে। নানারকম পাখি, নানা রঙের প্রজাপতিও দেখা যায়। এর মধ্যে শকুন সংরক্ষণ কেন্দ্রও আছে। এই জঙ্গলের এক দিকে ভুটান যাওয়ার রাস্তা। আর এক দিক দিয়ে যাওয়া যায় বাংলাদেশের রংপুরে। এখানে আছে বক্সা দুর্গ। একসময় এই দুর্গ ছিল ভুটানের। ১৮৬০-র দশকে ব্রিটিশরা এই দুর্গ দখল করেন। সেই থেকে এই দুর্গ ভারতের মধ্যে। পরে যাঁরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতেন, তাঁদের অনেককে ব্রিটিশ সরকার এখানে বন্দি করে রাখত।

আকাশ বলল— এখান দিয়ে রেল লাইন গেছে।

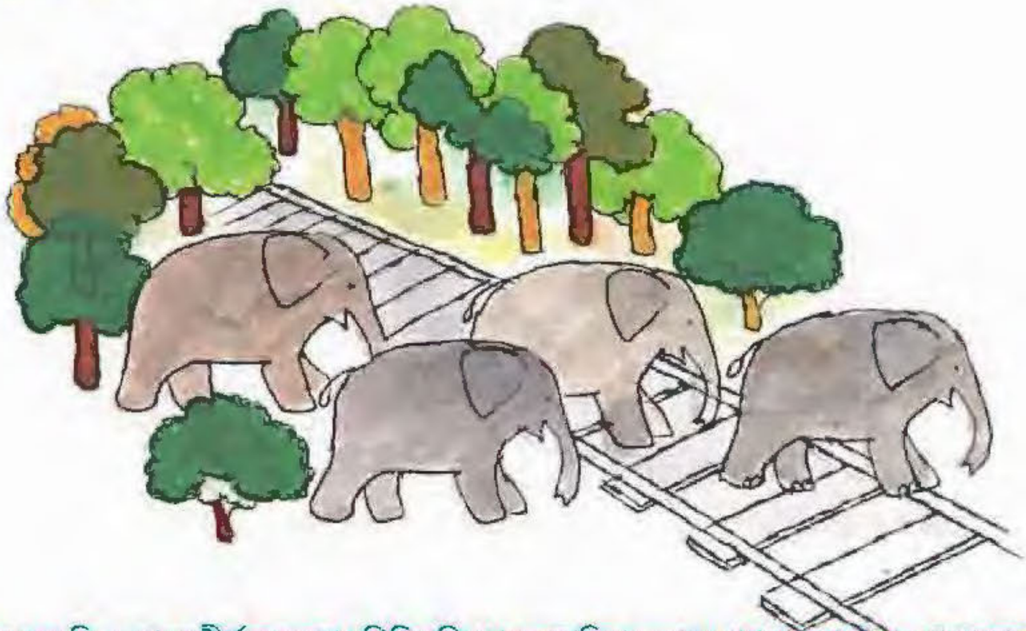

— হ্যাঁ, জঙ্গলের বুক চিরে গেছে দীর্ঘ রেলপথ। শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার। পশুরা চলাফেরার পথে মাঝে মাঝে কাটা পড়ে রেলপথে।

— এখানে কী গাছ বেশি আছে?

— এই জঙ্গলে নানা গাছ ও গুল্ম জন্মায়। সেগুন, শাল, চিলৌনি, পানিসাজ, খয়ের, শিশু, গামার গাছ খুব দেখা যায়। খুব বৃষ্টি হয়। স্যাঁতস্যাঁতে ভাব থাকে বছরের অনেকটা সময়। সূর্যের আলো বিশেষ ঢোকে না।

মালতি বলল— জলপাইগুড়িতে আর একটা বন আছে গোরুমারায়। সেখানে কোন কোন বন্য জন্তু আছে?

— ওখানেও একশৃঙ্গ গন্ডার, চিতাবাঘ, ভালুক আছে। হাতি, বাইসন আছে। তাছাড়া ছোটো ছোটো অনেক পশু আছে।

বলাবলি করে লেখো

উত্তরবঙ্গের বনের পশু ও গাছপালার মধ্যে কী কী তোমার দেখা সে বিষয়ে লেখো, ছবি আঁকো :

কোন কোন গাছ দেখেছ	কোন কোন পশুপাখি দেখেছ	ওইসব গাছ, পশু-পাখির মধ্যে তোমার দেখা দু-একটার ছবি আঁকো

উত্তরবঙ্গের নানা জায়গা

নাসিমা বলল— স্যার, মালদাও তো উত্তরবঙ্গে? মালদায় ফজলি আম হয়। এক একটার ওজন এক কেজিরও বেশি হয়।

স্যার বললেন— হ্যাঁ। এই অঞ্চল ফজলি আমের জন্যই বিখ্যাত।

রফিকুল মানচিত্র দেখছিল। বলল— জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গা। আর প্রায় মাঝখান দিয়ে গেছে মহানন্দা। এখানে কি সবটা সমভূমি?

— মহানন্দার পুবদিকের ভূমি শক্ত, অনুর্বর। এই অঞ্চলের উচ্চতা প্রায় ৪০-৫০মিটার। মহানন্দার পশ্চিম দিকটাকে দু-ভাগ করেছে কালিন্দী নদী। উত্তর পশ্চিমের অংশটা বেশি নীচু। বন্যা হয়। আর দক্ষিণ-পশ্চিম অংশটার ভূমি খুব উর্বর। এই অংশের উচ্চতা ১৫-২০মিটার।

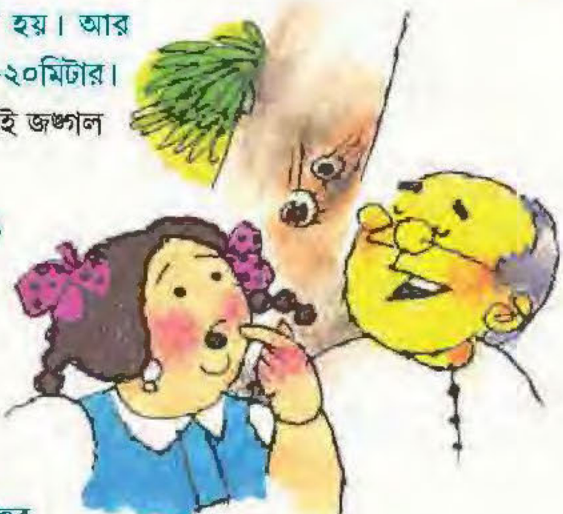

অশেষ বলল— পুবদিকটা অনুর্বর। তাহলে ওই দিকটায় নিশ্চয়ই জঙ্গল আছে?

— আছে। তবে খুব ঘন জঙ্গল নয়। পিপুল, নিম, তেঁতুল, জাম, বাবলা, বাঁশ— এইসব গাছ আছে। ছোটো ছোটো বন্য পশুও আছে। এছাড়া রায়গঞ্জে কুলিক নদীর পাড়ে কুলিক পাখিরালয় আছে।

— দক্ষিণ দিনাজপুরের ভূমি কেমন?

— পশ্চিম দিকটা মালদা জেলার পুব দিকের লাগোয়া। এটা অনুর্বর, শক্ত অঞ্চল। উচ্চতা ৪০-৫০মিটার। তবে জেলার উত্তর অংশের ভূমি উর্বর। তার সঙ্গে রাঢ় অঞ্চলের ভূমির মিল আছে। ওই অঞ্চলের উচ্চতা ২৫-৩০মিটার।

বলাবলি করে লেখো

তোমার কাছাকাছি অঞ্চলের ভূমি, বন, নদীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোন অঞ্চলের মিল তা লেখো :

মিলের বিষয়	তোমার বাড়ির কাছাকাছি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য	যে অঞ্চলের সঙ্গে মিল তার নাম ও মিলের ধরন
ভূমির উচ্চতা		
ভূমির ধরন		
ভূমির উর্বরতা		
স্থানীয় নদী		
স্থানীয় বন		

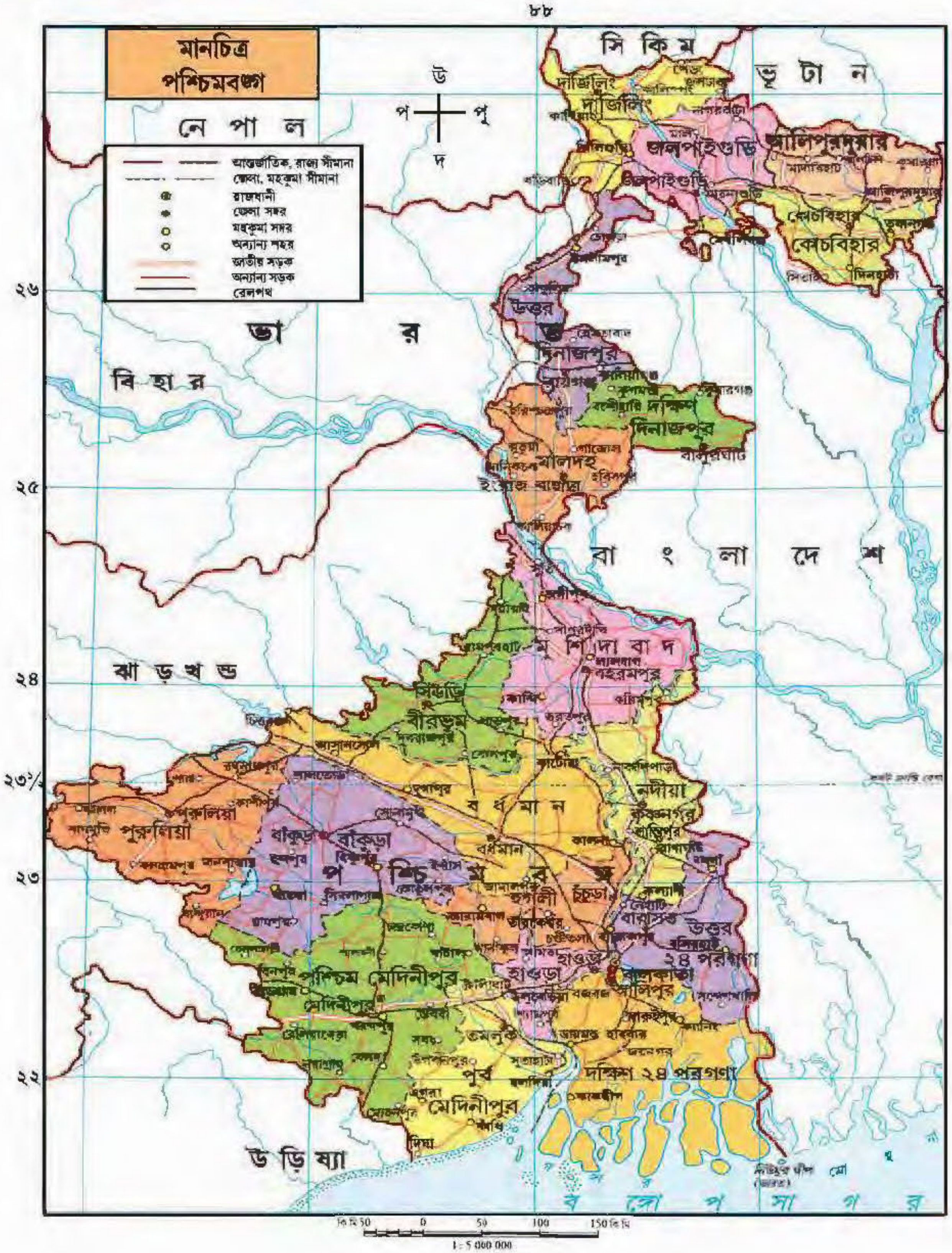
৮৮
মানচিত্র
পশ্চিমবঙ্গ
উ
প
পূ
দ
সিকিম
ভূটান
নেপাল
আন্তর্জাতিক, রাজ্য সীমানা
জেলা, মহকুমা সীমানা
রাজধানী
জেলা সদর
মহকুমা সদর
অন্যান্য শহর
জাতীয় সড়ক
অন্যান্য সড়ক
রেলপথ
ভারত
বিহার
ঝাড়খণ্ড
বাংলাদেশ
উড়িষ্যা
বঙ্গোপসাগর
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
আলিপুরদুয়ার
কোচবিহার
উত্তর দিনাজপুর
দক্ষিণ দিনাজপুর
মালদহ
মুর্শিদাবাদ
বহরমপুর
বীরভূম
বর্ধমান
নদীয়া
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
পশ্চিমবঙ্গ
হুগলী
চুঁচুড়া
হাওড়া
উত্তর ২৪ পরগণা
বারাসত
কলকাতা
পশ্চিম মেদিনীপুর
মেদিনীপুর
তমলুক
পূর্ব মেদিনীপুর
দক্ষিণ ২৪ পরগণা
দিঘা
২৬
২৫
২৪
২৩½
২৩
২২
কি মি 50 0 50 100 150 কি মি
1 : 5 000 000

পশ্চিমবঙ্গের জেলা সদর

সবাই জানে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড়ো শহর কলকাতা। রাজ্যের রাজধানী। এছাড়া আর বড়ো শহর কী কী? কোন শহরে কী আছে?

স্যার বললেন - তোমরাই বলো। উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করো।

অনেকেই জেলা সদরগুলোর নাম জানে। মানচিত্রে বারবার দেখেছে। কোনটায় বিশেষ কী আছে তাও কিছু কিছু জানে। তারা যা বলল স্যার বোর্ডে তা লিখলেন। আরো কিছু কথা স্যার নিজেই লিখে দিলেন। তারপর বললেন – বাকিটার জন্য মানচিত্র দেখবে। নিজেরা আলোচনা করবে। বাড়িতে বা পাড়ায় যাঁরা জানেন তাঁদের সঙ্গেও কথা বলবে। তারপর লিখবে।

৬৫ ও ৭৮ পৃষ্ঠার মানচিত্র দেখে, পড়ে ও আলোচনা করে ফাঁকা জায়গায় লেখো:

সদর শহর ও জেলার নাম	জেলার কোন দিকে	কোন অঞ্চলে	শহরের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য (পড়ো, আরও কিছু জানতে পারলে লেখো)
দার্জিলিং, দার্জিলিং জেলা			ম্যাল, চিড়িয়াখানা, রোপওয়ে, টয়ট্রেন, চা-বাগান, ঘুম, টাইগার হিল-এর জন্য বিখ্যাত। বরফে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বত দেখা যায়।
জলপাইগুড়ি , জলপাইগুড়ি জেলা			তিস্তা ও করলা নদীর তীরবর্তী শহর। জেলা হাসপাতাল, ফার্মেসি কলেজ আছে। সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
আলিপুরদুয়ার, আলিপুরদুয়ার জেলা			বক্সা অরণ্যের প্রবেশদ্বার। গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে জংশন। পর্যটনকেন্দ্র। ধান, চা, কাঠের বাণিজ্যকেন্দ্র।
কোচবিহার, কোচবিহার জেলা			তোর্সার পূর্ব তীরে অবস্থিত, পূর্বতন মহারাজের প্রাসাদ, মদনমোহন মন্দির ইত্যাদি দর্শনীয় জায়গা আছে।
রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর জেলা			পাখিরালয় আছে।
বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা			আত্রেয়ী নদীর পূর্বপাশে অবস্থিত। কলেজ, বিদ্যালয়, আইন কলেজ আছে। প্রান্তিক স্টেশন। বিভিন্ন কৃষিপণ্যের বাণিজ্যকেন্দ্র।
ইংলিশ বাজার, মালদা জেলা			মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত আমের শহর। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, পলিটেকনিক কলেজ আছে।

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ জেলা			ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত। রেশম শিল্প, পিতলের বাসন তৈরির জন্য বিখ্যাত।
সিউড়ি, বীরভূম জেলা			তাঁত ও সিল্কের কাপড় তৈরি হয়, এখান থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে বক্রেশ্বর তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র অবস্থিত। সিউড়ির মোরব্বা বিখ্যাত।
কৃষ্ণনগর, নদিয়া জেলা			মাটির পুতুল ও সরপুরিয়া বিখ্যাত।
বর্ধমান, বর্ধমান জেলা			সীতাভোগ ও মিহিদানা বিখ্যাত।
বাঁকুড়া, বাঁকুড়া জেলা			টেরাকোটা শিল্পের জন্য বিখ্যাত।
পুরুলিয়া, পুরুলিয়া জেলা			কলেজ ও বিখ্যাত স্কুল আছে। এখানের ছৌনাচ বিখ্যাত। কাছেই অযোধ্যা পাহাড় রয়েছে।
মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা			কংসাবতীর তীরে অবস্থিত।
তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা			আদি নাম তাম্রলিপ্ত। একসময় রূপনারায়ণ নদীর তীরে অবস্থিত ছিল পান, ধান, কলা, ফুল ও ইলিশ মাছের বাণিজ্যকেন্দ্র। ডিগ্রি কলেজ আছে।
হাওড়া, হাওড়া জেলা			হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত। বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে।
চুঁচুড়া, হুগলি জেলা			হুগলি নদীর তীরে জি.টি. রোড-এর দু-পাশের শহর। নানা দর্শনীয় জায়গা আছে।
বারাসাত, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা			বিভিন্ন কৃষিপণ্যের বাণিজ্যকেন্দ্র।
আলিপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা			চিড়িয়াখানা, জাতীয় পাঠাগার, টাঁকশাল, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, আবহাওয়া অফিস আছে।
কলকাতা, কলকাতা জেলা			হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত রাজ্যের রাজধানী শহর। রাজভবন, মিউজিয়াম, ইডেন উদ্যান, ফোর্ট উইলিয়াম, পাতাল রেল, বন্দর, বিমানবন্দর আছে।

আরো শহর-নগরের কথা

পরের দিন। স্যার বললেন— ভালো করে ভাবো তো। আর কোনো শহরের নাম জানো কিনা।

আসলে তো আরও কয়েকটা শহরের নাম অনেকেই জানে। বিভিন্ন শহরে আত্মীয়রা থাকেন। তারা সেইসব শহরের নাম বলতে শুরু করল। অবশ্য অনেকেই একই শহরের নাম বলল। স্যার বললেন— এবারও আগের মতোই লেখা যাক। উত্তরবঙ্গের শহর থেকেই শুরু হোক।

৭৮ পৃষ্ঠার মানচিত্র দেখে, পড়ে ও আলোচনা করে ফাঁকা জায়গায় লেখো:

শহরের নাম কোন জেলায়	জেলার কোন দিকে	কোন অঞ্চলে	শহরের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য (পড়ো, আরও কিছু জানতে পারলে লেখো)
শিলিগুড়ি, দার্জিলিং জেলা			শহর, রেল স্টেশন ও বাণিজ্যকেন্দ্র। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এই শহরে অবস্থিত। ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজ আছে।
কালিম্পং, দার্জিলিং জেলা			পাহাড়ি শহর। সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর জায়গা। ফুল, ক্যাকটাস, অর্কিডের জন্য বিখ্যাত। অনেক মিশনারি স্কুল ও মঠ আছে।
কার্শিয়াং, দার্জিলিং জেলা			পাহাড়ি শহর। ন্যারো গেজ ট্রেন গেছে। সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর জায়গা। প্রচুর চা-বাগান আছে। সাদা অর্কিড আছে। অনেক মিশনারি স্কুল আছে।
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা			বন্দর শহর ও পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প।
খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা			আইআইটি শিক্ষাকেন্দ্র ও বড়ো রেলওয়ে স্টেশনের জন্য বিখ্যাত।
আসানসোল, বর্ধমান জেলা			কয়লাখনি অঞ্চলে বেশ বড়ো শহর। তিনটে কলেজ ও একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে। পাশ দিয়ে বরাকর নদী গেছে। বিখ্যাত ইস্পাত কারখানা আছে। এই শহরে ও কাছাকাছি অনেক শিল্প গড়ে উঠেছে।
বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া জেলা			ডিগ্রি কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে। পোড়ামাটির কাজ, বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত।
দিঘা, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা			সমুদ্রের ধারে ছোটো পর্যটন শহর। সমুদ্রে স্নান করার সুযোগ আছে। কাজুবাদাম, শাঁখের কাজ ও মাছের ব্যাবসার জন্য বিখ্যাত।
বারুইপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা			রেলের জংশন স্টেশন। নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে খুব ভালো পেয়ারা হয়।
শান্তিপুর, নদিয়া জেলা			কলেজ আছে। তাঁতের কাপড় তৈরি হয়। রাসমেলার জন্য বিখ্যাত।

৭৮ পৃষ্ঠার মানচিত্র দেখে, পড়ে ও আলোচনা করে ফাঁকা জায়গায় লেখো:

শহরের নাম, কোন জেলায়	জেলার কোন দিকে	কোন অঞ্চলে	শহরের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য (পড়ো, আরও কিছু জানতে পারলে লেখো)
বোলপুর, বীরভূম জেলা			শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। হাতের কাজের জন্য বিখ্যাত।
ডায়মন্ডহারবার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা			হুগলি নদীর মোহনার কাছে শহর। মৎস্য বিক্রয় কেন্দ্র। চিংড়িখালি দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। পর্যটনকেন্দ্র।
আরামবাগ, হুগলি জেলা			দ্বারকেশ্বর-এর তীরে অবস্থিত শহর। দুটো কলেজ, নতুন রেল স্টেশন হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কৃষি-বাণিজ্যকেন্দ্র।
কাটোয়া, বর্ধমান জেলা			গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। কলেজ, রেলস্টেশন আছে। কৃষি-বাণিজ্যকেন্দ্র।
চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান জেলা			রেলের ইঞ্জিন তৈরির কারখানা আছে।
ডানকুনি, হুগলি জেলা			গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন। কোল কমপ্লেক্স ও দুগ্ধ-সংরক্ষণ কেন্দ্র আছে।
কল্যাণী, নদিয়া জেলা			পরিকল্পিত শহর। মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিল্পকারখানা আছে।
নবদ্বীপ, নদিয়া জেলা			ভাগীরথী ও জলঙ্গী নদীর মিলনস্থলের তীরে অবস্থিত। তাঁতশিল্প, কলেজ ও রেলস্টেশন আছে। চৈতন্যদেবের জন্মস্থান।
ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা			রেলস্টেশন, রাজবাড়ি, কলেজ, ডিয়ারপার্ক ও সংলগ্ন বনাঞ্চল আছে।
দুর্গাপুর, বর্ধমান জেলা			লৌহ-ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে।
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা			কৃষি ও মৎস্য বাণিজ্যকেন্দ্র। রেলওয়ে স্টেশন আছে। সমুদ্রের কাছাকাছি অবস্থিত।
তারকেশ্বর, হুগলি জেলা			আলুচাষের অঞ্চলে অবস্থিত শহর। হিমঘর ও উল্লেখযোগ্য কৃষি-বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত।

শহরের আরও কথা

এর মধ্যে অনেকেরই আরও অনেক শহরের কথা মনে পড়ল। তা নিয়ে সবাই বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনাও করল। পর দিন জগৎ বলল – আরও কয়েকটা শহরের কথা মনে পড়েছে।

স্যার বললেন – সেই শহর বিষয়ে যা লিখতে চাও নিজেরা লেখো।

ছোটো ছোটো দল করে আবার সবাই আলোচনা করল। পছন্দ মতো ছক করে নিল। কয়েকটা শহরে বিষয়ে লিখল।

বলাবলি করে লেখো

নীচে পছন্দমতো ছক করে নাও। আর যেসব শহরের কথা মনে পড়ছে সেগুলো সম্পর্কে সেই ছকে লেখো :

নানা জায়গার প্রকৃতির নানা সম্পদ

ফুলমণির বাবার বন্ধু মৃগেন মুর্মু। অনেক দূরে থাকেন। বাবার সঙ্গে ফুলমণি সেখানে বেড়াতে গেল। সে আগে কখনও গ্রাম ছেড়ে দূরে যায়নি। এমন দৃশ্যও আগে দেখেনি। রাস্তার পাশে দাঁড়ালে যতদূর দেখা যায় শুধু সবুজ ধানগাছ।

ফুলমণি বাবাকে বলল— আমাদের ওদিকে এমন ধান হয় না কেন?

বাবা বলল— আমাদের লালমাটি। জল দাঁড়ায় না, চাষ হয় না! মাটি যেখানে যেমন। এখানে জমির ঢাল খুব কম। তাই জল দাঁড়ায়। সব জমিতেই ধান হয়।

ফুলমণি হতাশ হলো। তাই তার বাবা আবার বলল— আমাদের ওখানকার মাটিতে পাথর আছে। পাকা বাড়ি করতে লাগে। অন্য জায়গার লোকরাও ওখান থেকেই পাথর আনে।

এসব মাসকয়েক আগের কথা। ফুলমণি চিঠিতে সব লিখেছিল তার বন্ধু জাগরণকে। ওরা এখন কার্শিয়াং-এ গেছে। ওর বাবা সেখানে বদলি হয়ে গেছেন। সে লিখেছে তারা উঁচু পাহাড়েই থাকে। সেখানকার জমি খুব ঢালু। তবু সবুজ চা-বাগানে ছেয়ে আছে।

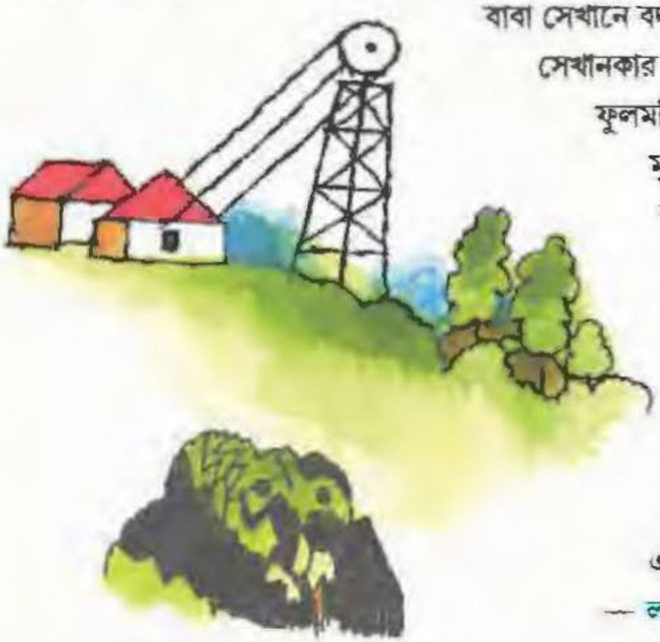

ফুলমণি স্কুলে গিয়ে বলল জাগরণের কথা। মাসকয়েক আগে মৃগেনকাকার বাড়ি যাওয়ার সময়ে কী দেখেছিল সে কথাও বলল।

সুধন বলল— তোর বাবা তো ঠিকই বলেছেন। আমাদের পাথর আছে। জঙ্গল আছে। কাঠের কত দাম জানিস?

রবিলাল বলল— বাসে করে দু-ঘণ্টা গেলেই কয়লা খনি। ওখান থেকেই সব জায়গায় কয়লা যায়। কয়লা ছাড়া ইট পোড়াতে পারবে?

— স্যার, বিদ্যুৎ তৈরি করতেও তো কয়লা লাগে।

এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিলেন স্যার। হেসে বললেন

— লাগে তো। প্রকৃতির সম্পদ একেক জায়গায় একেক রকম।

বলাবলি করে লেখো:

তোমাদের কাছাকাছি এলাকায় প্রকৃতির কী কী সম্পদ আছে তা নিয়ে আলোচনা করে লেখো :

তোমাদের কাছাকাছি এলাকার প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ কী কী	অন্যান্য সম্পদ কী কী

প্রকৃতি ও মানুষ মিলে তৈরি করে সম্পদ

পরদিন ক্লাসে সম্পদ নিয়ে আবার কথা শুরু হলো।

দিদি বললেন— মানুষের স্বাস্থ্য একটা সম্পদ। তা আছে বলেই পরিশ্রম করতে পারে। বুদ্ধি আর একটা সম্পদ। আর প্রকৃতিতে ছড়িয়ে আছে আরও অনেক সম্পদ। সেসব নিয়ে, নিজের স্বাস্থ্য ও বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে,আরও অনেক সম্পদ তৈরিও করছে মানুষ।

ডমরু বলল— যেমন মাটি আর কয়লা দিয়ে করেছে ইট। তা দিয়ে করেছে পাকা বাড়ি।

মৈরাং বলল— একজন মানুষের বুদ্ধি নয় কিন্তু! রান্নার কথাটা ধর। প্রথমে তো রাঁধতই না। রান্নার জন্য আগুন জ্বালানোর দরকার। অথচ এক সময়ে মানুষ আগুন জ্বালাতে পারত না। তখন কাঁচা খাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তারপরে একসময়ে আগুন জ্বালাতে শিখল। তখন জ্বলন্ত কাঠের আগুনে মাংস ঝলসে খেত। কিন্তু রান্নার জন্য বাসনপত্র চাই। পাত্র না হলে রাঁধবে কীসে? রাখবেই বা কীসে রাঁধা খাবার? খাবেই বা কীভাবে?

রুবি বলল— পরে কেউ বুদ্ধি করে মাটির কড়া করল। তারপর হাঁড়ি। এখন কত কী হয়েছে! স্টিলের বাসন, প্রেসার কুকার, আরো কত কী!

— জানো প্রথম দিকে মানুষ মাটির পাত্রের গায়ে আঁকত। তারপর সেটা পুড়িয়ে শক্ত করে নিত। নানা কিছু আঁকার বিষয় ছিল। মাটি খুঁড়ে তেমন অনেক আঁকা পাত্র পাওয়া গেছে।

মথন বলল— উনুনই কত রকম! আগে মাটিতে গর্ত করে কাঠের উনুন হতো। তারপর আঁচের উনুন। গ্যাসের উনুন। অনেকরকম ইলেকট্রিকের উনুনও হয়েছে।

লক্ষ্মীমণি বলল—কত হাজার বছর ধরে হয়েছে বলত এগুলো। কত মানুষের বুদ্ধি কাজে লেগেছে ভেবে দেখত?

দিদিমণি বললেন—একজন বুদ্ধি করে কিছু করত। আর একজন তা শিখত। তারপর বুদ্ধি করে আর একটু ভালো কিছু করার চেষ্টা করত। এভাবে অনেক মানুষের বুদ্ধি যোগ হয়েছে।

ফুলমণি বলল—এটাই তো মানুষের বড়ো সম্পদ। এভাবে যোগ না হলে একার বুদ্ধিতে বেশি দূর এগোনো যায় না।

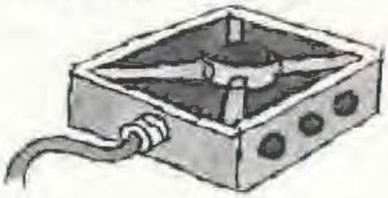

বলাবলি করে লেখো

তুমি যেসব সম্পদ ব্যবহার করেছ তার মধ্যে কী কী অনেক মানুষ মিলে তৈরি করেছে তা নিয়ে আলোচনা করে লেখো:

মানুষের তৈরি সম্পদের নাম	ওই সম্পদ কী কী দিয়ে তৈরি	সম্পদটা কী কী কাজে লাগে

লেখা নেই কাগজে, আছে শুধু মগজে

দু-দিন পরে। স্কুলে এসে শ্যামল একটা ঘটনার কথা বলল। খেলতে গিয়ে তার পা কেটে গেছিল। মাঠের পাশে হারুন মিঞার বাড়ি। উনি গাছপাতার ওষুধ জানেন। তাই শ্যামল ছুটে গিয়েছিল তাঁর কাছে। উনি প্রথমে কাটাটা ভালো করে দেখেন। তারপর বাগান থেকে দু-রকম পাতা এনে তার রস লাগিয়ে দেন। কিছুটা ছেঁচা পাতা দিয়ে আঙুলটা মুড়ে দেন। আর একটা পরিষ্কার সাদা কাপড় জড়িয়ে বেঁধে দেন।

পরদিন সকালে শ্যামল দেখে যে আঙুলটায় ব্যথা নেই। কাটাটা দেখা যাচ্ছে। তবে সেটা শুকোনোর মুখে। বিকেলে ঠাকুরদাকে সে ঘটনাটা বলে। ঠাকুরদা বলেন যে হারুনের বাবাও ওই রকম ওষুধের কথা জানতেন। ওষুধ দিয়েছেন তাঁকেও।

সবাই বুঝল যে হারুন মিঞা ওষুধ-গাছগুলো চিনেছিলেন তাঁর বাবার কাছ থেকে। তাঁর বাবা হয়তো চিনেছিলেন তাঁর বাবার কাছ থেকে। কোনো বইতে ওই গাছের কথা নাও থাকতে পারে।

তাই মথন বলল — আমরা সবাই মিলে ওনার কাছে যাব। গাছটা চিনে নেব।

ইমদাদ বলল — যেতে পারিস। কিন্তু উনি সহজে বলবেন না। আমার দূর সম্পর্কের দাদা হন তো। আমি জানি।

স্যার বললেন — তা হতে পারে। এসব জ্ঞান সাধারণত পারিবারিক সম্পদ। বাবা-মায়ের কাছ থেকে ছেলেমেয়েরা শেখে।

— না, না। ওঁর ছেলে শহরে ডাক্তারি পড়ছে। তাকেও বলেননি। সে নাকি এসব ব্যাপার জানতেও চায় না।

মথন বলল — তাহলে তো উনি মারা গেলে কেউ জানতেও পারবে না।

— সেটাই তো চিন্তার বিষয়।

হীরামণি বলল — আমার দিদিমা খুব সুন্দর বড়ি দেয়। খুব ভালো স্বাদ হয়। কিন্তু কীভাবে অত ভালো হয় তা বলে না।

রবিলাল তার ঠাকুরমার নকশাকাটা কাঁথা বানানোর কথা বলল। ফুলমনি বলল তার দাদুর সুন্দর ঝুড়ি বানানোর কথা।

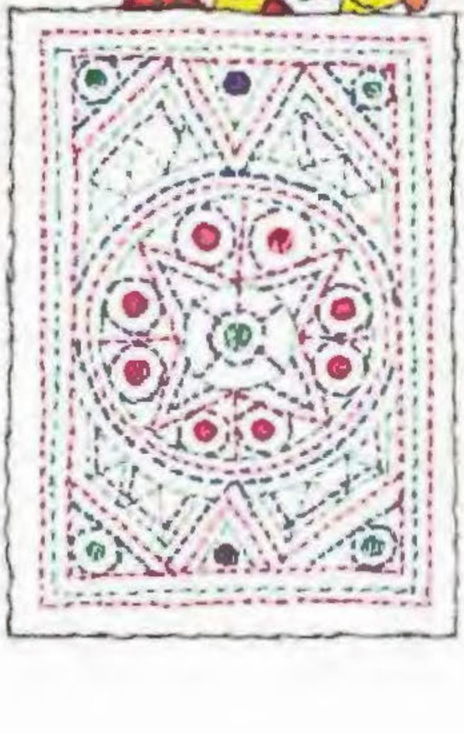

বলাবলি করে লেখো

তোমাদের বা বড়োদের পরিচিত কার এমন জ্ঞান আছে? খোঁজ নিয়ে, আলোচনা করে লেখো:

জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	যাঁর জ্ঞান তাঁর নাম ও পরিচয়	কীভাবে ওই জ্ঞান কাজে লেগেছিল	এ বিষয়ে তোমার মন্তব্য

জ্ঞান আর উৎসব

নানারকম জ্ঞান নিয়ে কথা হচ্ছিল। মৈরাং বলল— কাকা খুব সুন্দর বাঁশি বাজায়। তোর সামনেই বাজাবে। কিন্তু বাজানো দেখলেই বা বাঁশির সুর শুনলেই শিখতে পারবি না।

ফুলমণি বলল —নাচ-গানও তাই। আমার পিসির মতো নাচতে পারে ক-জন? দেখে তো সবাই!

— সবাই মিলে আমরা যে নাচগান করি সেটাই কি কম সুন্দর নাকি?

ওদের এসব কথা শুনে স্যার খুব খুশি হলেন। বললেন— এই কারণেই সবাই মিলে উৎসব করা দরকার। এমনি করতে করতে কেউ কেউ একেকটা কাজ খুব ভালো শিখবে।

বলাবলি করে লেখো

তোমাদের কাছাকাছি অঞ্চলে কী কী উৎসব হয় তা নিয়ে আলোচনা করে লেখো:

প্রধানত নাচ-গানের উৎসব	প্রধানত অভিনয় ইত্যাদির উৎসব	নানা অঞ্চলের জিনিসের কেনা-বেচা	অন্যান্য উৎসব

স্মরণীয় যাঁরা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(১৮৩৮-১৮৯৪)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(১৮৬১-১৯৪১)

মৈরাং বলল— ভালো ভালো কাজ করে অনেকেই খুব বিখ্যাত হয়েছেন। তাঁদের আমরা চিরদিন মনে রাখি, তাই না?

স্যার বললেন— হ্যাঁ। তাঁদের আমরা সম্মান করি। তাঁদের জন্মদিনে, মৃত্যুদিনে শ্রদ্ধা জানাই।

মথন বলল— যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজি নজরুল ইসলাম, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

— হ্যাঁ, ওঁরা মনীষী। নানারকম লেখা লিখেছেন। দেশের মানুষের ভালোর কথা ভেবেছেন, দেশের জন্য কাজ করেছেন। তাই তো আমরা ওঁদের লেখা পড়ি।

রাজা রামমোহন রায়
(১৭৭২/মতান্তরে১৭৭৪-১৮৩৩)

কাজি নজরুল ইসলাম
(১৮৯৯-১৯৭৬)

মেরি বলল — দেশের মানুষের ভালো তো আরো অনেকেই করেছেন। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, বেগম রোকেয়া।

— নিশ্চয়ই। ওঁরা সবাই মনীষী। আগেকার দিনের মানুষের অনেক ভুল ধারণা ছিল। যেমন, বাড়িতে মেয়ে জন্মালে অনেকে দুঃখ পেত। মেয়েদের বেশি লেখাপড়া শিখতে দিত না। অল্প

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও
(১৮০৯-১৮৩১)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
(১৮২০-১৮৯১)

স্বামী বিবেকানন্দ
(১৮৬৩-১৯০২)

ভগিনী নিবেদিতা
(১৮৬৭-১৯১১)

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু
(১৮৫৮-১৯৩৭)

বেগম রোকেয়া
(১৮৮০-১৯৩২)

বয়েসে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিত। কখনও কখনও বর মারা গেলে বউকেও তার সঙ্গে পুড়িয়ে মারত। এসব অন্যায় দেখে রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর প্রতিবাদ করেন। অনেক লড়াই করে তাঁরা এসব অত্যাচার বন্ধ করেন। দেশের সমস্ত মানুষ যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে তার জন্যও চেষ্টা করেন। বই লেখেন, স্কুল বানান, সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলেন। স্বামী বিবেকানন্দ দেশের মানুষকে হাতেকলমে শিক্ষার কথা বলেছিলেন। বলতেন, বইতে মুখ ডুবিয়ে বসে থেকো না। ফুটবল খেলো, তাতে শরীর-মন ভালো হবে। শুধু বই পড়ে কিছু হয় না। ভগিনী নিবেদিতা নিজের জীবনের পরোয়া করেননি। প্লেগরোগীদের সেবা করেছেন। বেগম রোকেয়া মেয়েদের পড়াশোনা শেখানোর জন্য চেষ্টা করেছিলেন। এঁরা সবাই আমাদের শ্রদ্ধার মানুষ।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
(১৮৬১-১৯৪৪)

মেঘনাদ সাহা
(১৮৯৩-১৯৫৬)

মৈরাং বলল— আমরা তো বিজ্ঞানী, শিক্ষকদেরও শ্রদ্ধা করি। যেমন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

— হ্যাঁ। আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন বিরাট বিজ্ঞানী। আবার খুব ভালো শিক্ষকও ছিলেন ওঁরা। ছাত্র-ছাত্রীদের খুব ভালোবাসতেন। তাছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, প্রশান্ত চন্দ্র মহালনাবিশ প্রমুখ বিজ্ঞানীদেরও আমরা শ্রদ্ধা করি।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ
(১৮৯৩-১৯৭২)

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু
(১৮৯৪-১৯৭৪)

পলাশ বলল— আবার গান্ধিজি, নেতাজির জন্মদিনেও তো আমরা পতাকা তুলি। ওঁদের শ্রদ্ধা জানাই।

— ওঁরা দুজনেই আমাদের দেশকে স্বাধীন করার জন্য অনেক লড়াই করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধি সাধারণ মানুষকে একজোট করেছিলেন। তাদের নিয়ে ইংরেজদের বিরোধিতা করেছিলেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ইংরেজদের বিরুদ্ধে

পরিবেশ ও সম্পদ

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি
(১৮৬৯-১৯৪৮)

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু
(১৮৯৭-)

লড়াই করার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ বানিয়েছিলেন। তাইতো ওঁদের আমরা আজও শ্রদ্ধা করি। ওঁদের কাজকর্মের আলোচনা করি। সেসব কাজকর্ম থেকে শিখতে চেষ্টা করি।

লীনা বলল— আরও অনেকেই তো দেশের জন্য লড়াই করেছেন।

— করেছেন তো। অনেক দিন ধরে লড়াই করেই দেশের মানুষ স্বাধীন হয়েছে। অনেক লোক সেই লড়াইতে ছিল। তাদের সবার নাম আমরা জানি না। তোমাদের অনেকেরই বাড়িতে তেমন মানুষ আছেন। আবার অনেকের নাম আমরা জানি। সেই নাম জানা-অজানা সব মানুষই আমাদের শ্রদ্ধার। তবে কেউ কেউ খুবই বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁদের কাজের জন্য। তাঁদের আমরা সবাই মনে রাখি।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) (১৮৭৯-১৯১৫)

ক্ষুদিরাম বসু
(১৮৮৯-১৯০৮)

সূর্য সেন (মাস্টারদা)
(১৮৯৪-১৯৩৪)

ভগৎ সিং
(১৯০৭-১৯৩১)

রাবেয়া বলল— যেমন ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকি, বিনয়-বাদল-দীনেশ, মাস্টারদা সূর্য সেন, বাঘা যতীন, ভগৎ সিং।

—হ্যাঁ। খুব অল্প বয়সে দুই বন্ধু লড়তে গেছিলেন দেশের জন্যে। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি। সুশীল সেন নামে একজন ছাত্র ছিল। ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা করার জন্য তাকে বেত মারা হয়। তাকে নিয়ে গান লেখা হয়েছিল। *বেত মেরে তুই মা ভোলাবি, আমরা কী মা-র সেই ছেলে*। এখানে *মা* মানে দেশ। সূর্য সেন ছিলেন মাস্টারমশাই। তিনি ছাত্রছাত্রীদের দেশের কথা বলতেন। দেশের মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা জানাতেন। দেশের হয়ে কাজ করার জন্য তাদের উৎসাহ দিতেন। নিজেও সরাসরি ইংরেজদের শাসন দূর করার জন্য কাজ করতেন। বিনয়-বাদল-দীনেশ, বাঘা যতীন, ভগৎ সিং এঁরা সবাই স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন। অনেকে লড়তে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন। তাঁদের দেখে আরো অনেক মানুষ লড়াই করতে এগিয়ে এসেছেন। এইসব লড়াই একজায়গায় হয়েই ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দেশ স্বাধীন হয়েছে। তোমরা আজ স্বাধীন ভারত দেখছ। এই স্বাধীনতার পিছনে এঁদের সবার চেষ্টা আছে।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
(১৯১১-১৯৩২)

কল্পনা দত্ত
(১৯১৩-১৯৯৫)

রুবি বলল— মেয়েরাও তো স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিল। মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত।

— নিশ্চয়ই। দেশের জন্য লড়াইতে মেয়েরাও এগিয়ে এসেছিলেন। ইংরেজ শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এগিয়ে

মাতঙ্গিনী হাজরা
(১৮৬৯/মতান্তরে ১৮৭০-১৯৪২)

গেছিলেন। অস্ত্র হাতে লড়াই করেছিলেন। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা দত্ত অস্ত্র হাতে লড়াই করেছিলেন। মাতঙ্গিনী হাজরা অসংখ্য মানুষকে একজোট করে লড়াই করেন। ইংরেজরা ভয় দেখিয়েছিল। তবু মাতঙ্গিনী লড়াই ছাড়েননি। গান্ধিজির মতোই মাতঙ্গিনী লড়াই করেছিলেন। তাই লোকে তাঁকে শ্রদ্ধা করে *গান্ধিবুড়ি* নাম দিয়েছিলেন। এমন আরো অনেক মানুষ আছেন। তোমরা আস্তে আস্তে সবার কথাই জানবে। এঁদের সবার কাজ থেকেই আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। সেসব শিখতে পারলেই আমরা তাঁদের আসলে শ্রদ্ধা জানাতে পারব।

বলাবলি করে লেখো

আর কোন কোন মানুষজন ভালো কাজ করে খুব বিখ্যাত হয়েছেন। তাঁদের সম্পর্কে বড়োদের কাছে, শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের কাছে জানার চেষ্টা করো। নিজেরা আলোচনা করো। তারপর সবার নাম ও কাজের কথা লেখো:

ভালো কাজের জন্য বিখ্যাত মানুষজনের নাম	তাঁদের প্রধান ভালো কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

দিবস পালন: আমাদের উৎসব

জওহরলাল নেহরু
(১৮৮৯-১৯৬৪)

ভীমরাও রামজি আম্বেদকর
(১৮৯১-১৯৫৬)

স্কুলে কার কার জন্মদিন পালন হয়? সবাই খোঁজ করতে শুরু করল। উঁচু ক্লাসের একজন বলল — মনীষীদের জন্মদিনের পাশাপাশি আরও নানারকম দিবস পালন হয়! সাধারণতন্ত্র দিবস। স্বাধীনতা দিবস। শিক্ষক দিবস। শিশু দিবস। পরিবেশ দিবস। অরণ্য সপ্তাহ।

হীরামতি বলল —পরিবেশ দিবস পালন করাই উচিত। পরিবেশ ভালো না থাকলে আমরা সুস্থ থাকতে পারব না।

মথন বলল — অরণ্য তো অনেকটাই ধ্বংস হয়েছে। এখন অরণ্যসপ্তাহে কত গাছ লাগাই আমরা। উদ্ভিদ ছাড়া প্রাণীরা বাঁচবে না। একথা বারবার মনে করানো দরকার। তাই অরণ্য সপ্তাহ পালন।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ
(১৮৮৮-১৯৭৫)

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ
(১৮৮৮-১৯৫৮)

মৈরাং বলল—মানুষ স্বাধীনতা চায়। ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস তো আমরা পালন করবই। আবার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ-এর জন্মদিন। সেদিন আমরা শিক্ষক দিবস পালন করি।

—রাধাকৃষ্ণাণ খুব বড়ো পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। গোটা পৃথিবীতে ওঁর সম্মান ছিল। খুব ভালো শিক্ষকও ছিলেন উনি। তাইতো ওঁর জন্মদিনে শিক্ষক দিবস পালন করো তোমরা।

ফুলমণি বলল— শিশু দিবস তো জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন। তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। শিশুদের উনি খুব ভালোবাসতেন। সেদিনটা তাই আমরা *শিশু দিবস* হিসেবে পালন করি। বাবা সাহেব আম্বেদকরও আমাদের শ্রদ্ধার মানুষ। উনি ভারতের সংবিধান বানিয়েছিলেন। তাই সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। আবুল কালাম আজাদ স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী। স্বাধীনতার জন্যও তিনি লড়াই করেছিলেন।

সাকিল বলল—সাধারণতন্ত্র দিবস কেন পালন করি আমরা?

— সাধারণতন্ত্র মানে হল সাধারণ মানুষই দেশ চালাবে। 'রাজার ছেলে রাজা হবে' এমনটি চলবে না। আজ যে সাধারণ লোক, সেই পরে ভোটে জিতে সরকারের প্রধান হতে পারে। স্বাধীন দেশটা কেমন করে আমরা চালাব তার এমন নিয়ম চালু হয়েছিল ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি। এই তারিখটাই ভারতবর্ষের *সাধারণতন্ত্র দিবস*।

— এই দিনটাও পালন করা উচিত।

— আর কোন কোন দিবস পালন করতে চাও? তা নিয়ে আলোচনা করো। তারপর লেখো। আমরা ক্লাসের মধ্যেও পালন করতে পারি।

বলাবলি করে লেখো

আর কোন কোন দিবস পালন করতে চাও? তা নিয়ে আলোচনা করে লেখো :

তারিখ	কেন পালন করতে চাইছ	কী দিবস নাম দেবে	কীভাবে পালন করতে চাও

কেউ যেন না হারিয়ে যায়

আর কোন দিবস পালন করব? এই নিয়ে অনেক তর্ক হলো।

মৈরাং বলল - বীরসা মুন্ডার জন্মদিন পালন করব। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন বীরসা।

> বীরসা মুন্ডা আর তাঁর সঙ্গীরা বনভূমিতে বসবাসের অধিকার রক্ষার জন্য ইংরেজ আর তাদের দেশীয় সঙ্গীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

ইমদাদ বলল- আমার নানা-নানি এসেছিলেন। ওঁরা উত্তর ২৪ পরগনায় থাকেন। তাঁরা বীরসার নাম শুনেছেন। কিন্তু তাঁর লড়াইয়ের কথা খুব ভালো করে জানেন না। নানা আমাকে বললেন, তুমি স্কুল থেকে ভালো করে বীরসার বিষয়ে জেনো। তবে ওঁরা বলেন তিতুমিরও ইংরেজদের বিরুদ্ধে খুব লড়েছিলেন ।

ফুলমণি বলল - বেশ তো। সবার কথাই জানতে হবে। দেশকে ভালোবেসে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের সবার কথাই জানা দরকার।

> তিতুমির ও তার সঙ্গীরা ইংরেজ আর তাদের দেশীয় সঙ্গী জমিদারদের অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

স্যার বললেন - ঠিকই তো।

সিধো মুর্মু

বিরসা মুণ্ডা

ইংরেজরা অন্যায়ভাবে চাষের জমি কেড়ে নিয়েছিল। জঙ্গল কেটে ফেলেছিল। রেশম চাষ নষ্ট করতে বাধ্য করেছিল। এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল অনেক সাধারণ মানুষ। বীরসা মুন্ডা, সিধো ও কানহু, তিতুমির সবাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। এঁরা সবাই আমাদের শ্রদ্ধার মানুষ। তির-ধনুক নিয়ে হাজার-হাজার মানুষ মোকাবিলা করেছিল ইংরেজ সেনার। তিতুমির বানিয়েছিলেন বাঁশের কেল্লা। সেই বাঁশের কেল্লা ইংরেজদের কামানের ঘায়ে ভেঙে যায়। কিন্তু দেশের মানুষ তিতুমিরের লড়াইকে মনে রেখে দিয়েছে। তবে নিজের এলাকার যাঁরা ভালো কাজ করেছেন তাঁদের কথাও নিশ্চয়ই জানবে। অন্য সমস্ত অঞ্চলের কথাও জানার চেষ্টা করবে।

সুফল বলল— দিদিদের কলেজ করেছিলেন আরতির ঠাকুরদা। তিনি আর আরতির ঠাকুমা দুজনেই স্বাধীনতার জন্য জেল খেটেছিলেন। আমরা তাঁদের জন্মদিন পালন করব?

— নিশ্চয়ই। সেইসব দিনে তাঁদের সম্পর্কে জানা হবে। কলেজ হওয়ায় কী সুবিধা হয়েছে সে আলোচনা হবে। শুধু দিবস পালন নয়। নিজের এলাকার মানুষদের ভালো ভালো কাজের কথা আগে বুঝব। নইলে ভালো কাজ কথাটার মানে বুঝব কী করে?

হীরামতি বলল— এই তো, আমরা নানা পশুর মুখোশ তৈরি করি। মুখোশ

পরে নাচ-গান করি। এগুলো দেখতে সবাই ভালোবাসে। এগুলো করা ভালো?

— নিশ্চয়ই ভালো। অনেক জায়গাতেই অনেক লোক এখন এরকম মুখোশ নাচ করছে।

মৈরাং বলল — বিষ্ণুপুরে টেরাকোটার কাজ হয়। দিঘায় ঝিনুক দিয়ে মূর্তি গড়ে।

— কোথাও সুন্দর মাদুর হয়। কোথাও বেতের জিনিস হয়। কোথাও সুস্বাদু সরপুরিয়া হয়। এগুলো আঞ্চলিক ঐতিহ্য। এগুলো যেন না হারায়।

বলাবলি করে লেখো

১। তোমার এলাকার যেসব মানুষজন খুব ভালো কাজ করেছেন তাঁদের কথা জেনে লেখো :

তাঁদের নাম ও তাঁরা কী করতেন	কোথায় থাকতেন	কী কী ভালো কাজ করেছিলেন

২। তোমার এলাকায় কী কী বিশেষ সম্পদ তৈরি হয় সে বিষয়ে জেনে লেখো :

বিশেষ সম্পদের নাম	তার বৈশিষ্ট্য	কীভাবে তা তৈরি হয়

কেমন করে সমান ভাগ

বাড়িতে ফিরে ফুলমণি দেখল মৃগেনকাকু এসেছেন। কাকুদের গ্রামে যাওয়ার পথে দেখা মাঠের কথাটা ওর মনে পড়ল। সেটা নিয়েই ফুলমণি গল্প শুরু করল। বন্ধুদের সঙ্গে এসব নিয়ে কত কথা হয়েছে তা কাকুকে বলল। স্যার কী কী বলেছেন সেকথাও বলল।

কাকু সব শুনলেন। তারপর বললে— বনের গাছের পাতা আমাদের অক্সিজেন দেয়। বন আর পাহাড় আছে, তাই সারা রাজ্যে বৃষ্টি হয়। আমরা চাষের জল পাই। পাহাড় থেকে জল গড়িয়ে সমতলে যায়। তাই আমাদের নদী। গরমকালেও চাষ।

ফুলমণি বলল— বন ছাড়াও এদিকেই আছে কয়লা, আরও কত খনিজ পদার্থ! কিন্তু ধান ভালো না হলে মুশকিল। খাবারের অভাব। জলের কষ্ট। এসব কষ্ট না মিটলে অন্য সম্পদ দিয়ে কী হবে?

— ঠিকই বলেছ। বন-পাহাড়ের আর সমতলের সম্পদ সবাইকে ভাগ করে নিতে হবে। এক অঞ্চলের উন্নতিতে অন্য অঞ্চলকে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই সবার মিলিত উন্নতি হবে।

বলাবলি করে লেখো

তোমার এলাকার কী কী সম্পদ অন্য কোথায় যায় বা অন্য এলাকার কী কী সম্পদ তোমার এলাকায় আসে সে বিষয়ে খোঁজ করে লেখো:

তোমার এলাকায় কী কী সম্পদ পাওয়া যায়	ওই সব সম্পদ কোথায় কোথায় যায়	তোমার এলাকায় কী কী পাওয়া যায় না	কোথা থেকে সেসব তোমার অঞ্চলে আসে

আমাদের কৃষিজ সম্পদ : ধান

জুলাইয়ের মাঝামাঝি। কদিন ধরে একটানা বৃষ্টি হচ্ছে। সমীরদের গ্রামে মাঠে মাঠে পাওয়ার টিলারে চাষ হচ্ছে। সমীরের বাবা-কাকা সারাদিন মাঠে ব্যস্ত। পাওয়ার টিলার দিয়ে লোকের জমিতে চাষ করে বেড়াচ্ছেন। দিদি আর সমীর টিফিন কৌটোয় করে ভাত নিয়ে গেল মাঠে।

কোনো জমিতে চাষ হয়ে গেছে। ধান রোয়া হয়ে গেছে। কোথাও আবার পাওয়ার টিলার চলছে।

খানিক পরে বাড়ি ফিরল ওরা। ঠাকুমাকে সামনে পেয়ে সমীর বলল— এবারও ধানকাটার সময় সেই বড়ো মেশিনটা আনবে?

ঠাকুমা হাসতে হাসতে বললেন— এখন তো জমিচষা আর ধান রোয়ার কাজ। ধান হবে, তবে তো কাটা-ঝাড়া?

পরদিন স্কুলেও ওই মেশিনটার কথা উঠল। ছেলেমেয়েরা ধানকাটা মেশিন নিয়ে খুব কথা বলতে লাগল। তাদের কথা শেষ হলে দিদি বললেন— ওটা ধান কাটা-ঝাড়ার খুব আধুনিক যন্ত্র। ওটার নাম হারভেস্টার।

সুবীর নামটা বোঝেনি। তাই আর একবার জানতে চাইল নামটা।

দিদি বললেন— ওটা দিয়ে কী করা হয়?

— ধান কাটা। খড় থেকে ধান আলাদা করা। এক জায়গায় জড়ো করা। সব এক মেশিনে হয়।

— এই কাজগুলোকে এক সঙ্গে ইংরাজিতে বলে হারভেস্টিং। তাই ওই যন্ত্রটার নাম হারভেস্টার।

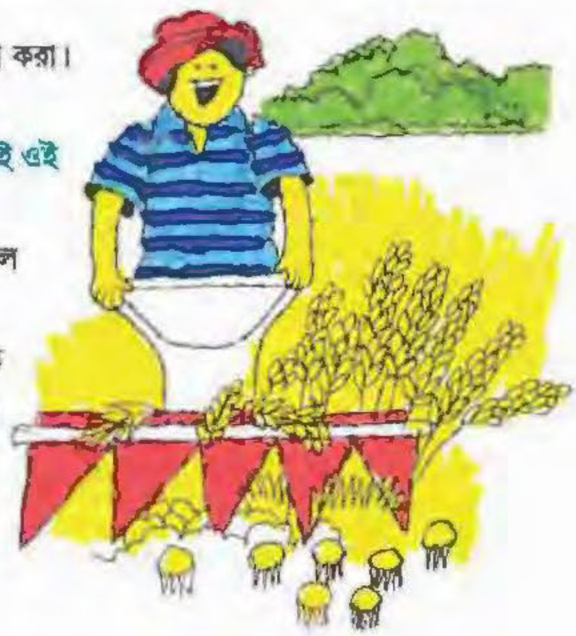

তৃপ্তি বলল— যে চাষ করে তাকে তো ইংরাজিতে টিলার বলে। তাহলে জমিচষার যন্ত্রকে পাওয়ার টিলার বলে কেন?

আকবর বলল— পাওয়ার মানে কী? ক্ষমতা। বেশি তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে যে, তার ক্ষমতা বেশি। পাওয়ার টিলার তাড়াতাড়ি জমি চষে।

দিদি হেসে বললেন— এই তো বেশ বলেছ।

কেয়া বলল— জানেন দিদি, সমীরের ঠাকুমা গাঁয়ে প্রথম পাওয়ার টিলার এনেছিলেন। আবার গত বছর হারভেস্টার আনালেন।

মানুষে টানা লাঙল

দিদি কেয়ার কথাটা বুঝতে পারলেন না। বললেন— তার মানে?

এবার সমীর নিজেই বলল— ঠাকুরদা যখন মারা যান তখন বাবার বয়স আমার মতো। ঠাকুমা ব্যাংক থেকে টাকা ধার নিয়ে পাওয়ার টিলার কিনেছিলেন।

—আর হারভেস্টারের ব্যাপারটা?

— ঠাকুমা বোধহয় কাগজে ওটার ছবি দেখেছিলেন। তারপর মোবাইলে কথা বলে সব ঠিক করলেন। শহর থেকে বাবা ওটা ভাড়া করে আনলেন। গতবার এখানে অনেকের ধান কাটা-ঝাড়া হলো।

—শহর থেকে তো ভাড়া করেই আনলেন। তাতে তোমাদের কী লাভ হলো?

সমীরের আগেই কেয়া উত্তর দিল— আনলেন তো মাসিক ভাড়ায়। এখানে ঘন্টা হিসাবে ভাড়ায় খাটালেন মেশিন। ওর ঠাকুমার খুব বুদ্ধি!

দিদিমণি একটু ভাবলেন। তারপর বললেন— চাষের কাজ কিন্তু মেয়েদের বুদ্ধিতেই শুরু হয়েছিল। পুরুষরা শিকার করত। বনের ফল-পাতা আনতে যেত। ঘর সামলাত মেয়েরা। তার মধ্যেই তারা দেখল কীভাবে বীজ থেকে গাছ হয়। ভাবল, তাহলে গাছ লাগিয়ে যত্ন করে বড়ো করি। তা থেকে খাওয়ার শস্য পাওয়া যাবে।

— তারপর কী হলো?

— সহজে খাবার শস্য পাওয়া গেল। তারপর দেখা গেল ভালো করে মাটি খুঁড়ে চাষ করলে বেশি শস্য হয়। তারপর হলো কাঠের লাঙল। মানুষই চেপে ধরত। অন্য একজন টানত। তারপর এক সময় মানুষ বুঝল যে গোরু, মহিষ, ঘোড়াদের দিয়ে কাজটা করানো যাবে। তাদের খড় খাইয়ে রাখা যাবে। নিজেরা শস্য পাবে।

বলাবলি করে লিখে ফেলো

নানা যুগে চাষের নানা কাজে যন্ত্রপাতি, মানুষ ও পশুর নানারকম ভূমিকা ছিল। এবিষয়ে বড়োদের কাছ থেকে জেনে ও নিজেরা আলোচনা করে লেখো:

কাজ	অনেক কাল আগে	ঠাকুমা-দিদিমাদের যুগে	ইদানীং কালে
মাটি আলগা করা			
মাটি সমান করা			
বীজ বা চারা বোনা			
ঘাস ও আগাছা তোলা			
ফসল তোলা			
ফসল খাবার মতো করা			

সার আর কীটনাশক

কাঠের লাঙল। মানুষই চেপে ধরত। অন্য একজন টানত। অবাক হওয়ার কথা। তবে অবিশ্বাস করল না কেউ। প্রথমেই কী করে গোরুকে কাজে লাগাবে? কোন জন্তু পোষ মানবে তা বুঝতে তো সময় লাগবেই!

ইমরান বলল— আচ্ছা, তখন সার দিত জমিতে? আর পোকা মারার বিষও কি দিত?

দীপা বলল— গোবর সার হয়তো ছিল।

— গোবর দিলে যে ফলন বাড়বে তা কী করে জানবে?

— গোরু দিয়ে লাঙল টানাতে গিয়েই বুঝে থাকবে। হয়তো গোরুরা কোথাও বিশ্রাম নিত। পরে সেখানে চাষ করা হলো। খুব ভালো ফলন হলো। তাতেই লোকে বুঝল গোবর থেকে সার হবে! তবে প্রথমদিকে কোনো সারের ব্যবহারই হতো না।

দিদিকে এসব ভাবনার কথা বলল সবাই মিলে। দিদি বললেন — এমন তো হতেই পারে। তবে অন্য অনেকরকমও হতে পারে। আসলে নানা জায়গায় নানারকম হয়েছিল।

এই কথাটা বুঝতে পারল না কেয়া। বলল— নানা জায়গায় নানারকম মানে?

— ধরো, এটা একটা নদীর ধার। এখানে দু-চারশো লোক থাকে। তারা সবদিকে দুই-তিন কিলোমিটার জায়গার জঙ্গল কেটে চাষ করে। তারপর বন। আর কোথাও মানুষ আছে তা তারা জানে না।

— বুঝেছি। হয়তো কুড়ি-তিরিশ কিলোমিটার বনের পরে আর এক দল মানুষ আছে। তারাও ওই রকম খানিকটা জায়গায় চাষ করে। কিন্তু অন্যরা কী করে তা জানে না।

দীপা বলল— হয়তো একদল মানুষ অনেক কিছু শিখে গেল। অন্যরা কিছুই শিখল না। এমনও তো হতে পারে।

— ঠিক তাই। প্রথম যুগে একই বিষয় নানাভাবে শিখেছে মানুষ। সার, কীটনাশকের ব্যবহারের বিষয়েও কথাটা সত্যি।

— কী কীটনাশক ছিল তখন?

— সেগুলোই তো ফিরে আসছে। আগে কীটনাশক হিসাবে নিমপাতা ব্যবহার করা হতো।

বলাবলি করে লেখো

তোমাদের কাছাকাছি এলাকায় নানা সময়ে চাষের জন্য কী সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হয়েছে তা বড়োদের কাছে জেনে ও নিজেরা আলোচনা করে লেখো :

চাষে ব্যবহৃত	অনেক কাল আগে	ঠাকুমা-দিদিমাদের যুগে	ইদানীং কালে
সার			
কীটনাশক			

চালের দাম চার গুণ

বড়োদের জিজ্ঞেস করে সবাই অনেক কিছু জানল। ৪০-৪৫ বছর আগে এখানে রাসায়নিক সার আর কীটনাশকের ব্যবহার বাড়া শুরু হয়। ২০-২৫ বছর আগে পর্যন্ত তা খুব বাড়ছিল। তারপর আর অত বাড়ছিল না। ইদানীং সেটা হয়তো কমতে শুরু করেছে। এখন নাকি বেশি সার দিয়েও ফলন বাড়ছে না। অনেকেই জৈব সারের দিকে ঝুঁকেছেন। প্রাকৃতিক কীটনাশক খুঁজছেন। শুধু রাসায়নিক সার দিলে ভবিষ্যতে জমি নাকি মোটে ফসল দেবে না। বেশি রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করলে জমির বন্ধু-পোকারাও মরে যাবে। মৌমাছি, প্রজাপতি, রেশমপোকার মতো অর্থকরী পোকারাও হারিয়ে যাবে।

কিন্তু সার আর কীটনাশক ব্যবহার অত বেড়েছিল কেন? তা নিয়ে মতিনের নানি বললেন—১৯৬৬ সাল। আমরা তখন ছোটো। দু-বছরে চালের দাম চার গুণ হয়ে গেল। এক টাকা চার আনা থেকে পাঁচ টাকা। টাকা দিলেও চাল পাওয়া যায় না। যাবে কী করে? ফসল কম। লোক বেশি। বছর কয়েক এমন চলল। এক জায়গার চাল অন্য জায়গায় যাবে না। ভাত নেই। র‍্যাশনের যব-মাইলো আর ভুট্টা খাও। আমাদের কী ভাত না হলে ভালো লাগে!

তারপর নতুন বীজ এল। নতুন নতুন সার। পোকা মারার নতুন নতুন বিষ। ডিপটিউবওয়েল বসল। গরমের সময় ধানচাষ শুরু হলো। ছোটো ছোটো ধান গাছ। তিন-চার মাসে ধান পেকে যায়। ফলনও বেশি। বছরে দুই-তিন বার ধানচাষ হলো। এভাবে চার-পাঁচ বছর চলার পর চালের আকাল কাটল।

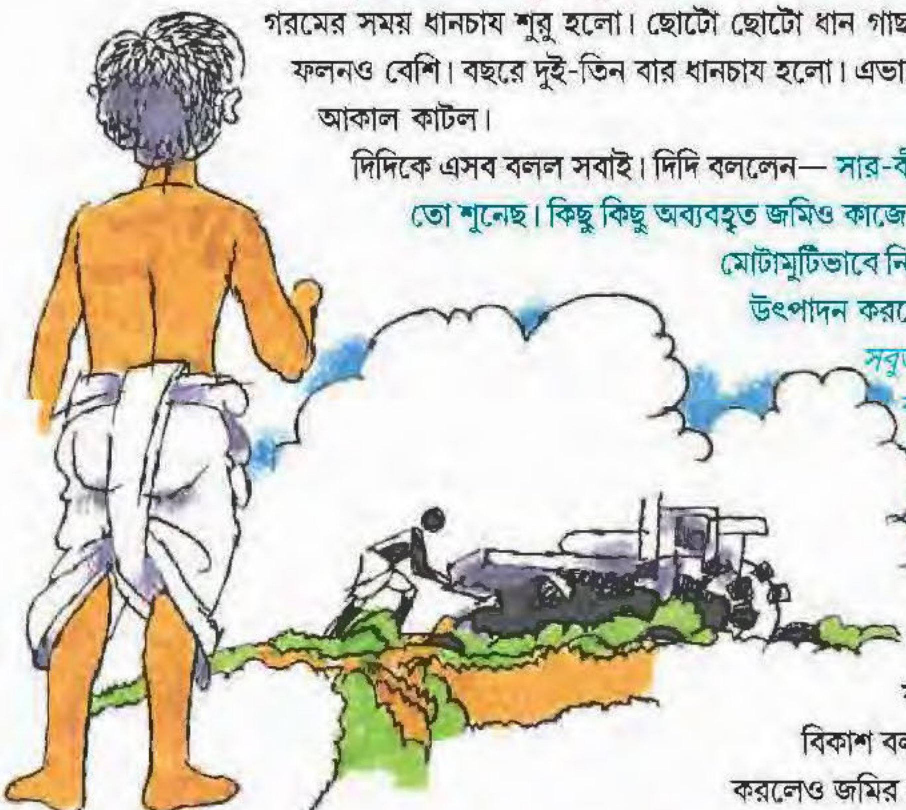

দিদিকে এসব বলল সবাই। দিদি বললেন— সার-কীটনাশক ব্যবহার কীভাবে বাড়ল তা তো শুনেছ। কিছু কিছু অব্যবহৃত জমিও কাজে লাগানো শুরু হলো। এভাবে আমরা মোটামুটিভাবে নিজেদের দরকার মতো খাদ্য নিজেরাই উৎপাদন করতে পারলাম। এই ঘটনাকে ভারতের *সবুজ বিপ্লব* বলা হয়। ১৯৯০ সালের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত খাদ্যের উৎপাদনও বাড়তে থাকে। তারপর তাড়াহুড়ো করে উৎপাদন বাড়ানোর কুফল বোঝা শুরু হয়।

মীনা বলল— বেশি রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা কমে যায়!

বিকাশ বলল— রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করলেও জমির ক্ষতি হয়।

— হ্যাঁ, মাটির নীচের জল তোলার সমস্যাও ফুটে উঠল। অনেক ডিপটিউবওয়েল থেকে জল ওঠা বন্ধ হয়ে গেল।
সাহেব বলল — আমাদের পাড়ায় ডিপটিউবওয়েলটা চলেই না।
— তাই নতুন ভাবনা এল। জৈব সার, অণুজীব সার। জৈব কীটনাশকের ব্যবহার। নানা ধরনের বীজ ব্যবহার। বৃষ্টির জল জমিয়ে রেখে পরে ব্যবহার করা। এভাবে কৃষি উৎপাদন অল্প করে বাড়ালেও ভালো। কারণ তা টেকসই হবে।

বলাবলি করে লেখো

তোমাদের এলাকায় বিভিন্ন ঋতুতে চাষে জলের ব্যবহার নিয়ে কী দেখেছ। আলোচনা করো। তারপর লেখো :

ঋতু	চাষের ফসল	জলের উৎস	জল দেওয়ার ব্যবস্থা

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে

লোহার ফলা লাগানো লাঙল টানত গোরু। এভাবেই চাষ হতো বছর পঞ্চাশ আগে পর্যন্ত। চাষের জল তখন শুধু বৃষ্টি থেকে। বৃষ্টি হতো কমবেশি এখনকার মতোই। বর্ষাকালে ধানচাষ হতো। আনাজ চাষে জল কম লাগে। শীতকালে ডাল, কপি, পেঁয়াজ, আলু ইত্যাদি হতো। গরমের সময়ে ঝিঙে, পটল, ঢ্যাঁড়শ হতো। নদী, খাল, পুকুরে জমে থাকত কিছু জল। ডোঙায় করে সেই জল খেতে দেওয়া হতো। কিছু জমিতে আখ চাষ হতো। চাষে জৈব সার ব্যবহার করা হতো। তবে কীটনাশকের ব্যবহার হতো না বললেই চলে।

দু-রকম ধানচাষ হতো। আউস আর আমন। আউসে একটু কম জল লাগে। আউস ধানের গাছ একটু ছোটো। একটু উঁচু জমিতে আউস ধানের চাষ। তুলনায় নীচু জমিতে আমন ধানের চাষ। আমনের গাছ বড়ো। আমন ধানের মধ্যে কিছু মোটা ধান ছিল। সেগুলোর গাছ খুব লম্বা হতো।

চেরা বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হতো ফাঁকাফাঁকা একটা ধান-ঝাড়ন। ধান সমেত খড় তার উপর পেটানো হতো। তাতে ধান আর খড় আলাদা হতো। এই কাজটাকে বলা হতো ধানঝাড়া।

খড় জড়িয়ে মোটা দড়ি করা যায়। বাঁশের কাঠামোর উপর ওইরকম দড়ি জড়িয়ে ঘর করা যায়। এভাবে তৈরি হতো ধান রাখার গোলা। খড়ের ছাউনি থাকত গোলায়।

বেশিরভাগ জমিতে ধান চাষ একবারই হতো। কিছু ক্ষেত্রে আগে আউস ধান চাষ করে নেওয়া হতো। তারপর আমন ধান চাষও হতো। কিছু জমিতে গ্রীষ্মে পাট চাষ করা হতো। পাট উঠে গেলে তারপর আমন ধান চাষ করা হতো।

পাহাড়ি অঞ্চলে সিঁড়ির মতো জমি তৈরি করে চাষ হতো। ওইভাবে চাষ করাকে বলে ধাপ-চাষ।

তবে ধানের চাষ কম হতো। নানা রকমের শাক-আনাজ, গম, ভুট্টা, আলু হতো। দার্জিলিং-এর উঁচু ও ঢালু জমিতে বন কেটে অনেক চা বাগান গড়ে উঠেছিল।

ঢালু কাঁকুরে মাটিতে বর্ষাকালে আউস ধান হতো। এছাড়া ডাল, ভুট্টা, বাদাম ইত্যাদিরও চাষ হতো।

বলাবলি করে লেখো

বিভিন্ন ঋতুতে তোমার এলাকার কৃষি উৎপাদন বিষয়ে নানা জনের সঙ্গে কথা বলে নিজেরা আলোচনা করে লেখো :

কী জাতীয় উৎপন্ন দ্রব্য	উৎপন্ন দ্রব্যের নাম	কোন ঋতুতে উৎপন্ন হয়
দানাশস্য জাতীয়		
ডাল / আনাজ জাতীয়		
ফুল		
ফল		
অন্যান্য		

ওরে বৃষ্টি দূরে যা

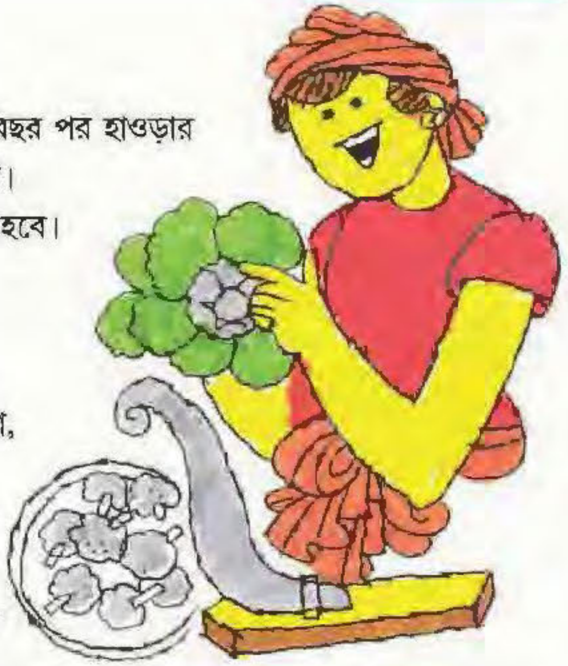

স্বপ্নার কাকা দার্জিলিং জেলার একটা চা বাগানে কাজ করেন। দু-বছর পর হাওড়ার বাড়িতে ফিরেছেন। স্বপ্নারা ঘিরে ধরল, ওখানকার কথা বলতে হবে।

কাকা বললেন— ওখানে খুব বৃষ্টি। সারা বছর মিলে এখানকার দ্বিগুণ হবে। কিন্তু জল দাঁড়ায় না। পাহাড়ের ঢাল তো, জল নেমে যায়।

আব্দুল বলল— চাষ হয় কীভাবে?

আকাশ বলল— ভুলে গেলি? ধাপ-চাষ হয়।

কাকা বললেন— তা ঠিক। তবে ধান খুব বেশি হয় না। গম, ভুট্টা, আলু, আদা, সয়াবিন চাষ হয়।

— ওখানে একরকম লতানো গাছ আছে। ঝিঙে গাছের মতো দেখতে। ফলটা আবার খেতে অনেকটা পেঁপের মতো। তাকে বলে স্কোয়াশ।

— এছাড়া মাঝে মাঝে কমলালেবুর বাগান আছে। আর চা বাগান আছে। চা ওখানকার প্রধান ফসল।

স্কুলে দিদিকে এসব কথা বলল ওরা। দিদি বললেন - ওখানে সারা বছর আবহাওয়াও ঠান্ডা। তাই আমাদের যখন গরম কাল তখন ওখানে শীতের সবজি হয়। ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালং, মুলো সবই ফলে।

স্বপ্না বলল— অত যে বৃষ্টি, জলটা যায় কোথায়?

রফিকুল বলল— মনে নেই? ওই অঞ্চলে তিস্তা আর মহানন্দা আছে। নদী দিয়ে জল নেমে যায় তরাই অঞ্চলে।

বলাবলি করে লেখো

তোমার এলাকায় ফসলের উৎপাদন কিংবা ব্যবহার ত্যাদি নিয়ে বড়োদের কাছে জেনে ও আলোচনা করে লেখো :

কী কী ফসল উৎপন্ন হয়	ফসল কত দামে বিক্রি হয়	ওই ফসল কী ধরনের ব্যবহার হয়	কোন ঋতুতে কোন ফসল বেশি

তরাই আর মালদা-দক্ষিণ দিনাজপুরের কৃষি

ইমরান বুঝল, তিস্তা-মহানন্দার পলি জমে তরাই অঞ্চলের মাটি উর্বর হয়ে গেছে। ভালো ফসল হয়। বলল— কোন কোন ফসলের চাষ বেশি হয়?

— ধান হয় প্রচুর। পাট, গম, বাদাম হয়। নানারকম সবজিও হয়।। আর তরাইয়ের ঢালের দিকে চা হয় প্রচুর।

— চা পর্বতে হয়, আবার তরাইয়েও হয়?

— তরাইয়ের একটা বিরাট অঞ্চল পর্বতের পাদদেশে। সমতল পর্যন্ত ঢালু জমি। সেখানে জল দাঁড়ায় না। খুব গরমও নয়। এই আবহাওয়ায় চা ভালো হয়।

— এখানেই কি চা বেশি ভালো হয়?

আকাশ এবিষয়ে অনেক জানে। বলল— নারে। দার্জিলিং চায়ের স্বাদ-গন্ধ আলাদা। বোধহয় ওখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশে ওই গন্ধ হয়। অনেক দামে নানা দেশে বিক্রি হয়।

— তরাইয়ে ফল কেমন হয়?

— জুলাই মাসে তরাইয়ের আনারস দেখিসনি? তরাই-এর আনারস আর কলা খুব বিখ্যাত।

জিনা বলল— ওখানে বৃষ্টি কেমন?

— উত্তরের পর্বতের চেয়ে কম। তবে দক্ষিণবঙ্গের চেয়ে বেশি। দুয়ের মাঝামাঝি। এই জল নদী দিয়ে দক্ষিণে বয়ে যায়।

— মালদা আর দক্ষিণ দিনাজপুরে এই জলে চাষ হয়?

— কিছু অঞ্চলে হয়। ধান, পাট ছাড়াও আখ হয়। শাক-সবজি, আম, লিচুও ফলে। ফজলি আমের কথা তো জানোই।

— ওই অঞ্চলেই তো রেশম কীট পালনের জন্য তুঁত গাছের চাষ হয়, তাই না?

— এই অঞ্চলেই। অনেক তুঁত ঝোপ আছে। তুঁত গাছ লাগানোও হয়। এটা এখানকার অনুর্বর অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ চাষ।

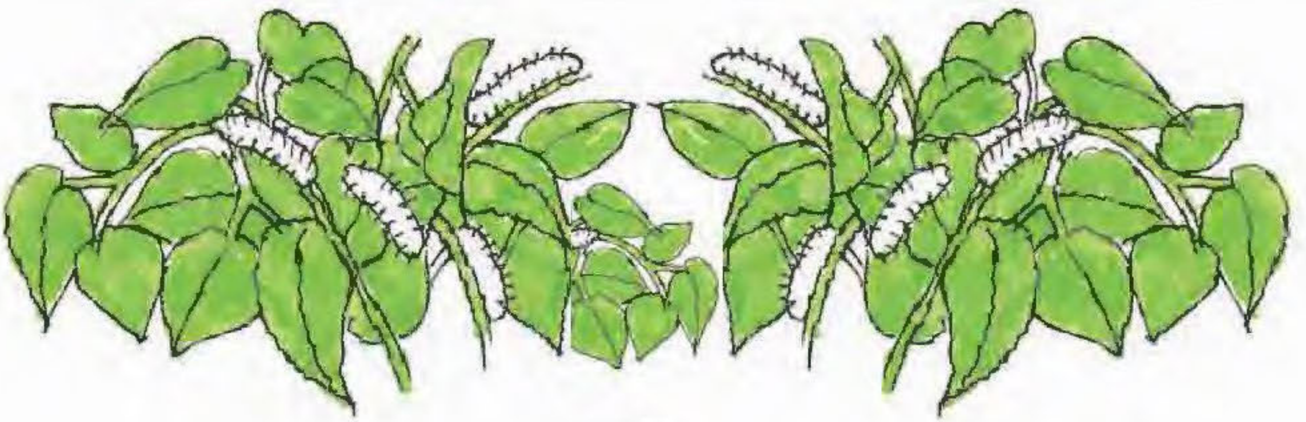

বলাবলি করে লেখো

তোমাদের কাছাকাছি অঞ্চলে অনুর্বর জমিতে কী কী চাষ হয়? নীচে লেখো :

জায়গার নাম ইত্যাদি	কী চাষ করা দেখেছ	গাছগুলো কেমন (বড়ো/ছোটো/লতানো)	কত দিন পরে ফসল হয়েছে

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ আর রাঢ় অঞ্চলের কৃষি

ইছামতির পাশে অশেষদের বাড়ি। আবার রূপনারায়ণের কাছে তার মামার বাড়ি। অশেষ ভাগিরথীর দু-দিকের কৃষির কথাই অনেকটা জানে। ক্লাসে সে বলল — দু-দিকেই বৃষ্টি প্রায় সমান। পুবদিকের পুরোটা একেবারে সমতল। পশ্চিমদিকেরও, দামোদরের কাছের অঞ্চলটা পুরো সমতলই।

আসিফ বলল— ওদিকেই তো খুব আলু হয়?

— হ্যাঁ। শীতকালে যাবি। দামোদরের দুই পাশের জমিতে আলু আর আলু। যেদিকে তাকাবি ছোটো ছোটো সবুজ আলু গাছ। চোখ জুড়িয়ে যাবে।

আকাশ বলল— উত্তরে চা বাগানগুলো ওইরকম। ছোটো ছোটো সবুজ চা গাছ।

এর মধ্যে দিদি এসেছেন। ওরা কেউ দেখেনি। দিদি হাসতে হাসতে বললেন— আলু গাছ চা গাছের চেয়েও ছোটো। আর আলু হয় মাটির নীচে। আলুর পাতা দিয়ে জমির সার হয়। চায়ের মতো কিছু হয় না।

অশেষ বলল— আলু খেতের পাশে পাশে সাথি ফসল সরষে। সরষের হলুদ ফুল। হলুদ মালায় ঘেরা সবুজ খেত।

তিয়ান বলল— ধানের কথা বললি না তো?

অশেষ বলল— এই দুই অঞ্চলেই খুব ধান হয়। আমন ধানের চাষ এখন খুব কম হয়। উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ বেশি।

— দুর্গাপুরের পূর্ব থেকেই বর্ধমান জেলার মাটি ধানের পক্ষে খুব ভালো।

— কিন্তু হুগলির পশ্চিম দিকে আর হাওড়ার পূর্ব দিকটায় খুব বন্যা হয়। ডিভিসি জল ছাড়ে। অনেক জায়গায় বর্ষায় ধান নষ্ট হয়ে যায়।

— ডিভিসি-র পুরো কথাটার মানে জানো? ডি ভি সি-র পুরো কথাটার মানে হলো দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন। বন্যা বন্ধ করার জন্যই ডিভিসি করা হয়েছিল। ঠিক ছিল,পাহাড় থেকে দামোদর নদী দিয়ে গড়িয়ে আসা বর্ষার জল জমিয়ে রাখা হবে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তের কাছেই অনেকগুলো জলাধার করা হবে। সেখানে জল আটকে রাখা হবে। তাতে বন্যা হতে পারবে না। পরে সেই জল অল্প অল্প করে ছাড়া হবে। তাতে এই অঞ্চল সারা বছর চাষ করার জল পাবে।

— কিন্তু তাতে তো বন্যা বন্দ হয়নি। ডিভিসি জল ছাড়ে। আর ২৪ ঘন্টার মধ্যে সেই জল চলে আসে। খুব বন্যা হয়।

— যতগুলো জলাধার করার কথা ছিল, ততগুলো করা সম্ভব হয়নি। তাই বর্ষার জল পুরোটা আটকে রাখা যায় না। ফলে বর্ষাকালেই অনেক জল ছাড়তে হয়। বন্যা হয়। পরেও চাষের জন্য যথেষ্ট জল পাওয়া যায় না।

ফসল মানচিত্র

সবিতা জানতে চাইল— এইসব অঞ্চলে শাকসবজি চাষ কেমন হয়?

অশেষ বলল— হয় দু-দিকেই। তবে কিছুটা কম-বেশি আছে। গঙ্গার পুব দিকে সব জায়গাতেই অনেক সবজি চাষ। পশ্চিম দিকেও কয়েক কিলোমিটার খুব সবজি চাষ হয়। দামোদর আর মুণ্ডেশ্বরীর দু-পাশেও প্রচুর সবজি হয়। সরষে ও তিল চাষও হয়। তবে ওদিকটায় নদী থেকে দূরে গেলে সবজি চাষ একটু কম।

— সবজি খেতগুলো দেখতেও খুব সুন্দর হয়।

— পাশাপাশি অনেকরকম থাকে তো। ঝিঙে-পটল-বেগুন-ঢ্যাঁড়শ থাকে। নানা রঙের ফুল। ধান-পাটও থাকে। দেখতে

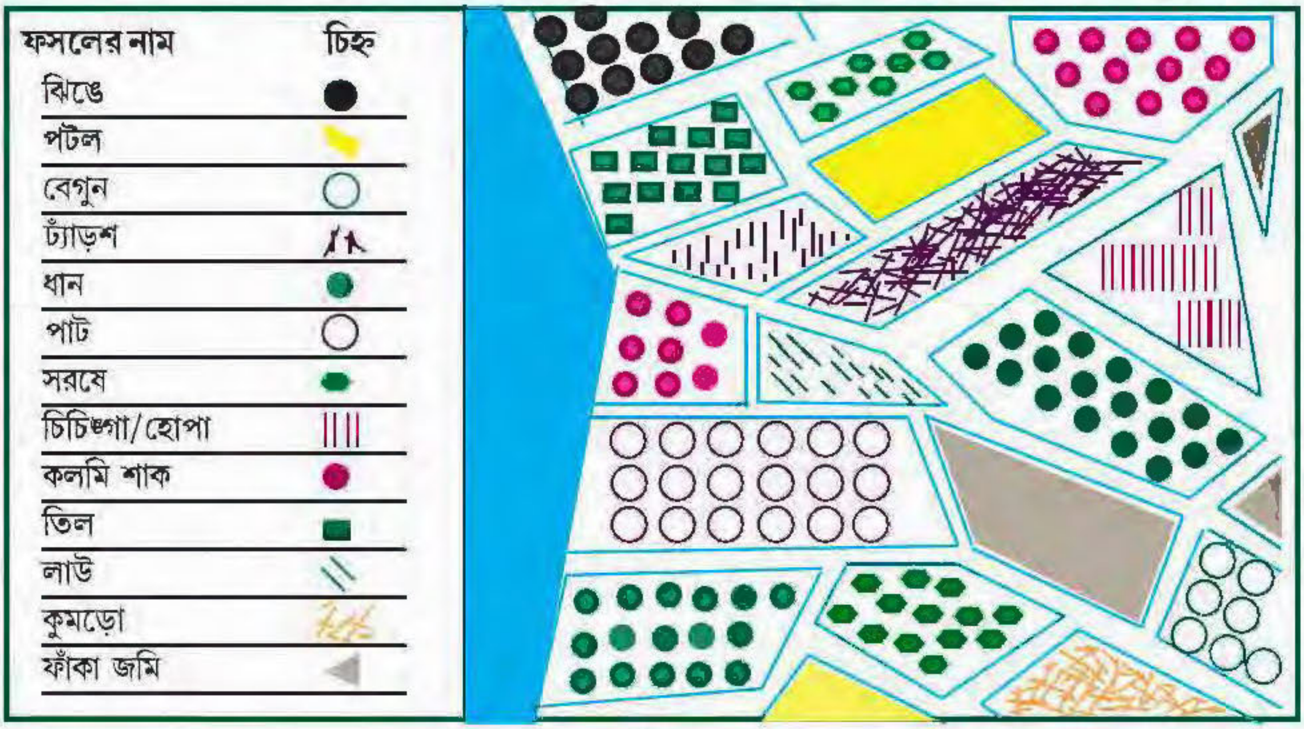

সুন্দর লাগে। আমাদের বাড়ির পিছনে তো চাষের খেত। একদিন গুনে দেখি বারোরকম জিনিসের চাষ হয়েছে। আমি খেতটার একটা মানচিত্রও এঁকেছি। সেটাই এখন দেখ। একদিন যাবি। ওই খেতটা দেখে আসবি।

এবারে অশেষ ওদের বাড়ির পিছনের খেতের ফসলের মানচিত্র দেখাল।

তারপর বলল — অনেকজনের জমি। যার যা খুশি চাষ করেন।

— শীতকালেও অনেক সবজি চাষ হয়?

— সে তো হবেই। খেতের কিছু গাছ সারা বছরের। যেমন পেঁপে। সেগুলো রয়ে যায়। অন্যগুলো তো পাঁচ-ছ-মাসের গাছ। সেগুলো মরে গেলে আবার শীতকালের শাক-সবজি লাগানো হয়।

তোমাদের কাছাকাছি অঞ্চলের একটা খেতের শীতকালের ফসল মানচিত্র আঁকো:

পানের চাষ, ফুলের চাষ

ইতু জানতে চাইল— এইসব অঞ্চলে ফল হয়? ফলের বাগান আছে?

দিদিমণি বললেন— পশ্চিম দিকটায় একটু কম হয়। তবে দু-দিকেই এখন অনেক জায়গায় ফলের বাগান হয়েছে। আমবাগান, কলাবাগান। কোথাও আবার একই বাগানে আম, লিচু, বাতাবি, কাঁঠাল সব গাছ হয়।

অশেষ বলল — গঙ্গার পূর্ব দিকের মতো আমবাগান পশ্চিম দিকে দেখিনি।

— ঠিকই বলেছ। মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর-চব্বিশ পরগনার মতো আমবাগান অন্যত্র নেই।

— ফুটি, তরমুজ হয়? পান, সুপারি, নারকেল?

— সব জায়গায় হয়। বেশি পলির উপর বেশি ভালো হয়। দক্ষিণের দিকে নারকেল, সুপারি বেশি হয়।

— নানারকম ফুল?

— অনেক জায়গায় হয়। তবে শহরে তো ফুলের বাজার। তাই শহরের কাছাকাছি অঞ্চলে ফুলের চাষ বেশি হয়।

বলাবলি করে লেখো

কী কী চাষ করা দেখেছ? সে বিষয়ে লেখো :

জায়গার নাম	ফসল/ফুল/ফলের নাম	গাছগুলো কত উঁচু হয়	গাছ লাগানোর কতদিন পরে ফসল/ফুল/ফল হয়	কী কী সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হয়েছে

পশ্চিমের পাহাড়ি লালমাটির কৃষি

দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম সীমা বরাবর কাঁকুরে লালমাটির অঞ্চল। এখানে বৃষ্টি কম হয়। বৃষ্টির জল গড়িয়ে পূর্ব-দক্ষিণে চলেও যায়।

মটর, অড়হর, মুসুর, বিউলি, বরবটি, সিম ইত্যাদি চাষে জল কম লাগে। ভুট্টার মতো শস্য ও বাদাম চাষেও তাই। এখানে প্রধানত ওইসবের চাষ হয়। তাছাড়া আতা, মুসাম্বি লেবু, আম, বেল ইত্যাদি ফল ভালো হয়। শাক-সবজি চাষও হয়।

আগে ধান চাষ হতো খুব কম। আজকাল ধান চাষ কিছুটা বেড়েছে। মানুষ উঁচু জায়গার মাটি কেটে ঢালের দিকে ফেলছে। এভাবে ছোটো ছোটো চাষের জমি হচ্ছে। তারপর চারপাশে আল দিলে বর্ষার জল আটকে যাচ্ছে। ওই জমিতে বর্ষাকালে উচ্চ-ফলনশীল ধান চাষ হচ্ছে।

ক্লাসে এসে দিদিমণি নিজেই এসব বলে দিলেন। শুনে আকাশ বলল— উত্তরের পর্বতেও এইভাবে চাষের জমি বানায়।

দিদিমণি বললেন— হ্যাঁ। পদ্ধতিটা একই। তবে সেখানে ভূমির ঢাল অনেক বেশি। তাই চাষের জমিগুলো আরও ছোটো হয়। সেখানে বৃষ্টি অনেক বেশি হয়। তবে দু-জায়গাতেই চাষ করতে অনেক সার লাগে।

বলাবলি করে লেখো

ধান, মটর, অড়হর, বরবটি, সিম, ভুট্টা, বাদাম, আতা, বেল— এগুলোর কোন অংশ আমরা খাই? খাদ্য অংশগুলোর নাম লেখো। খাতায় তাদের ছবি আঁকো। গাছের বাকি অংশের কী ব্যবহার হয় তা লেখো :

গাছের নাম	খাদ্য অংশের নাম ও ছবি	গাছের বাকি অংশের ব্যবহার	গাছের নাম	খাদ্য অংশের নাম ও ছবি	গাছের বাকি অংশের ব্যবহার

দক্ষিণের নোনা জমির কৃষি ও মাছ চাষ

সমুদ্রের খুব কাছের মাটিতে নুন বেশি। কৃষির পক্ষে ভালো নয়। এই অঞ্চলের কথা আবির অনেক জানে। সে বলল — এই অঞ্চলে কিন্তু বেশ বৃষ্টি হয়।পাশের সমতল অঞ্চলের চেয়েও একটু বেশি। ধান চাষও হয়।

স্যার বললেন— আগে দেশি আমন ধান চাষ হতো। মোটা ধান, লম্বা খড়। জমিতে জল জমে থাকলে এই ধরনের ধান চাষ করার সুবিধা হয়। তবে এই ধানের বিঘা প্রতি ফলন একটু কম। এখন কয়েকটা উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ বেশি হয়।

আবির বলল —এদিকে খুব নারকেল হয়। অন্য ফলের গাছও আছে। সবেদা হয়। বারুইপুরের পেয়ারা বিখ্যাত।

— তরমুজ আর পানও বিখ্যাত। এই অঞ্চলে লঙ্কা, সূর্যমুখী, ভুট্টা, খেসারি —এসবের চাষও হয়। শাক-সবজি যথেষ্টই হয়। দিঘার দিকটায় খুব কাজুবাদাম চাষ হয়।

ফতেমা বলল— এখানকার অনেক লোক জমিতে চাষ করেন না। ভেড়ি করেন। ভেড়িতে জল আটকে মাছ চাষ করেন।

আবির বলল— ভেড়ির মাছ খেতে ভালো। পারসে, ট্যাংরা, ভেটকি, পাবদা — নানারকম মাছ। বাগদা, গলদা– কতরকম চিংড়ি! রুই, মৃগেল, কাতলা, সরপুঁটিও হয়।

— এই অঞ্চলের বহু মানুষ সমুদ্রেও মাছ ধরেন। নৌকা করে সমুদ্রে চলে যান। মাছ ধরতে যাওয়ার ট্রলারও আছে। সার্ডিন, ইলিশ, নানারকম চাঁদা, ভোলা, লোটে – এইসব মাছ ধরেন।

তৃষার মামার বাড়ি হলদিয়ার কাছে। সে বলল – হলদিয়া, দিঘাতেও অনেকে সমুদ্রে মাছ ধরতে যান।

— ঠিক বলেছ। ওগুলোও বঙ্গোপসাগরের উপকূল। উপকূলের সব জায়গা থেকেই মানুষ সমুদ্রে মাছ ধরতে যান।

এসো মাছ দেখি, চিনি আর লিখি :

চিতল

শিঙি

ন্যাদোশ

বাঙ্গোশ

চেলা

অনেকরকম মাছ

অ্যালিসরা বাজার থেকে মাছ কেনে। ও ভাবত সব মাছ বুঝি পুকুরের। তাই ভেড়ির মাছের কথায় অবাক হয়ে গেল। বলল— মাছ তো পুকুরে হয়!

বুবি বলল—পুকুরে তো হয়ই। নদীতে, খাল, বিলে, এমনকি নালা-নর্দমাতেও মাছ হয়। ধান খেতে জল জমে। সেখানেও মাছ হয়। মামার বাড়ি গিয়েছিলাম। প্রবল বৃষ্টির পর দেখি পুকুরে পাশের মাঠ থেকে হু হু করে জল ঢুকছে। স্রোতের উলটো দিকে সাঁতরে মাছ চলে যাচ্ছে। দাদু বললেন, ওরা মাঠে চলে যাবে। আর ফিরতে পারবে না। হয় কেউ ধরে খাবে। নয় মরে যাবে।

স্যার বললেন— দাদু আর কিছু বলেননি?

— বললেন, রাসায়নিক সার আর কীটনাশক ব্যবহার শুরু হওয়ার আগে এভাবে ধানখেত মাছে ভরে যেত। মৌরলা, পুঁটি, রুই, মৃগেল, কই, পাঁকাল, শিঙি, মাগুর, খলসে, ফলুই সবই চলে যেত। তবে বেশিদিন বেঁচে থাকত কই, চ্যাং, শিঙি, মাগুর, শোল, শালগুলো। ধানখেতেই তাদের বাচ্চারা বাড়ত। বাচ্চাগুলো খাওয়ার জন্য কোলাব্যাং, জলঢোঁড়া সাপ আসত। বৃষ্টি বেশি হলে ধান কাটার সময়ও জলকাদা থাকত। জিওল মাছ পাওয়া যেত।

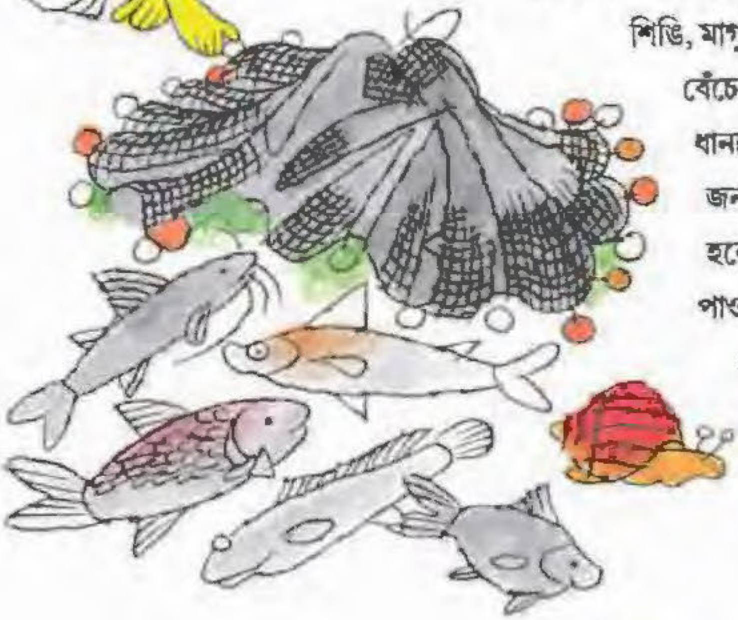

— তুমি তো অনেক মাছের নাম বললে! ওসব মাছ চেনো?

— চ্যাং আর শাল দেখিনি। দাদু বলেছে, চ্যাং মাছ লেজে ভর দিয়ে খানিকটা লাফাতে পারে।

বলাবলি করে লেখো

তোমার এলাকার মাছ সম্পর্কে লেখো :

যে মাছগুলো চেনা তাদের নাম	যে মাছগুলো খেয়েছ তাদের নাম	আর যে যে মাছ দেখেছ তাদের নাম

আরও অনেকরকম মাছ

অ্যালিস তিনরকম মাছের কথা জানত। ইলিশ, মাগুর আর পোনা। সে বলল - স্যার এতরকম মাছ হয়?

স্যার বললেন— তুমি তো অনেক মাছ খেয়েছ। রোজ কি খেতে একইরকম লাগে?

— তা হয় না। কোনোটায় কাঁটা বেশি। কোনোটায় একটু অন্যরকম গন্ধ। কোনোটা খুব নরম।

— তার মানে কী? কেউ বলতে পারো?

রুবি বলল — কোনোদিন মৃগেল খায়। কোনোদিন কাতলা বা রুই। আবার কোনোদিন কালবোশ বা গুড়জালি।

— বাঃ! দাদুর কাছে অনেক শিখেছ তো!

এবার অ্যালিস বলল - স্যার, এখন থেকে মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে বাজারে যাব। তারপর কবে কী মাছ খাচ্ছি তা লিখব! এভাবে শিখে নেব।

রুবি বলল — কিন্তু সরপুঁটি হয়তো আর খেতে পাবি না।

— এমন কথা কেন বলছ?

— সরপুঁটি তো খুব কমে গেছে। বাবা বলে, মাসে এক-দু-দিন পাওয়া যায়।

— ঠিকই। সরপুঁটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে।

— বাবা বলছিল, আগে ন্যাদোশ, খরশুলা মাছ খুব পাওয়া যেত।

— এগুলো সবই খুব কমে গেছে। তোমরা যখন আমাদের মতো বড়ো হবে, তখন হয়তো আর মোটে থাকবে না।

মনসুর বলল — কীভাবে এইসব মাছ টিকিয়ে রাখা যায়!

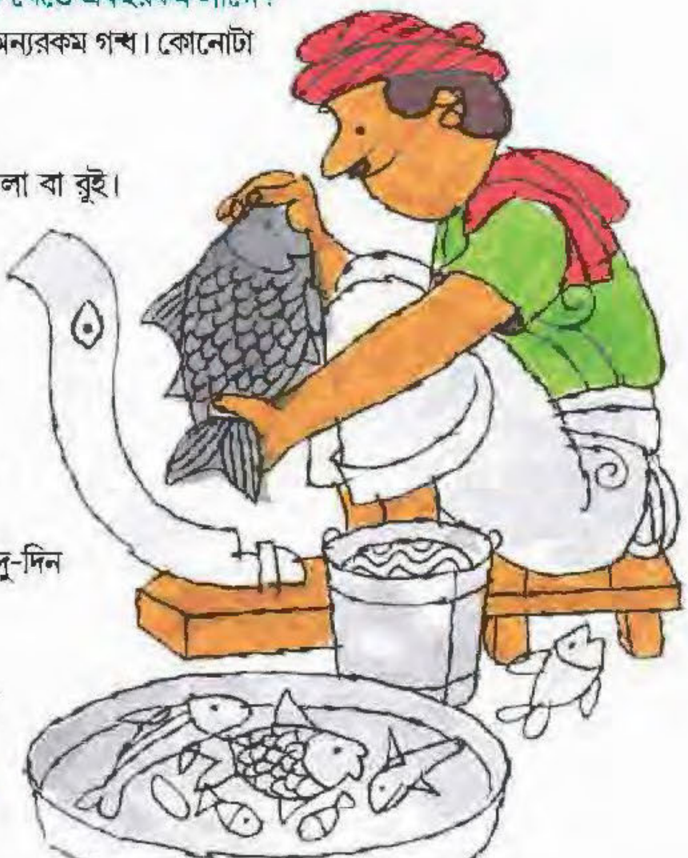

বলাবলি করে লেখো

কোন কোন মাছ আগে অনেক পাওয়া যেত, কিন্তু এখন খুব কমে গেছে। বাড়ি বা পাড়া বা মাছের বাজারে বয়স্কদের কাছে খোঁজ নাও। তারপর নিজেরা আলোচনা করো। তারপর লেখো।

খোঁজ নেওয়ার তারিখ	কোথায় খোঁজ নিয়েছ	কাদের কাছে খোঁজ নিয়েছ (নাম/সম্পর্ক)	বর্তমানে কমে যাওয়া মাছের নাম ও বর্ণনা (ছোটো/বড়ো/আঁশহীন মাছ ইত্যাদি)	কত সাল থেকে খুব কমে গেছে

লুপ্তপ্রায় মাছ

সবাই বুঝল, খলসে, ন্যাদোশ, শোল, বোয়াল, কই-এর মতো মাছের কিছু প্রজাতি সংখ্যায় খুব কমে গেছে। সেসব মাছ হয়তো ভবিষ্যতে আর দেখাই যাবে না। স্বাদ জানা তো দূরের কথা!

দিদি বললেন — এগুলো লুপ্তপ্রায় মাছ। এদের ধরা বন্ধ করাই উচিত।

কিন্তু তার জন্য কী করা যায়? বাবররা ভাবল, প্রথমে সেসব মাছের একটা তালিকা করতে হবে। কোন মাছ কোথায় জন্মায় তা জানতে পারলে আরো ভালো। তারপর পঞ্চায়েতের প্রধানকে সব বলতে হবে। ওঁরা সেখানে একটা করে নিষেধাজ্ঞা বোর্ড ঝুলিয়ে দেবেন।

তর্পণ বলল— সমস্যা আছে। টাকা দিয়ে একজন পুকুর জমা নিল। রুই, কাতলা ধরনের মাছের খুব ছোটো পোনা ফেলল। সারা বছর মাছদের খাবার দিল। তারপর জাল ফেলে রুই কাতলার সঙ্গে পেল দশটা ন্যাদোশ। সেগুলোরই দাম বেশি। সে মাছগুলো না ধরে জলে ছেড়ে দেবে? খুব জটিল সমস্যা। সবাই ভাবতে লাগল। খানিক পরে বাবর বলল— অন্তত অর্ধেক ছাড়বে, এমন নিয়ম হোক।

অ্যালিস বলল — ছোটোগুলো ছাড়বে। ছোটোগুলোর তো ওজন কম।

তর্পণ বলল — এটা হতে পারে। বাচ্চা ন্যাদোশ হাটে-বাজারে কেনা-বেচা করা চলবে না। করলেই জরিমানা!

স্যার ক্লাসে আসার পর কর্মা সব কথা বলল। স্যার বললেন— এভাবে আলোচনা করো। সমাধান বেরিয়ে যাবে। তোমাদেরই

বাড়ির বড়োরা পুকুর জমা নেন। মাছ চাষ করেন। তোমরা যেটা ন্যায্য ভাববে সেটা তাঁদের বলবে।
সোনাই বলল— মাছের কোন কোন প্রজাতি লুপ্তপ্রায় সেটা আগে জানতে হবে।

বলাবলি করে লেখো

তোমার এলাকায় মাছের প্রজাতি সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে লেখো :

একদমই দেখা যায় না এমন মাছের নাম	সংখ্যা খুব কমে গেছে এমন মাছের নাম	সারা বছর পাওয়া যায় না এমন মাছের নাম	সারা বছর পাওয়া যায় এমন মাছের নাম	আগে পাওয়া যেত না কিন্তু এখন পাওয়া যায় এমন মাছের নাম

লুপ্তপ্রায় মাছ বাঁচাও

স্কুল থেকে ফিরছিল মীরাতুন। পথে এহিয়াচাচার সঙ্গে দেখা। চাচা অনেক পুকুরে মাছ চাষ করেন। মীরাতুন লুপ্তপ্রায় মাছের কথা বলল। তাদের বাঁচানোর জন্য কী করার কথা ভাবছে তাও বলল। সব শুনে চাচা বললেন — তাহলে তো আমাদের চাষের মাছের মুশকিল। শোল, শাল আর বোয়াল সব রুই-কাতলার পোনা খেয়ে শেষ করবে।

মীরাতুন বলল — তাই? তাহলে মৌরলাগুলো বাঁচাও। বড়ো ফাঁদির জাল ব্যবহার করে মাছ ধরো। মৌরলাগুলো যাতে ধরা না পড়ে।

— তা করা যায় কিনা ভাবতে হবে। মৌরলারও বাজারে দর অনেক।

মীরাতুন বুঝল লুপ্তপ্রায় মাছ বাঁচানোর সমস্যা অনেক!

পরদিন স্কুলে এসব কথা বলল। সবাই খুব চিন্তায় পড়ল। রতনদের মাছের চাষ আছে। সে মাছেদের কথা অনেক জানে। সে বলল — জলের মধ্যে গাছ থাকলে সেখানে কই, খলসে, ন্যাদোশ থাকে। বেলে, মাগুর, শিঙিদেরও সেখানে

রাখা যায়। এদের জন্য আলাদা পুকুর রাখতে হবে। সেখানে মাছ চাষ করা যাবে না।

মীরাতুন বলল — পুকুরের মালিকরা কি তা শুনবেন?

রতন বলল — যাঁর একটাই পুকুর তিনি হয়তো শুনবেন না। কিন্তু আমাদের অসুবিধে হবে না। আমাদের ছ-টা পুকুর। দাদু তো একটায় চাষ করেন না, দেশি মাছ হবে বলে।

— পঞ্চায়েত একটা-দুটো পুকুরে এভাবে দেশি মাছ সংরক্ষণ করতে পারে।

স্যার বললেন — তোমরা খুব ভেবেছ ব্যাপারটা। জলের পরিবেশ ঠিক রাখতে গেলে সব মাছকেই বাঁচানো দরকার। নইলে খাদ্যশৃঙ্খলটাই ভেঙে পড়বে।

বলাবলি করে লেখো

লুপ্তপ্রায় মাছ বাঁচানোর জন্য কে কী করতে পারেন আলোচনা করে লেখো :

যাঁরা মাছ চাষ করেন	
যাঁরা মাছ কেনেন	
পঞ্চায়েত ও পৌরসভা	
অন্যান্যরা	

মাছধরা

বড়ো ফাঁদির জাল কথাটা অ্যালিস বুঝতে পারেনি। ফেরার সময় মীরাতুনের কাছে বুঝে নিল। ফাঁদি মানে জালের সুতো দিয়ে তৈরি একটা খোপ। তারপর বলল— আচ্ছা, জাল কতরকম?

রতন বলল— জাল অনেকরকম। পুরো পুকুর ঘিরে ফেলার জাল। সব মাছ ধরতে গেলে লাগে। মাছ ঠিকঠাক বাড়ছে কিনা তা দেখতেও লাগে।

পরের দিন ক্লাসে কে কতরকম জাল দেখেছে সেই গল্প বলতে লাগল। স্যার বললেন—একই জালের কিন্তু নানা জায়গায় নানারকম নাম আছে। জাল ছাড়া আর কী দিয়ে মাছ ধরে? বাঁশের শলা দিয়ে তৈরি কিছু দেখোনি? স্রোতের মুখে পেতে রাখে।

আয়ুব বলল— বাক্সের মতো। মাছ ঢুকতে

পারে, বেরোতে পারে না। আমরা বলি ঘুনি।

বুবি বলল — এছাড়া পোলো আছে। মাছের চারপাশ ঘিরে ফেলতে হয়। তারপর হাত ঢুকিয়ে ধরতে হয়।

উৎপল বলল— আমার ঠাকুরদার আবার ছিপ দিয়ে মাছধরার নেশা।

— হ্যাঁ। মাছধরার নানারকম ব্যবস্থা করেছে মানুষ। কিছু কিছু অনেক আগে বানিয়েছে। কৃষিকাজ শেখার আগে থেকে মানুষ মাছ ধরছে। বয়স্কদের সঙ্গে কথা বললে মাছধরার আরও অনেক কায়দা-কৌশল জানতে পারবে।

সবাই শুনল। আর ভাবতে লাগল। একটু পরে বিশ্বজিৎ বলল — স্যার, লুপ্তপ্রায় মাছ ধরতে দেওয়া ঠিক নয়।

আয়ুব বলল— অন্য লুপ্তপ্রায় প্রাণী শিকার করা নিষেধ। লুপ্তপ্রায় মাছ শিকারও নিষেধ করা উচিত।

— এটা তোমার মতামত। সবাই মিলে আলোচনা করো। তোমাদের সবার মিলিত মতই হবে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মত।

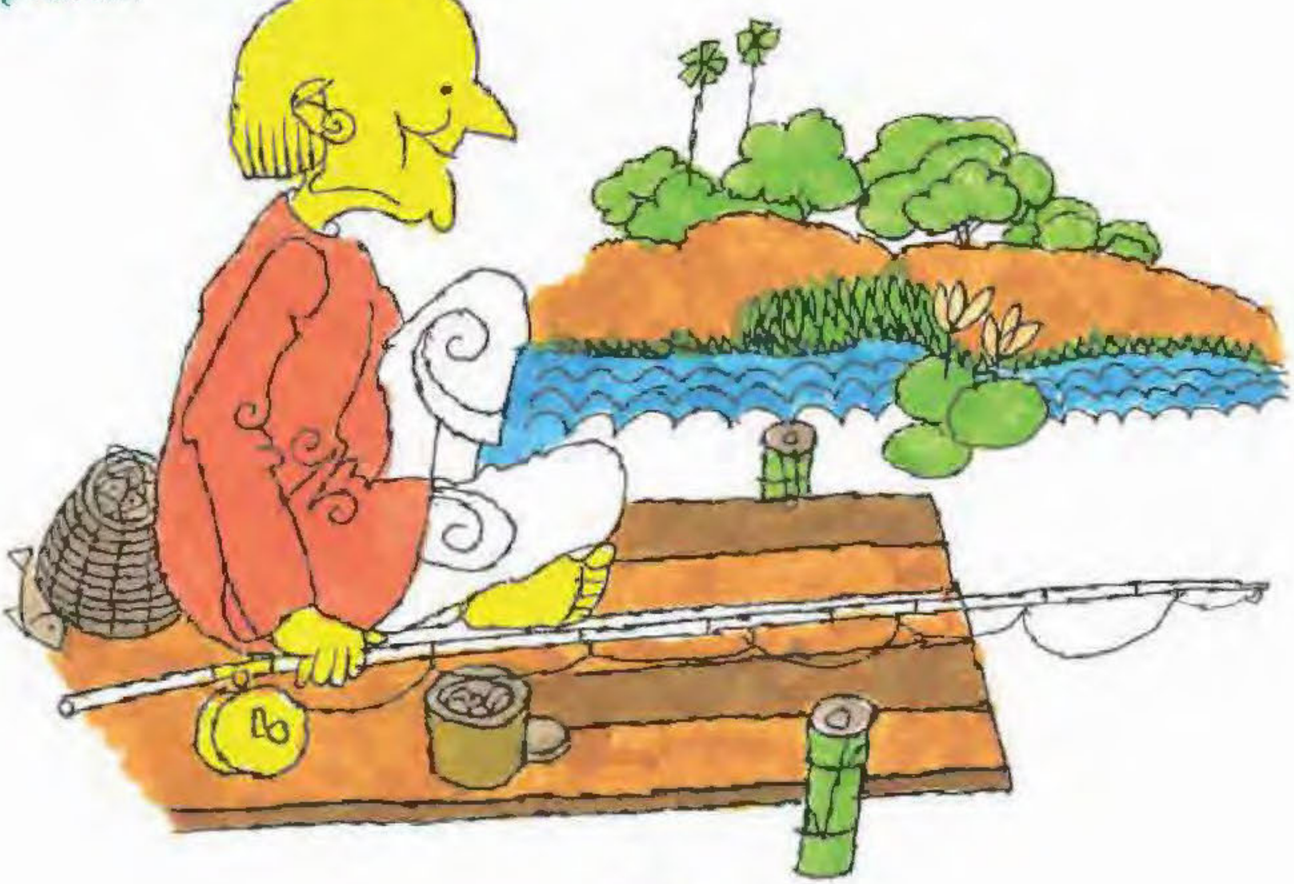

বলাবলি করে লেখো

কী কী জালের কথা জেনেছ? বাঁশের শলা দিয়ে তৈরি কীসের কথা জেনেছ? নাম লেখো। ছবি আঁকো:

নাম	ছবি	নাম	ছবি

'বনে থাকে বাঘ'

সত্যিই থাকে তো বাঘ? আর কে থাকে? আর কী থাকে?

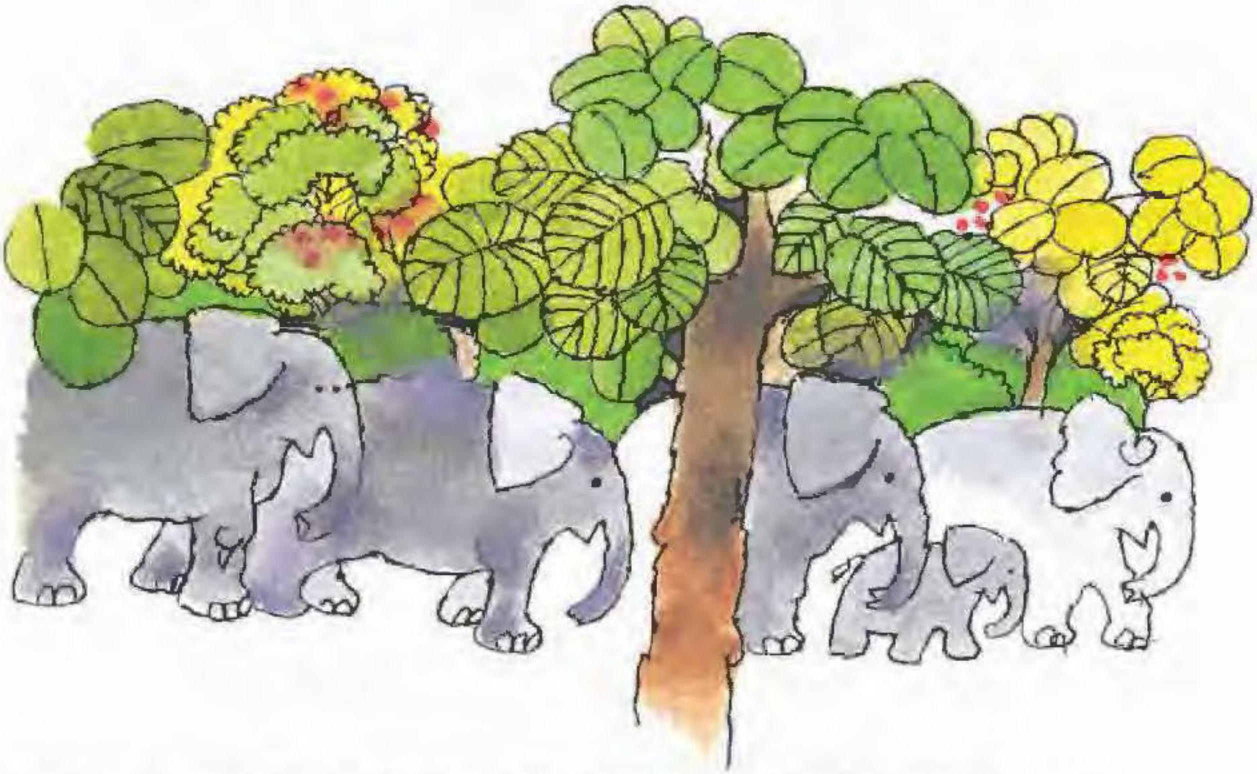

সুধন বলল— বনে বাঘ নেই তো! বনে থাকে হাতি। মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে আমাদের ঘর-বাড়ি খেত নষ্ট করে দেয়। থাকে মৌমাছির দল। শিয়াল, খরগোশ। শাল, সেগুন, রাধাচূড়া, পলাশ, ইউক্যালিপটাস আরও কত গাছ।

ছবি বলল— কোথায় বাঘ? বনে তো পাইন গাছের সারি। আর ওক, ফার, বার্চ ও রডোডেনড্রন গাছ। ফার্ন আর নানারকম ঝোপঝাড়। প্রজাপতি আর ঝরনা। চিতাবাঘ, কালো ভালুক, লাল পান্ডা ঘোরে।

মালতি বলল — বাঘ তো আছেই। মাঝে মাঝে বাড়ি ঘরে হানা দেয়। আর আছে সাপেরা। বুনোশুয়োর, বাঁদর, হরিণ, মেছোবিড়াল, ভোঁদড়ও আছে অনেক। আছে সুন্দরী, গরান, হেতাল গাছেরা। আর দু-পা যেতে নদী আর জলা। কুমির, কামটের ভয়ও আছে।

আক্রম বলল— আছে বাঘ। হাতি, বাইসন, একশৃঙ্গ গন্ডার, চিতাবাঘ। চাঁপ, চিলোনি, লালি কতরকম গাছ।

বিশু বলল--- বনে হরিণ আছে, বাঘ কোথায়? কাঠবিড়ালি, শিয়াল, বনবিড়াল, গিরগিটি আছে। আর অনেক গাছ। শাল, সেগুন, অর্জুন, হরিতকি, আম, লিচু।

সবার কথা শুনে ক্লাসের সকলেই বুঝল, গাছ সব বনেই আছে। জীবজন্তু সব বনেই আছে। তবে সব বনে একরকম গাছ নেই। নানা বনে জীবজন্তুও আলাদা।

দিদি বললেন— শুনলে তো, বনে কী কী থাকে! বাগানে যেসব গাছ থাকে সেগুলোও বনে থাকে। বনে মাঝে মাঝে জলাভূমিও থাকে। বনে গেলে শোনা যায় নানারকম পোকা, পশুপাখিদের ডাক। এসব নিয়েই বন।

বলাবলি করে লেখো

তোমার কাছাকাছি যে বন আছে সেখানকার পশু, গাছপালা ও বনজ উৎপাদনের কথা লেখো :

বনের গাছপালার নাম	বনের পশুদের নাম	বন থেকে তোমরা কী কী পাও	বনের কী কী অন্য জায়গায় চলে যায়

বন থেকে কী কী পাই

বনের গাছ আমাদের নানা কাজে লাগে। দরজা-জানালা-টেবিল-চেয়ার তো আছেই। গাছের ছাল থেকে মশলা হয়।

একথা শুনে ফরিদা বলল— ছাল থেকে ওষুধও হয়। দড়ি তৈরির আঁশও হয়।

জন বলল— পাতা, লতা থেকে ও ওষুধ হয়। আগে গাছের পাতার উপর লেখা হতো। এখনও গাছ থেকেই কাগজ হয়। এছাড়া ফুল, ফল তো আছেই। পাতা থেকে থালা, বাটি হয়।

এসব শুনে দিদি বললেন— বাঃ! এই তো অনেক কিছু জানো।

কেয়া বলল— বনের কিছু গাছ খুব লম্বা। নারকেল, তাল, শাল। বট, অশ্বত্থ আবার চারদিকে ছড়িয়ে বিরাট গাছ।

—এভাবেও গাছের আলাদা দল করতে পারো। কলা, পেঁপে নরম কাণ্ডের গাছ । শাঁকালু লতানো গাছ। কিছু গাছ খুব ভিজে মাটিতে হয়। কিছু গাছ জলেও হয়। কারো পাতা ঝরে পড়ে। কারো পাতা আবার সবসময় সবুজ।

খোঁজাখুঁজি করে বলাবলি করে লেখো

১। কোন গাছের কোন অংশ থেকে কী হয় তা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বড়োদের কাছে জেনে নাও, আলোচনা করে লেখো :

ওষুধ	
দড়ি	
আসবাবপত্রের কাঠ	
কাগজ	
মশলা	
ফল	
ফুল	

২। তোমার এলাকায় এমন বিভিন্ন ধরনের কী কী গাছ পাওয়া যায়? খুঁজে দেখে, আলোচনা করে লেখো:

লম্বা গাছ	ছড়ানো বড়ো গাছ	নরম কাণ্ডের গাছ	লতানো গাছ	স্যাঁতসেঁতে মাটির গাছ	জলাভূমির গাছ

হারিয়ে যাওয়া বন আর নতুন বন

অল্প কিছু দিন আগেও স্থলের বেশিরভাগটাই ছিল বন। চাষ করতে শেখার আগে মানুষ বিশেষ গাছ কাটত না। একসময় মানুষ চাষ করতে শিখল। গাছ কাটার ধারালো অস্ত্র বানাল। এবার দরকার চাষের জমি। শুরু হলো গাছ কাটা। চাষের জমি বাড়াতে গিয়ে বন কমতে থাকল। তবে তখন এত লোকজন ছিল না। তাই গাছ কাটা হলেও, অনেক বন-জঙ্গল ছিল। অনেক কাল আগে ভারতে রাজারা বনের ওপর কড়া নজর রাখত। বন থেকে কাঠ তো পাওয়া যেতই। এমনকি হাতিও পাওয়া যেত। যে বনে হাতি থাকত তার উপর রাজার দখল ছিল। সেই হাতি রাজার সেনাবাহিনীতে কাজে লাগত। ভারতে হাতি যুদ্ধের কাজে খুব ব্যবহার হতো। তাই হাতি-বনগুলির খুব গুরুত্ব ছিল। তাছাড়া বনে অনেক মনুষ থাকত। তারপর একসময়ে লোক অনেক বাড়তে থাকে। তখন চাষের জমিও বাড়াবার দরকার হয়। নতুন নতুন থাকার জায়গারও প্রয়োজন হয়। তৈরি হলো নগর, শহর। এক জায়গায় অনেক মানুষ ভিড় করতে থাকল। কিন্তু শহরের বাতাসে বেড়ে গেল ধুলো-ধোঁয়া। গাছের পাতা ধুলোয় ঢেকে গেল। শ্বাসকষ্টের অসুখ, মৃত্যু বাড়াও শুরু হলো। গাছের পাতা ছাড়া অক্সিজেন পাওয়া যাবে না একথা কিছু লোক বুঝল। যতজনকে পারল বোঝাল। কিন্তু বনের আকার ছোটো হতেই থাকল।

চাষ করলেও গাছ থাকে। কিন্তু শহর বাড়তেই থাকলে? ক্রমে চাষের জমিও কমতে থাকল। শুরু হলো খাদ্যের অভাব। ফল খাবে? ফলের গাছও বেশি নেই। সেও তো কাটা পড়েছে! বন নেই, পশুরা বারবার লোকালয়ে চলে আসছে। ঘরবাড়ি ভেঙে দিচ্ছে। ফসল নষ্ট করছে।

এবার নিজেদের ভুল বোঝা শুরু হলো। ফলের এত দাম। তাই অনেক লোক ফলের গাছ কাটা বন্ধ করল। অনেকে চাষের জমিতে ফলের গাছও লাগাল। পেয়ারা গাছ। কলা গাছ। আম গাছ। প্রথম কয়েক বছর ফল, ফসল দুইই হলো। তারপর সেগুলো ফলের বাগান হয়ে গেল।

কাঠেরও তো দাম অনেক। তাই অনেকে ছোটো গাছ কাটা বন্ধ করল। কেউ কেউ পুকুর পাড়ে শাল, সেগুন গাছ লাগিয়ে দিল। কেউবা আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল। বাড়ির পাশে বা চাষের জমিতেই বনের এসব গাছ চাষ শুরু করল।

রাস্তার ধারে গাছ লাগানো শুরু হলো। সবদিক বজায় রেখে বাঁচার ভাবনা এল। শহর, গঞ্জেও গাছ চাই। কারখানার পাশেও গাছ চাই। বড়ো বন চাই। ছোটো বন চাই। তবেই উন্নত শিল্প কারখানা, গ্রাম-শহরের জীবন টেকসই হবে।

দিদিমার কাছে অসীম এসব মুগ্ধ হয়ে শুনল। ক্লাসে এসে সব বলল। দিদিমণি বললেন— লোকালয়ের মাঝেই এইসব ছোটো ছোটো বন হচ্ছে। এগুলোকে বলে সমাজভিত্তিক বন। তবে এধরনের বনও যথেষ্ট হয়নি। আমাদের দেশে বন কম। আমাদের রাজ্যে খুব কম। বড়ো বনেও গাছ কম। তাই সুযোগ পেলেই গাছ লাগাবে।

বেড়াতে গিয়ে বন দেখা

পথের পাশে একটা বড়ো বনের মতো। মোটা মোটা গাছ। তবে ফাঁকা ফাঁকা। কোনো গাছের গুঁড়ি হাত দিয়ে বেড় পাওয়া যায় না। বেড় দিয়ে ধরতে গেলে তিনজন মিলে ধরতে হবে। মামার বাড়িতে স্বপন আগেও এসেছে। কিন্তু এদিকটায় আসেনি। তাই এসব দেখেনি। সে ভাবল, কত বছরে গুঁড়িগুলো এত মোটা হয়েছে? কী গাছ এগুলো? পাতা দেখে মনে হয় আম গাছ। ভাবতে ভাবতে সাত-আট মিনিট হেঁটে ফেলল।

বনের ভিতরে একটা শান-বাঁধানো পুকুর রয়েছে। একটু একটু ভাঙা হলেও বেশ ভালো ঘাট। ঘাটে কেউ নেই। সন্ধে হয়ে আসছে। যদি পথ চিনতে অসুবিধে হয়? তাই বেশি ভিতরে গেল না। বাড়ি ফিরে গেল।

সব শুনে দাদু বললেন — ওটাকে বলে বিশালাক্ষীর আমবাগান। পুকুরটাকে বলে বিশালাক্ষীর পুকুর। আর একটু গেলেই বিশালাক্ষীর মন্দির। বাগানে কমপক্ষে দু-হাজার আম গাছ আছে। গাছগুলো কে লাগিয়েছে কেউ জানে না।

স্বপন বলল— শুধু আম গাছ লাগাল কেন?

— সে কি আর আমিই জানি? ছোটো থেকেই ওইরকম দেখছি। গাছগুলো তিন-চারশো বছরের পুরোনো। ঠাকুরদা

বলত আগে অনেক রকম গাছ ছিল। এত বাড়ি তখন ছিল না। আরো বাগান ছিল। ওই বাগানেরই লাগোয়া। বাগান কেটে কেটে ঘরবাড়ি হতো। ফলের গাছগুলো রেখে দিত। অন্য গাছ কেটে বাড়ির দরজা, জানালা, খাট-চৌকি করত। কাঁঠাল-জাম গাছও কাটত। আম খুব দামে বিক্রি হয়। তাছাড়া আম কাঠ বেঁকে যায়। তাই আমগাছগুলোই রয়ে গেল।

— আমগুলো বিক্রি করে কারা টাকা পায়?

— পঞ্চায়েতের থেকে আমের ব্যাপারীরা গাছ জমা নেয়। পাহারা দেয়। আম বেচে।

স্কুলে গিয়ে স্বপন মামাবাড়ির দেশের আমবাগানের কথা বলল। সবাই মন দিয়ে শুনল। আয়েসা বলল— আমার ফুফুর বাড়ির পাশেও ওইরকম বন আছে। এপার থেকে ওপার যেতে আধ ঘণ্টা লাগে। সেটাকে বলে দৌলত মাজারের বন। সেখানে আম গাছ নেই। শাল, শিশু, গামার গাছ আছে। ভিতরে মাজার তো। গাছ কাটা নিষেধ। কেউ কাটে না।

নিয়তি বলল— আয়েসা, মাজার মানে কীরে?

সে কিছু বলার আগেই রফিক বলল— মাজার মানে পির সাহেবের কবরস্থান।

নিয়তি সঙ্গে সঙ্গে বলল—ওহ, বুঝেছি।

দিদি বললেন— আমাদের বাড়ি এখান থেকে প্রায় চার কিলোমিটার উত্তরে। ওই বাড়ি থেকে আরও এক কিলোমিটার গেলে ওইরকম একটা বন আছে। সেটাকে লোকে বলে সাহেব জেনের বন।

নিজের দেখা বনখণ্ড

নিয়তি, কৃষ্ণা, আয়েসা একটু মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর একসঙ্গে বলল - আমাদের গ্রামে কোনো বন নেই। পাশের গ্রামেও নেই।

দিদি বললেন— এসব ঘনবসতির অঞ্চল। মন্দির, কবরস্থান, জেন এই সবের নামে কিছু বনখণ্ড এখনও আছে। না হলে সব জায়গায় বাড়ি হয়ে যেত। হয়তো নতুন করে কিছু সামাজিক বনসৃজন হতো।

অম্লান বলল দিদি, আপনাদের ওখানকার বনটাই দেখতে যাব একদিন।

— বেশ তো। দেখে আসবে। তারপর নিজেদের দেখা বন নিয়ে আলোচনা করবে। আর সেই বন সম্পর্কে লিখবে।

বলাবলি করে লেখো

তোমার নিজের দেখা বন সম্পর্কে নীচে লেখো :

নিজের দেখা স্থানীয় বনখণ্ড ও তার ইতিহাস

বনের নাম : গ্রাম: পোস্ট: জেলা:

কত সময় হেঁটে বনটা পেরিয়ে যাওয়া যায় :

(উত্তর থেকে দক্ষিণ) : (পূর্ব থেকে পশ্চিম):

বনে কী কী গাছ দেখেছ :

গাছের সংখ্যা কত শত বা হাজার হতে পারে :

বনে কী কী পাখি দেখেছ :

বনে কী কী পাখির বাসা দেখেছ :

বনে কী কী জলাশয় দেখেছ :

বনের ভিতরে আর কী কী দেখেছ :

ওই বনের ইতিহাস সম্পর্কে স্থানীয় লোকদের বক্তব্য

কত বছরের পুরোনো বন : কারা দেখভাল করে :

অন্যান্য বিষয় :

ওই বন সম্পর্কে তোমার নিজের কী মনে হয়েছে

বিষয়	নিজের কী মনে হয়েছে

বন্যপ্রাণী সুরক্ষা

স্কুলের পথে চার বন্ধুর খুব তর্ক হলো। প্রণব বলল — আগে সব বনেই বাঘ ছিল। না হলে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বনে থাকে বাঘ' লিখতেন? অন্যরা বলল — আগেও ছিল না। আগে থাকলে এখনও থাকত। সব বাঘ কি আর মরে যেতে পারে?

ক্লাসে এসব বলল ওরা। সব শুনে দিদিমণি বললেন — বাঘ তো অনেকরকম। ডোরা কাটা বাঘ, চিতাবাঘ, নেকড়ে বাঘ। এদের কেউ না কেউ সব বনেই ছিল। ডোরাকাটা বাঘই ছিল অনেক বনে। কবি যখন লিখেছিলেন তখন এদেশে বাঘ ছিল চল্লিশ হাজারের বেশি। এখন সে সংখ্যা দু-হাজারেরও কম।

রেহানা বলল — বাঘ এত কমে গেল কী করে?

লিনা বলল— জানিস না? মানুষ বাঘ মারত। বন্দুক দিয়ে বাঘ মারতে পারলে লোকজন তাকে বীর ভাবত। নিজে বাঘ মেরেছে এমন ছবি ঘরে টাঙিয়ে রাখত।

সুবীর বলল— কিন্তু বাঘও এসে মানুষ খেত।

রফিক বলল — বনে খাবার পেলে বাঘ লোকালয়ে আসে না। মানুষ তো খায়ই না।

— রফিক কিন্তু ঠিকই বলেছে। খিদে না পেলে চট করে বাঘ কোনো জন্তু শিকার করে না। বেশিরভাগ সময়ই মানুষ অকারণে বাঘ মেরেছে।

— সেজন্যই বাঘ এত কমে গেছে। তবুও যে কটা বাঘ এখনও আছে, তাদের জন্যই সুন্দরবনটা আছে। না হলে মানুষ সব গাছ কেটে ফেলত। বাঘের জন্যই লোকে গাছ কাটতে ভয় পায়।

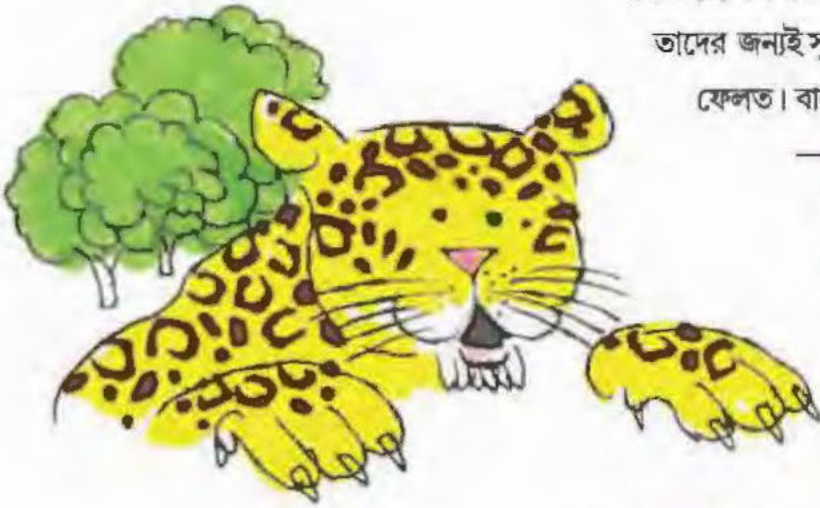

— তা বটে! মানুষ যত খুশি পশুপাখি মেরেছে। একটা বড়ো জন্তু ছিল চিতা। শিকারের জন্য মানুষ অনেক চিতা মেরেছে। তাতে ভারত থেকে চিতা হারিয়ে গেছে। হুইয়া পাখির পালক ছিল সুন্দর। সেই পালক ঘরে রাখবে বলে মানুষ তাদেরও মেরে ধ্বংস করে দিয়েছে।

লিনা বলল —শুধু চিড়িয়াখানায় একটা-দুটো আছে?

— তাহলেও তো হতো। ওরা একেবারেই নেই। নাম না জানা আরও অনেক পশুপাখিও আজ লুপ্ত। কিছু মানুষ গন্ডার মারে তার খড়্গের জন্য। হাতি মারে তার লম্বা দুটো দাঁতের জন্য।

— এগুলো খুব খারাপ কাজ। এমন অন্যায় করলে শাস্তি দেওয়া উচিত।

বলাবলি করে লেখো

তোমার অঞ্চলে কী কী পশুপাখি মারা হয়? কেন মারা হয়? এসব নিয়ে আলোচনা করে লেখো:

পশুপাখির নাম	তাদের মারার কারণ	যাঁরা মারেন তাঁদের শাস্তি বিষয়ে তোমাদের মত

তা সে যতই কালো হোক

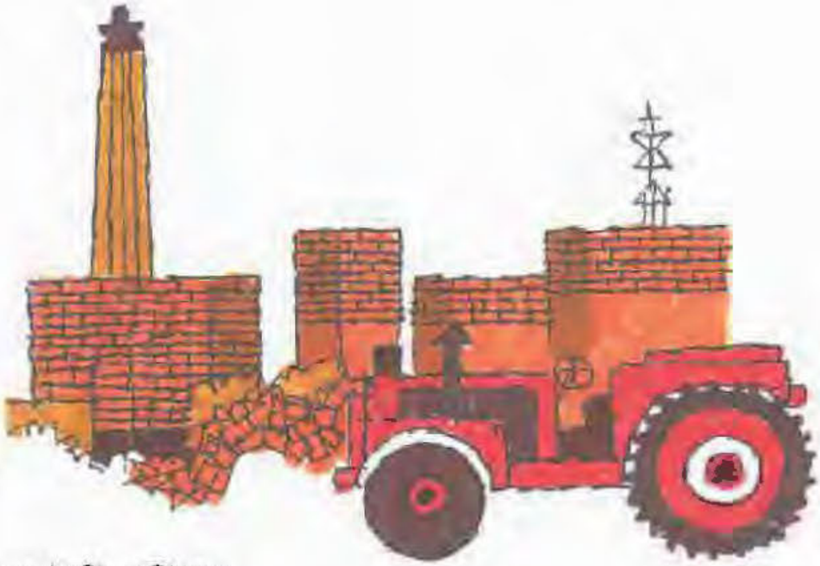

অজিতদের স্কুলে আসার পথে ইটখোলা পড়ে। সেখানে তিন লরি কয়লা এল। অজিত ও তার বন্ধুরা সবাই বুঝল, দশ-পনেরো দিনের মধ্যে ইট পোড়ানো শুরু হবে। কয়লা দেখে অজিত বলল — এই কয়লা কোথা থেকে আসে জানিস? দু-তিনজন একসঙ্গে বলল — রানিগঞ্জের কয়লা খনি থেকে।

— বর্ধমান শহর থেকে পশ্চিমে আরও আশি-নব্বই কিলোমিটার।

সবাই জানে অজিতের মামা কয়লাখনিতে চাকরি করেন। অজিত সেখানে যায়। সেখানকার অনেক কিছুই জানে। তাই মনসুর বলল — কয়লাখনি কেমন রে? পুকুরের মতো? এখানে পুকুর কাটতে-কাটতে একসময় বালি বেরোয়। ওখানে তেমনি কয়লা বেরোয়?

— মামার কাছে শুনেছি সেরকম হয়। সেগুলোকে বলে খোলামুখ খনি। তবে বড়ো খনিগুলো খুব গভীর। সুড়ঙ্গ করা থাকে। সেখান দিয়ে ঢুকতে হয়। খানিকটা যাওয়ার পরেই চারিদিকে কালো। অবশ্য গাইডরা পথ দেখান।

— ইলেকট্রিকের আলো নেই?

— আছে। তবে চারিদিকে কালো কয়লা। আলোর জোর কি আর হয়?

— মেঝেটা সিমেন্টের?

—তা কি করে হবে? কয়লার মধ্যেই তো সুড়ঙ্গ। তার মেঝেও কয়লার। দেয়াল কয়লার। ছাদ কয়লার। আবার এখানে সেখানে জল চুঁইয়ে পড়ছে। হাঁটার পথটা কাদা-কাদা মতন।

স্যার আসার পর আবার এসব কথা উঠল।

অজিত বলল— মামার কাছে শুনেছি, মামাকে প্রায়ই পাঁচশো মিটারেরও বেশি গভীরে নামতে হয়।

মনসুর বলল — আসানসোল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় একশো মিটার উঁচুতে। তোর মামাকে তো তাহলে প্রায়ই সমুদ্রের গভীরে চলে যেতে হয়!

মনসুরের কথায় সবাই হাসল। স্যার হেসে বললেন — সে তো বটেই। ওখানে ছ-শো মিটার গভীরেও কয়লা আছে। তোমরাতো জানো কয়লা হলো পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খনিজ সম্পদ।

কেমন করে হলো কালো

সাবিনা বলল— কত বড়ো হয় একটা খনি?

স্যার বললেন — ওই অঞ্চলে অনেক জায়গাজুড়ে অনেকগুলো কয়লাখনি। আসানসোল-রানিগঞ্জ-এর উত্তর-পূর্ব আর দক্ষিণ-পশ্চিমে খনিগুলো ছড়ানো। বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায়ও কয়লাখনি আছে। প্রায় দেড়হাজার বর্গকিলোমিটার জুড়ে এই কয়লাখনি অঞ্চল।

সাবিনা বুঝতে পারল না। অজিত বলল — ধর, একটা জায়গা ষাট কিলোমিটার লম্বা, পঁচিশ কিলোমিটার চওড়া। ষাট আর পঁচিশ গুণ কর। দেখবি জায়গাটার ক্ষেত্রফল দেড়-হাজার বর্গকিলোমিটার হবে।

স্যার বললেন — ঠিক বলেছ। তবে কয়লা খনি অঞ্চলটা অবশ্য ওইরকম আয়তাকার নয়।

কিন্তু মাটির নীচে এত কয়লা? এল কোথা থেকে? সাবিনা একথা জানতে চাইল।

স্যার বললেন — কাঠ-কয়লা কী করে হয় জানো?

ফরিদা বলল — হ্যাঁ, স্যার। জ্বলন্ত কাঠে জল দিতে হয়। কাঠ নিভে যায়। কিন্তু ওর মধ্যে জ্বালানি থেকে যায়।

অরূপ বলল— জ্বলন্ত কাঠটা বস্তা দিয়ে চাপা দিলেও নিভে যায়।

স্যার বললেন — তুমি কী ওভাবে কাঠ-কয়লা করেছ নাকি?

— হ্যাঁ, স্যার। ওইভাবে নেভালে সেই কাঠ-কয়লা দিয়ে তুবড়ি বানানো যায়।

—বেশ। ধরো, ভূমিকম্প হয়ে অনেক গাছপালা মাটির তলায় চাপা পড়ে গেল। একশো বছর পরে ওই গাছপালার কাঠগুলোর কী হবে?

—মাটির নীচে চাপে আর জলে পচে যাবে?

পবন বলল —না, স্যার। কাঠের অসার অংশগুলো পচে যাবে। কিন্তু সার অংশগুলো পচবে না।

— তাহলে ওগুলোর কী হবে? ভাবো দেখি?

বলাবলি করে লেখো

মনে করো, কোনোভাবে বড়ো বড়ো অনেক গাছ চাপা পড়ে গেল। এক হাজার বছর পরে ওই গাছগুলোর কী হবে? নিজেরা আলোচনা করো। বড়োদের সঙ্গে কথা বলো। তারপর লেখো:

এক হাজার বছর পরে গুঁড়ির সার অংশগুলো কী হবে	এক হাজার বছর পরে গুঁড়ির অসার অংশগুলো কী হবে

পুড়ে পুড়ে তাপ দিল, রইল পড়ে ছাই

পরের দিন। অরূপ বলল — ওই গাছগুলো অনেকদিন চাপা থাকলে কি কয়লা হয়ে যাবে? কাঠ-কয়লার মতো হবে? মাটি তো আর জ্বলে না। লোহাও জ্বলে না। কাঠ আর কয়লা জ্বলে। ওইভাবেই বোধহয় কয়লা তৈরি হয়েছে।

স্যারকে একথা বলতেই স্যার খুব খুশি হলেন। বললেন — এই তো বেশ আন্দাজ করেছ। তবে এক হাজার বছরে হয়নি। অনেক হাজার বছর আগে চাপা-পড়া গাছ থেকে কয়লা হয়েছে। প্রাণীদের হাড় থেকেও হতে পারে। কয়লার অনেকটা অংশই কার্বন। পশুপাখি-গাছপালা সব কিছুরই একটা প্রধান উপাদান ওই কার্বন।

—অনেকদিন ধরে পড়ে থেকে চাপে শক্ত হয়ে গেছে?

রুবি বলল — সার অংশটা জমাট হয়ে গেছে। আর সব কিছু পচে গেছে। তাই না, স্যার?

— হ্যাঁ। তবে শুধু চাপ নয়। মাটির নীচে গরমও খুব। চাপে আর তাপে এমন হয়েছে। কার্বন অংশটা জমাট হয়ে রয়ে গেছে। ওই কার্বন জমেই কয়লা।

—তাহলে কয়লা পুড়লে ছাই হয় কেন?

— সব কয়লায় বেশি ছাই হয় না। চাপে আর তাপে যত বেশিদিন থাকে, ততই অন্য জিনিস কমে যায়। কার্বন কমে না। ফলে কয়লায় কার্বনের ভাগ বেড়ে যায়। সেই কয়লা পোড়ালে ছাই খুব কম হয়।

— সেগুলো নিশ্চয়ই মাটির অনেক গভীরে থাকে। তাই না?

— ঠিকই বলেছ। কিন্তু কেন এমন ভাবছ?

আয়ুব বলল— গভীরে থাকলে বেশি চাপ পড়বে। আর গভীরে তো গরমও বেশি।

— বাঃ! এবারও ঠিক বলেছ। কিন্তু, একথা জানলে কী করে?

— টিভিতে আগ্নেয়গিরি দেখেছি। গরম লাভা বাইরে বেরিয়ে আসে। তাই মনে হলো মাটির গভীরে খুব গরম।

কয়লার ধোঁয়া: দূষণ

বাড়ি ফেরার পথে আয়ুব অজিতকে বলল — তোম মামা যখন কয়লাখনির সুড়ঙ্গে নামেন তখন শ্বাসকষ্ট হয় না?
— সুড়ঙ্গের মধ্যে বাতাস পাঠানো হয়। কম্পিউটারে কত মাপামাপি! দরকার হলে অক্সিজেনও পাঠায়। বড়ো কিছু ভুল হওয়ার আগেই কম্পিউটারে ধরা পড়ে। অ্যালার্ম বেজে ওঠে।

কথা বলতে বলতে ওরা রেললাইনের পাশের রাস্তা ধরে হাঁটছিল। ওখানে অনেক চেনা লোক থাকেন। বিকালে অনেকেই কয়লার উনুন জ্বালান। কেয়া বলল— দেখ না, কয়লার আঁচ থেকে কীরকম ধোঁয়া উড়ছে।

পরদিন ক্লাসে এসব কথা হলো। স্যার বললেন— ওই ধোঁয়া খুব বিষাক্ত।

কেয়া বলল — চোখে গেলে খুব চোখ জ্বালা করে। কাঠের ধোঁয়াতেও তাই হয়।

— দুটোরই তো একই উৎস। সবচেয়ে সমস্যা কী জানো? ধোঁয়ায় সালফারের অক্সাইড, নাইট্রোজেনের অক্সাইড আর কার্বনের অক্সাইড গ্যাস থাকে। ওই গ্যাসগুলো বৃষ্টির জলে গুলে গিয়ে অ্যাসিড বৃষ্টি হতে পারে। এতে মাটি, গাছপালা, সৌধের নানা ক্ষতি হয়।

— তাই চোখ জ্বালা করে?

— হ্যাঁ চোখে একটু-আধটু ধোঁয়া লাগলে কিছু হবে না। কিন্তু যাদের চোখে রোজ লাগে তাদের চোখের ক্ষতি হবে।

অরূপ বলল — ওই ধোঁয়াতে কোনো বিষাক্ত গ্যাস আছে?

— একটা বিষাক্ত গ্যাস তো আছেই। কার্বন মনোক্সাইড। এছাড়াও ধোঁয়ায় অনেক গুঁড়ো জিনিস থাকে।

— সেগুলো শ্বাসে গেলেও তো ক্ষতি!

— ক্ষতির আরও অনেক কিছু থাকে ধোঁয়ায়। এসব নিয়ে বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে কথা বলো। বাড়িতে, পাড়ায় আলোচনা করো।

বলাবলি করে লেখো

কয়লার ধোঁয়া থেকে কীভাবে ক্ষতি হয়? আলোচনা করে লেখো।

ঘটনা	কী ক্ষতি / কীভাবে ক্ষতি
চোখে ধোঁয়া লাগলে	
শ্বাসের সঙ্গে দেহের ভেতর ঢুকলে	
সৌধ বা স্থাপত্যের ওপর প্রভাব	
গাছের পাতার ওপর প্রভাব	
বৃষ্টির জলের মাধ্যমে মাটির ওপর প্রভাব	

ধস না নামে যেন

নিতাইদের পাড়াটা একটা মজে যাওয়া নদীর ধারে। বাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে নিতাই। হঠাৎ দেখল নদীর দিকটায় অনেক লোক। কী ব্যাপার? সুভাষকাকা বললেন— একটা ছেলে পড়ে গেছে। ছেলেটা ছুটতে ছুটতে যাচ্ছিল। বুঝতে পারেনি যে ভিতর থেকে বালি কাটা হয়েছে। উপরের মাটি ধসে বাচ্চাটা গর্তে পড়ে গেছে।

নদীর পাড়ের উপরের দিকে একটু মাটি। তার নীচে বালি থাকে। বাড়ির মেঝে তৈরি করতে বালি লাগে। তখন ওই মাটির নীচের বালি তুলে নেয় লোকজন।

বীণা দিদা বললেন —ছেলেটার বেশি লাগেনি। কিন্তু ভিতর থেকে এমনতরো বালি কেটে নিলে মাটি তো ধসে পড়বেই! নিতাই ভাবল, কয়লাখনিতে কয়লা তুলে নিলে কী হবে? ওদিকেও তো অনেক জায়গায় উপরে মাটি। ভিতর থেকে আগেই কয়লা তুলে নিয়েছে। সেখানেও তো এভাবে মাটি ধসে যেতে পারে!

পরের দিন নিতাই একথা ক্লাসে সবাইকে বলল।

অজিত বলল — ওই ফাঁকা জায়গাগুলো বালি দিয়ে ভরাট করে দিতে হয়। অবশ্য মাটি আলগা থেকে যায়।

স্যার বললেন— সেজন্য খনি অঞ্চলে গাছ লাগানো খুব দরকার। শিকড়গুলো যাতে মাটির নীচে জালের মতো ছড়ায়।

নিতাই বলল — বুঝেছি। তাহলে ধসের ভয় কমে!

— কয়লা তুলে বালি দিয়ে ভরাট করা হয়। গাছও লাগানো হয়। তবু ধস নামে। একটা-দুটো নয়। অনেক জায়গায় ধস নেমে বাড়িঘর নষ্ট হয়ে গেছে। এই কারণে খনি থেকে সব কয়লা তোলা যায় না। কিছু খনি থেকে হয়তো একটু বেশি কয়লা তোলা হয়ে গেছে। সেখানেই ধস নামে।

বলাবলি করে লেখো

কয়লাখনি অঞ্চলের ধসের সমস্যা মোকাবিলা করা যায় কীভাবে? লেখো, ছবি আঁকো:

সমস্যা মোকাবিলায় কী করা যায়	ছবি

কম-গরম আগুন, বেশি-গরম আগুন

স্যার ক্লাসে আসতেই অজিত জানতে চাইল, সব আগুন একই রকম গরম কিনা।

স্যার বললেন— সব আগুন একরকম গরম নয়। গরমের কমবেশি আছে। কিছু কাজে কম গরম আগুন হলে চলে। যেমন রান্না।

খালেদা বলল— কয়লার গুঁড়োর সঙ্গে মাটি মিশিয়ে গুল বানিয়েও রান্না করা যায়।

— ঠিক, কম কার্বন আছে এমন কয়লার আগুনে রান্নার কাজ চলবে। কিন্তু যদি খুব গরম আগুন লাগে? তাহলে কয়লা আরও খাঁটি হওয়া চাই। খুঁজতে হবে কোন কয়লায় কার্বন বেশি।

অজিত বলল— কিন্তু, কী কাজে অত গরম আগুন লাগে?

— লোহা-ইস্পাতের কারখানায় লোহা গলাতে হয়। সেখানে লাগে। তাছাড়া বিদ্যুৎ তৈরি করতে লাগে।

— বিদ্যুৎ দিয়ে সব কাজ করা যায়। আলো জ্বলছে। পাখা চলছে। টিভি, কম্পিউটার সব চলছে।

রুবি বলল— দাদু বলে, তোমার যখন আমার মতো বয়স হবে, তখন পেট্রোল-ডিজেল ফুরিয়ে যাবে। তখন বাসও হয়তো বিদ্যুৎ দিয়ে চলবে।

আয়ুব বলল— কয়লা না হয় ফুরোবে। যা জমা আছে সেটুকুই আছে। পেট্রোল-ডিজেল কী করে ফুরোবে?

স্যার বললেন— পেট্রোল-ডিজেলও কয়লার মতো।

এই বলে স্যার বোর্ডে এবিষয়ে লিখে দিলেন—

পেট্রোলিয়াম থেকে পেট্রোল-ডিজেল -কেরোসিন হয়। পেট্রোলিয়াম থকথকে, কাদা কাদা। মাটির নীচেই পাওয়া যায়। গাছের থেকে যেভাবে কয়লা হয়েছে, সেভাবে প্রাণীদেহ থেকেই পেট্রোলিয়াম হয়েছে। কয়লা পেট্রোলিয়াম দুটোকেই বলে জীবাশ্ম জ্বালানি।

সবাই পড়ল। আয়ুব বলল— তাহলে তো দুটোই ফুরিয়ে যাবে।

স্যার বললেন— তবে পেট্রোলিয়াম হয়তো আগে ফুরোবে। কয়লা তারপরেও চলবে। কিন্তু কয়েকশো বছর পরে তাও হয়তো ফুরোবে।

বলাবলি করে লেখো

তোমাদের এলাকায় পেট্রোল-ডিজেল-কেরোসিন, বিদ্যুৎ কী কী কাজে ব্যবহার করা হয়? আলোচনা করে লেখো :

পেট্রোল-ডিজেল-কেরোসিন কী কী কাজে ব্যবহার হয়	বিদ্যুৎ কী কী কাজে ব্যবহার করা হয়

নানাভাবে বিদ্যুৎ

স্কুল থেকে ফেরার সময় সবাই রুবিকে ধরল। পেট্রোল-ডিজেলের পর কয়লাও তো ফুরিয়ে যাবে! তখন বিদ্যুৎশক্তিই বা কী করে হবে? রুবি চিন্তায় পড়ে গেল।

পরদিন ক্লাসে রুবি জানতে চাইল— স্যার, বিদ্যুৎ দিয়ে এত কিছু হয়। আর বিদ্যুৎ হয় শুধু কয়লা দিয়েই?

স্যার হেসে বললেন— কয়লা ছাড়াও বিদ্যুৎ হয়। বিদ্যুৎকেন্দ্রে একটা মস্ত পাখার মতো দেখতে একটা যন্ত্র থাকে। এটা টারবাইন। সেটা ঘোরাতে হয়। সে বাষ্পের চাপে ঘোরাও, আর সবাই মিলে ঠেলে ঘোরাও। যে ঘোরাবে, তার শক্তির একটা অংশই বিদ্যুতের শক্তি হয়ে আসে।

অনেকেই ঠিকমতো বুঝতে পারল না। তখন স্যার আবার বললেন — ডায়নামো লাগানো সাইকেল দেখেছ তো?

অজিত বলল — বুঝেছি। ডায়নামো চালু করলে প্যাডেল করতে একটু বেশি খাটনি হয়। তবে প্যাডেল করা যাবে।

রুবি বলল— ডায়নামোতে ছোটো একটা বালব জ্বলবে। জেনারেটরে বরং অনেক আলো জ্বলে।

— জেনারেটর কোথায় দেখেছ?

— যাত্রার সময়। হয়তো রাজা বিচার করছেন। এমন সময় লোডশেডিং হলো। দর্শকরা হই হই করে উঠল। দু-মিনিটের মধ্যে জ্বলে উঠল জেনারেটরের আলো। আবার বিচার শুরু হলো।

রুবির কথা শুনে সবাই খুব হাসল।

— ওই জেনারেটর ডিজেলের শক্তিতে চলে। বিদ্যুৎকেন্দ্রে আরও বড়ো পাখা ঘোরাতে হয়।

আকাশ বলল - পাহাড়ি নদীর জলে তীব্র স্রোত। তার মুখে পাখাটা ধরতে পারলে খুব ভালো হতো।

— সেটাই করা হয়। তাকে বলে জলবিদ্যুৎ তৈরি করা। একটা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে ভুটানের কাছে ঝালং-এ। জলঢাকা নদীর জলস্রোতের শক্তিতে চলে সেটা।

আয়ুব বলল — জলের স্রোত তো আর শেষ হবে না?

স্যার এর উত্তর দিলেন না। শুধু হাসলেন আর বললেন — জল নিয়ে তো কত কথা হয়েছে। এবার নিজেরা ভাবো, আলোচনা করো।

জলের স্রোত, সূর্যের তাপ

পরদিন। আকাশ বলল— জলের স্রোতটা কী করে হচ্ছে বলত?

পরাগ বলল— সূর্যের তাপে বরফ গলে যাচ্ছে। তাই জল হচ্ছে।

—বরফ জমছে কেন?

— সূর্যের তাপে পুকুর-নদী-সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। উপরে গিয়ে ঠান্ডা হচ্ছে।

অজিত বলল— তাহলে দেখ, সূর্যের তাপেই সব হচ্ছে। সূর্যের তাপ ছাড়া জল বাষ্প না হলে পর্বতে বরফ হতো না। আবার সূর্যের তাপ ছাড়া তা গলতও না।

রুবি বলল—মনে হচ্ছে, সূর্যের তাপ থাকলে জলের প্রবাহও থাকবে। স্যারকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

ওদের কথা শুনে স্যার বললেন— তাহলে আয়ুব নিশ্চিন্ত। সূর্য থাকলে পর্বত থেকে নদী আসবে। জলের প্রবাহও থাকবে।

আয়ুব বলল — আসলে কিন্তু শক্তিটা সূর্যই দিচ্ছে। তবে একটু ঘুরপথে। জলের মাধ্যমে।

— এটাকে বলে জলচক্র। ছবি দেখে ভালো করে বুঝে নাও।

সবাই ছবিটা দেখল। জল বাষ্প হচ্ছে। আবার বরফ গলে জল হচ্ছে। সবাই বুঝল সূর্য আমাদের কত দরকারি।

খানিক পরে আয়ুব বলল — সূর্যের শক্তি সরাসরি কাজে লাগানো যায় না?

— রোজ কত কাজে লাগাও। কাপড় কেচে শুকোও। ধান শুকোও। আর কী কী করো?

সবাই আরও অনেক কিছু বলতে শুরু করল। স্নানের জল গরম করা, রোদ পোহানো, কোথায় কী আছে তা দেখা।

আয়ুব বলল— সূর্যের আলো দিয়ে বিদ্যুৎ করা যায় না?

— তাও করা যায়। সূর্যের আলো সোলার প্যানেলে ফেলে বিদ্যুৎশক্তি তৈরি করা হয়। তা দিয়ে ক্যালকুলেটর চলে। অনেক খেলনা ঘোরে। আরো অনেক কিছু হয়তো দেখেছ। কিন্তু বড়ো বড়ো বৈদ্যুতিক আলো জ্বালানো হচ্ছে, এমন কেউ দেখেছ?

প্রচলিত শক্তি, অপ্রচলিত শক্তি

পরদিন নাসরিনের মনে পড়ল দিদির কলেজের কথা। হস্টেলের সামনে সোলার লাইট আছে। টেবিলের মাপের সোলার প্যানেল। কাচ দিয়ে ঢাকা, খানিকটা উঁচু। একটু দক্ষিণে হেলিয়ে রাখে। দিদি বলেছিল, সারাদিন ধরে রোদে ব্যাটারি চার্জ হয়। দিনের আলো কমে গেলেই জ্বলে ওঠে। ক্লাসে নাসরিন এসব বলল।

স্যার বললেন — ওটাই সৌরবিদ্যুৎ। সূর্যের আলো সোলার প্যানেলে ফেলে পাওয়া যায় বিদ্যুতের আলো। ওটা এখনও তেমন প্রচলিত নয়। তাই এটাকে বলে অপ্রচলিত শক্তি।

আয়ুব বলল—পেট্রোলিয়াম ও কয়লা ব্যবহার করে যে শক্তি পাওয়া যায় তা কি প্রচলিত শক্তি?

— হ্যাঁ, ওগুলো প্রচলিত শক্তি। জলবিদ্যুৎ-ও প্রচলিত। তবে জলবিদ্যুৎ বারবার ব্যবহার করা যায়। শেষ হবে না। কিন্তু অন্য দুটো ফুরিয়ে যাবে। জলপ্রবাহের মতো বায়ুপ্রবাহের শক্তি দিয়ে পাখা ঘুরিয়েও বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়। রোদ ব্যবহার করে রান্নাও করা যায়। সেই যন্ত্রকে বলে সোলার কুকার। উদ্ভিদ ও প্রাণীদের পচা, আধ-পচা বর্জ্য ব্যবহার করে জৈব গ্যাস করা যায়। তা দিয়েও রান্না করা যায়। জোয়ারের জল কাজে লাগিয়েও শক্তি উৎপন্ন করা যায়।

অরূপ বলল — উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বর্জ্য তো রোজই পাওয়া যাবে!

পরাগ বলল— এগুলো অপ্রচলিত রয়েছে কেন?

— এগুলোয় শুরুতে একটু বেশি খরচ হয়। চেষ্টা করা হচ্ছে এসব খরচ কমানোর। কোনোটা দিয়ে আবার কাজ করতে সময় বেশি লাগে। এসব ব্যবহারের সহজ পদ্ধতি বের করার চেষ্টা চলছে।

— বুঝেছি। মানুষ একটু একটু করে সহজ পদ্ধতিগুলো আবিষ্কার করবে।

বলাবলি করে লেখো

১। সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করে কোন কোন যন্ত্র চলে? কে কী দেখেছ আলোচনা করে লেখো :

যন্ত্রের নাম ও ছবি	যন্ত্রের নাম ও ছবি	যন্ত্রের নাম ও ছবি	যন্ত্রের নাম ও ছবি

২। অপ্রচলিত শক্তি কোনগুলো? কেন তাদের অপ্রচলিত বলছ? কীভাবে তারা প্রচলিত হবে? আলোচনা করে লেখো :

অপ্রচলিত শক্তির নাম	কেন অপ্রচলিত বলা হচ্ছে	কীভাবে তারা প্রচলিত হবে বলে মনে হয়

চলাফেরার সেকাল একাল

স্কুল থেকে ফিরছে সবাই। একটু দূরে পাকা রাস্তা। একটা বাস গেল। বেশ ভিড়। সবাই দেখল। বিশু বলল — যখন বাস ছিল না, তখন মানুষ কীভাবে দূরে যেত?

অরূপ বলল— ঘোড়া ছিল। কিন্তু ঘোড়ায় চড়া সহজ নয়। তাছাড়া ঘোড়া পোষার অনেক খরচ।

— গোরুর গাড়ি ছিল। ঠাকুরমার কাছে শুনেছি।

— জানি। এখনও তো আছে। মাঠ থেকে ধান তুলে আনে। তাতে কি দূরে যাওয়া সম্ভব?

নাসরিন বলল— সময় অনেক বেশি লাগত। লোকে বেশি দূরে যেতও না।

পরদিন ওরা স্যারকে এসব বলল। স্যার বললেন — তারপর পালকি এল। চারজন লোক কাঠের পালকি বইত। তার ভিতরে এক বা দুজন মানুষ বসত।

— এক-দুজন মানুষকে চারজন মিলে বইত? নিশ্চয়ই অনেক ভাড়া লাগত?

— তা ঠিক। কলকাতায় ঘোড়ায় টানা গাড়িও ছিল। কিন্তু সেটারও বেশ খরচ ছিল। সাধারণ লোক হেঁটেই যেতেন। দূরে যেতে হলে বয়স্করা গোরুর গাড়িতে যেতেন। বাচ্চারাও সেই গাড়িতে উঠে পড়ত। মালপত্রও তাতে তুলে দেওয়া হতো।

— শুধু ঘোড়া আর গোরুর গাড়ি? অন্য কোনো পশু পরিবহনে কাজে লাগত না?

— কেন লাগাবে না? সুযোগ পেলেই মানুষ পশুর

পিঠে চড়ে বসত। হাতির পিঠে চড়া, উটের পিঠে চড়া প্রচলিত ছিল। তবে হাতি পোষা অনেক খরচ। উটও কম খরচ নয়। গাধার পিঠে মাল নিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। মানুষও গাধার পিঠে চড়ত।

নাসরিন বলল — রিকশা তখন ছিল না? রিকশা কবে হলো?

বিশু বলল— দাদু বলছিল আগে দু-চাকা রিকশা ছিল। মানুষ টানত।

— হ্যাঁ। আগে রিকশা মানুষই টানত। রিকশা ১৯০০ সালে কলকাতায় আসে। তখন জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে লাগত। ১৯১৪ সাল থেকে মানুষ বওয়ায় ওই রিকশা ব্যবহার শুরু হয়।

বলাবলি করে লেখো

আগেকার দিনের এইসব পরিবহণের কোন কোনটায় চড়েছ বা দেখেছো বা চড়ার কথা শুনেছো? কোথায়? কেমন লেগেছে? এসব নিয়ে লেখো :

আগেকার পরিবহণের কোন কোনটায় চড়েছো/দেখেছো/চড়ার কথা শুনেছো	কোথায় চড়েছ	কেমন লেগেছে (ব্যথা/ঝাঁকুনি/ভয়/আরাম)	কতটা পথ যেতে কেমন খরচ হয়েছে	ওই পরিবহণ বিষয়ে আর যা বলতে চাও

নদীর উপর ভেসে চলা

তখন চারিদিকে বন। মাটির উপর রাস্তা কম। ঘোড়ায় চেপেও ভয়ে ভয়ে যাওয়া। বন্য জন্তু আক্রমণ করতে পারে। অন্য লোকেরা আক্রমণ করতে পারে। সে তুলনায় নদীর জল ভালো। নদীতে জল থাকত অনেক বেশি। আর জলের উপর কী ভাসে তা মানুষ অনেক আগেই জেনে গেছিল। তাই অনেক আগে থেকেই জলের উপর দিয়ে

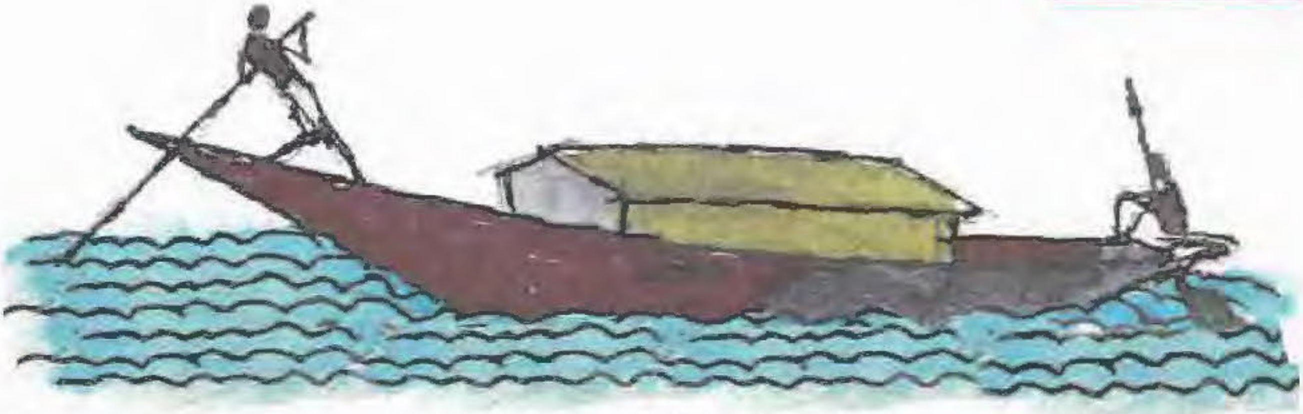

ভেলায় চেপে যেত। তারপর নানা রকমের নৌকা, পানসি তৈরি করেছিল। নিজেরা যেত। মালপত্র নিয়ে যেত।

স্যার নিজেই এসব বলার পর আয়ুব বলল - স্যার, পানসি কী?

— ডিঙিনৌকার মতোই। তবে আরো লম্বাটে, হালকা। পাল খাটানো। হাওয়া লাগলে খুব জোরে যেতে পারে। খুব সাবধানে হাল ধরতে হয়।

অজিত বলল — হাল কী?

আয়ুব বলল — জানিস না? হাল অনেকটা সাইকেলের হ্যান্ডেলের মতো। নৌকা কোন দিকে যাবে তা ঠিক করবে হাল।

— আর পাল?

— পালে বাতাস আটকায়। বাতাস নৌকাকে টেনে নিয়ে যায়।

অজিত ঠিক বুঝতে পারল না। তা দেখে স্যার বললেন— ধরো, তুমি হয়তো ঝড়ের মধ্যে সাইকেলে যাচ্ছ। সাইকেলের হ্যান্ডেল শক্ত করে না ধরলে কী হয়?

— সাইকেল রাস্তায় রাখা যায় না। পাশের নালার দিকে চলে যায়।

— তাহলে বোঝ। নৌকার পালে হাওয়া ধরেছে, অথচ ঠিকমতো হাল ধরা নেই। তাহলে কী হবে?

— বুঝেছি। হালটা ঠিকঠাক না ধরলে নৌকা উলটে যাবে।

আয়ুব বলল — খেয়া পারাপারের নৌকা দাঁড় টেনেই চলে।

— ঠিক বলেছ। দাঁড় টেনে জল পিছিয়ে দিতে হয়। তবে নৌকা এগোতে পারে।

অজিত বলল — ওই নৌকা বেশি জোরে যেতে পারে না।

আয়ুব বলল — জোরে চালানোর জন্য লঞ্চ বা স্টিমারে, ভুটভুটিতে ডিজেল ইঞ্জিন লাগানো থাকে। পাল থাকে না। দাঁড় থাকে না।

— ওগুলোতে হাল থাকে তো?

— অবশ্যই। না হলে চলার সময় দিক ঠিক রাখবে কী করে?

বলাবলি করে লেখো

১। যারা নৌকা, লঞ্চ বা ভুটভুটিতে চড়েছ, সে বিষয়ে লেখো:

কোথায় নৌকা চড়েছ	কী ধরনের নৌকা	কেন চড়েছ	নৌকায় আর কারা ছিলেন/কী মালপত্র ছিল	নৌকায় দাঁড় ও হাল ছিল কিনা, না থাকলে কী কী ছিল

২। নৌকা, লঞ্চ বা ভুটভুটিতে চড়া এবং মালপত্র নেওয়া বিষয়ে যা দেখেছ বা পড়েছ তার ভিত্তিতে পছন্দমতো যে কোনো জলযানের ছবি আঁকো:

তোমার এলাকার যানবাহন

ফেরার সময় ইলিয়াস বলল - আগেকার অনেক যানবাহন এখনও আছে। আবার আরও অনেকরকম যানবাহন এসেছে।
সুনীল বলল - কোন রাস্তায় কী চলে তা তো জানি। মানচিত্র দিয়ে দেখানো যাবে?
অজিত বলল - আমি চেষ্টা করব। যদি পারি কাল তোদের দেখাব।
পরদিন অজিত স্থানীয় পরিবহণ মাধ্যমের মানচিত্র এঁকে দেখাল। স্যার নিজে একটু দেখে সবাইকে দেখালেন।

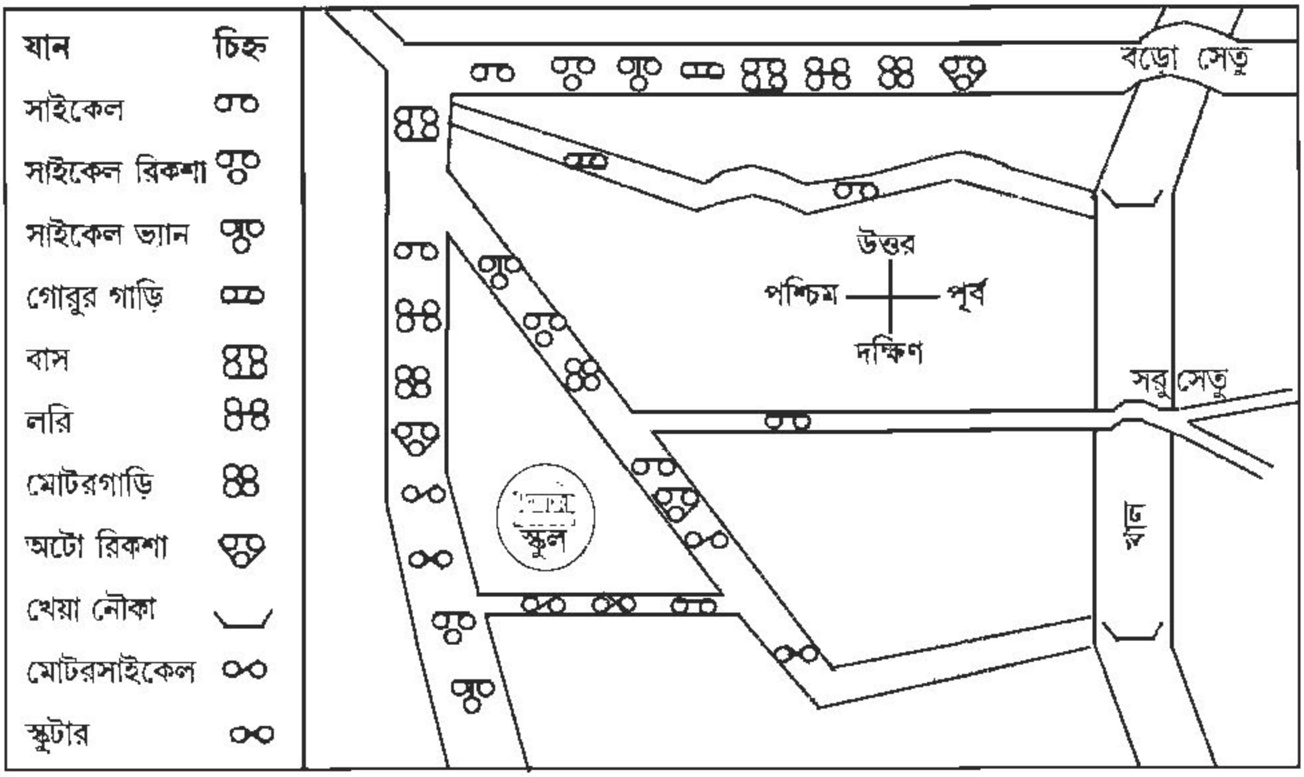

সবাই মানচিত্র দেখতে লাগল। অজিত বলল - চওড়া পিচ রাস্তাটা পশ্চিমে আর উত্তরে। খালটা গেছে পূর্ব দিক দিয়ে।।
ইলিয়াস বলল - সে তো নৌকা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।
নাসরিন বলল - দেখ, বড়ো রাস্তায় গোরুর গাড়ি চলে না। শুধু উত্তর দিকের ঘাট থেকে বড়ো রাস্তায় গোরুর গাড়ি যায়।
অরূপ বলল - দক্ষিণ দিকের খেয়াঘাটের রাস্তায় অনেক কিছু যায়। বাস-লরি চলে না। গোরুর গাড়ি চলে না।
পিন্টু বলল - দুটো খেয়ার মাঝের রাস্তা দিয়ে শুধু সাইকেল যায়? স্কুটার, মোটর সাইকেলও যায় না?
অজিত বোঝাল – সরু সেতু। তায় বাঁশের, আর পুরোনো হয়ে গেছে।
স্যার বললেন— বেশ, বেশ। বলো দেখি সমস্ত রাস্তায় কোন যান যেতে পারে?
খানিকক্ষণ দেখে দু তিনজন একসঙ্গে বলল— সাইকেল।
— ঠিক বলেছ। সাইকেল খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা যান। দশ-পনেরো কিলোমিটার যাতায়াতে সাইকেল পরে খুব দরকারি হবে।

দেখে বুঝে লেখো

১। তোমাদের বাড়ির কাছাকাছি অঞ্চলের পরিবহণ মাধ্যমের মানচিত্র আঁকো।
পছন্দমতো চিহ্ন ঠিক করে নাও:

২। তোমাদের বাড়ির কাছাকাছি কী কী যানবাহন চলে? বাড়ির চারপাশে কয়েকদিন ধরে লক্ষ করো। তারপর লেখো:

কবে দেখেছ (তারিখ)	কখন দেখেছ (ক-টা থেকে ক-টা)	বাড়ির কোন দিকে দেখেছ	কী কী যান দেখেছ ও তাদের সংখ্যা কত

পরিবেশ-বান্ধব পরিবহণ: সাইকেল

স্যার বলেছিলেন, ভবিষ্যতে সাইকেল খুব দরকারি হবে। কিন্তু কেন? কেউ ভেবে পেল না। শেষে স্যারের কাছেই জানতে চাইল।

স্যার বললেন— গাড়ি চললে ধুলো-ধোঁয়া হয়, তাই না?

অজিত বলল—গাড়ি নতুন থাকলে ততটা ধোঁয়া হয় না। পুরোনো হয়ে গেলে খুব ধোঁয়া হয়।

অরূপ বলল— কয়লার ধোঁয়ার মতো গাড়ির ধোঁয়াতেও বিষাক্ত গ্যাস আছে।

কেয়া বলল— হয়তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। পাশের লরিটা ছাড়ল। কালো ধোঁয়ায় চারদিক ভরে গেল।

— শহরে তো রাস্তায় জ্যাম। সারাক্ষণই গাড়ি থামছে আর ছাড়ছে। বাতাসের সব জায়গায় বিষাক্ত গ্যাস ছড়াচ্ছে। কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে। আরও নানারকম বিষাক্ত গ্যাস।

রুবি বলল— গাড়ির ধুলোয়ও গাছের খুব ক্ষতি হয়। পাতায় ধুলো জমে কালো হয়ে যায়।

— ওই পাতা ঠিকমতো খাদ্য তৈরি করতে পারবে না। ধুয়ে দিলে ভালো হয়।

— বৃষ্টি হলে পাতা ধুয়ে যায়। তখন গাছ আবার লকলকিয়ে বাড়ে।

— রাস্তায় গাড়ির তেল-মবিল পড়ে। বৃষ্টিতে তা ধুয়ে যায় চাষের খেতে। এতেও মাটির ক্ষতি হয়। ফসল কমে যায়।

— পুকুরেও বৃষ্টির জল ধুয়ে যায়। পুকুরের মাছের ক্ষতি হয় না?

— হয় তো!

— বুঝেছি, সেজন্য ভবিষ্যতে সাইকেল বাড়বে। সাইকেল চললে বাতাসের দূষণ হবে না!

ইলিয়াস বলল — কিন্তু প্যাডেল করায় কষ্ট হয়। সবাই তো আরাম চায়। মোটরবাইক চায়। তারা কী আর এসব ভাববে!

— অবশ্যই। সকলকেই ভাবতে হবে।

মিনিটখানেক সবাই চুপ করে থাকল। তারপর নানা জন নানা কথা বলতে লাগল।

— রাস্তায় এত গাড়ি। অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে।

— মানুষের সময় কম। সাইকেলে কী করে যাবে?

— পাশে অনেকে গাড়িতে যাবে। তাদের গাড়ির ধোঁয়াটা লাগবে। সাইকেলে যে যাচ্ছে তার মুখেই লাগবে।

- এসব সত্যি কথা। তবে এর সমাধানও ভাবা যায়। কিন্তু আর একটা সত্যি হল খনিতে জমা পেট্রোলিয়াম কমে যাচ্ছে। এর কোনো সমাধান নেই। ফলে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়তেই থাকবে।

ইলিয়াস বলল — কলকাতায় ট্রাম আছে। ট্রেনের মতোই, তবে ছোটো। বিদ্যুৎশক্তিতে চলে। তাতে তো দূষণ কম।

রুবি বলল — ঠিক। তাহলে ট্রাম আর ট্রেন চালাতে হবে!

— সেটা খুবই ভালো কথা। কিন্তু সর্বত্র বিদ্যুতের লাইন যাবে না। তাই বিদ্যুৎচালিত বাইক, চার চাকা গাড়ি এসবও থাকবে। তবে সাইকেলও বাড়াতে হবে।

বলাবলি করে লেখো

সাইকেল চালানো আরও সহজ করার জন্য রাস্তার সমস্যাগুলো কীভাবে কমানো যায়? ভাবো। আলোচনা করো। তারপর লেখো :

অ্যাকসিডেন্টের সমস্যা	
মানুষের কম সময়ের সমস্যা	
অন্য গাড়ির ধোঁয়ার সমস্যা	
অন্য সমস্যা যা কেউ বলেনি	

কু ঝিক ঝিক

পরের দিন। উড়োজাহাজ, ডুবোজাহাজ আর ট্রেন নিয়ে কথা শুরু হলো। তিনটেই আশ্চর্য জিনিস।

উড়োজাহাজ আশ্চর্য জিনিস। কী করে ওড়ে?

ডুবোজাহাজ আশ্চর্য জিনিস। জলে ডুবে কী করে জোরে ছুটে যায়?

ট্রেন আশ্চর্য জিনিস। অত বড়ো গাড়ি দুটো সরু লাইনের উপর দিয়ে কী করে যায়? এক সঙ্গে এত লোক নিয়ে যায়।

স্যার ক্লাসে এলে রেলের কথাই আগে বলল সজল। স্যার প্রথমেই বললেন — একটা ট্রেন কত বড়ো বলো দেখি?

— নয়-দশটা বগি থাকে। এক একটা বগিতে তিন-চারটে বাসের লোক ধরে। একটা ট্রেনে ত্রিশ-চল্লিশটা বাসের লোক ধরে।

— এখন আবার সব বারো বগির ট্রেন হয়েছে। তাতে আরও বেশি লোক ধরবে।

আকাশ বলল — স্যার, মেল ট্রেনে আরো বেশি বগি থাকে। কুড়ি-বাইশ বগি। ভিতরে শোওয়ার জায়গা থাকে।

রুবি বলল — তুই তো রাত্রিতে গেছিস। তোর ভয় লাগেনি ?

— কীসের ভয় ?

— সরু লাইনের উপর দিয়ে যাচ্ছে। যদি লাইন থেকে পড়ে যায়। এসব মনে হয়নি ?

স্যার বললেন — ট্রেনের দু-দিকের চাকার ভিতর দিকে খাঁজ থাকে। কোনোদিকেই লাইন থেকে সরতে পারে না। সুযোগ পেলে একটু ভালো করে দেখে নিও।

বিশু বলল — তাহলে ট্রেন নিজেই লাইনের উপর থাকে ? ড্রাইভারকে তার জন্য কিছু করতে হয় না ?

— ড্রাইভার সিগন্যাল দেখেন। ঠিক সময়ে স্টার্ট দেন। ব্রেক চাপেন।

একথা শুনে বিশুর খুব স্বস্তি হলো। রুবি বলল — স্যার। ওর খুব ইচ্ছা ট্রেন চালাবে। শুধু ভাবে সরু লাইনের উপর চাকা রাখতে পারবে কিনা। আজ ওর ভয় কাটল।

নাসরিন বলল — আগে কয়লার ইঞ্জিনও ছিল। নানির কাছে শুনেছি।

— ঠিকই শুনেছ। স্টিম ইঞ্জিন। কয়লা পুড়িয়ে জল ফুটিয়ে বাষ্প করা হতো। সেই বাষ্পের চাপে একটা মোটা পিস্টন বেরিয়ে আসত। তার ঠেলায় চাকা ঘুরত।

অরূপ বলল — স্যার, এসব কবেকার কথা? কত সাল থেকে এদেশে ট্রেন চলছে?

— ১৮৫৩ সালের ১৬ এপ্রিল এদেশে যাত্রী নিয়ে প্রথম ট্রেন চলে। ১৮৫৪ সালে হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত ট্রেন চালু হয়। এই রাজ্যে ট্রেন চলা সেই শুরু।

ইলিয়াস বলল - স্যার ট্রেন চলায় কী কী সুবিধা হয়েছিল?

— আগের থেকে যাতায়াত অনেক সহজ হয়ে গেল। কম সময়ে বেশি রাস্তা যাওয়া সম্ভব হলো। মালপত্র নিয়ে যাওয়াও সহজ হয়ে গেল। তোমরা তো অনেকেই মালগাড়ি দেখেছ। কত কয়লা, লোহা, তেল নিয়ে যায়। অথচ কত সহজে চলে যায়।

অরূপ বলল — স্যার প্রথম থেকেই কী অনেক লোকে ট্রেনে চড়ত?

— না। প্রথমে সবাই ট্রেনে চড়ত না। অনেকেই ভয় পেত। যদি ধাক্কা লাগে। তাছাড়া সব জায়গায় রেললাইন ছিল না। আর একটা ব্যাপার ছিল জানো। ট্রেনে চড়ার সময় কোনো বাছ-বিচার করা যেত না। একটা বগিতে সবাই একসঙ্গে চড়ত। তাই সেখানে যেমন তোমরা সবাই পাশাপাশি বসে পড়াশোনা করো। তেমনি ট্রেনেও সবাই সমান। আবার একটা ট্রেন বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যেত। এভাবে নানান অঞ্চলের মানুষের মধ্যে মেলামেশা সহজ হয়ে এল ট্রেনে চড়ার মধ্যে দিয়ে।

পলাশ বলল — স্যার আমি একটা সিনেমায় ট্রেন দেখেছি। দিদি ছোটো ভাইকে নিয়ে ট্রেন দেখতে দৌড়ে যাচ্ছে। কাশবন আর মাঠ পার করে।

— হ্যাঁ। ওটা খুব বিখ্যাত সিনেমা। *পথের পাঁচালী*। সত্যজিৎ রায় সিনেমাটা বানিয়ে ছিলেন। ওরা দুর্গা আর অপু। *পথের পাঁচালী* নামে একটা বইও আছে। খুব ভালো বই। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। তোমরা একসময়ে পোড়ো। আর জানো, পৃথিবীতে প্রথম সিনেমাও ট্রেন নিয়ে হয়েছিল। একটা ট্রেন স্টেশনে এসে থামল। তার থেকে লোকে নামল। সেটাই পৃথিবীর প্রথম সিনেমা। লোকে সেটা দেখে চমকে গেছিল। ভেবেছিল পর্দা থেকে ট্রেনটা বুঝি বেরিয়ে আসবে।

বলাবলি করে লেখো

মানুষ ট্রেনে করে আর কী কী নিয়ে যায়? এসব নিয়ে বাড়িতে, পাড়ায়, নিজেরা আলোচনা করো। যারা ট্রেন দেখেনি তাদের অন্যরা বুঝিয়ে দাও। তারপর লেখো :

তোমার ঠিকানা	
বাড়ির সবচেয়ে কাছে রেল লাইন কোথা দিয়ে গেছে ও সেটা বাড়ি থেকে কত দূরে	
বাড়ির সবচেয়ে কাছের স্টেশনের নাম ও সেটা বাড়ি থেকে কত দূরে	
ট্রেনে করে মানুষ আর কী কী বয়ে নিয়ে যায়	

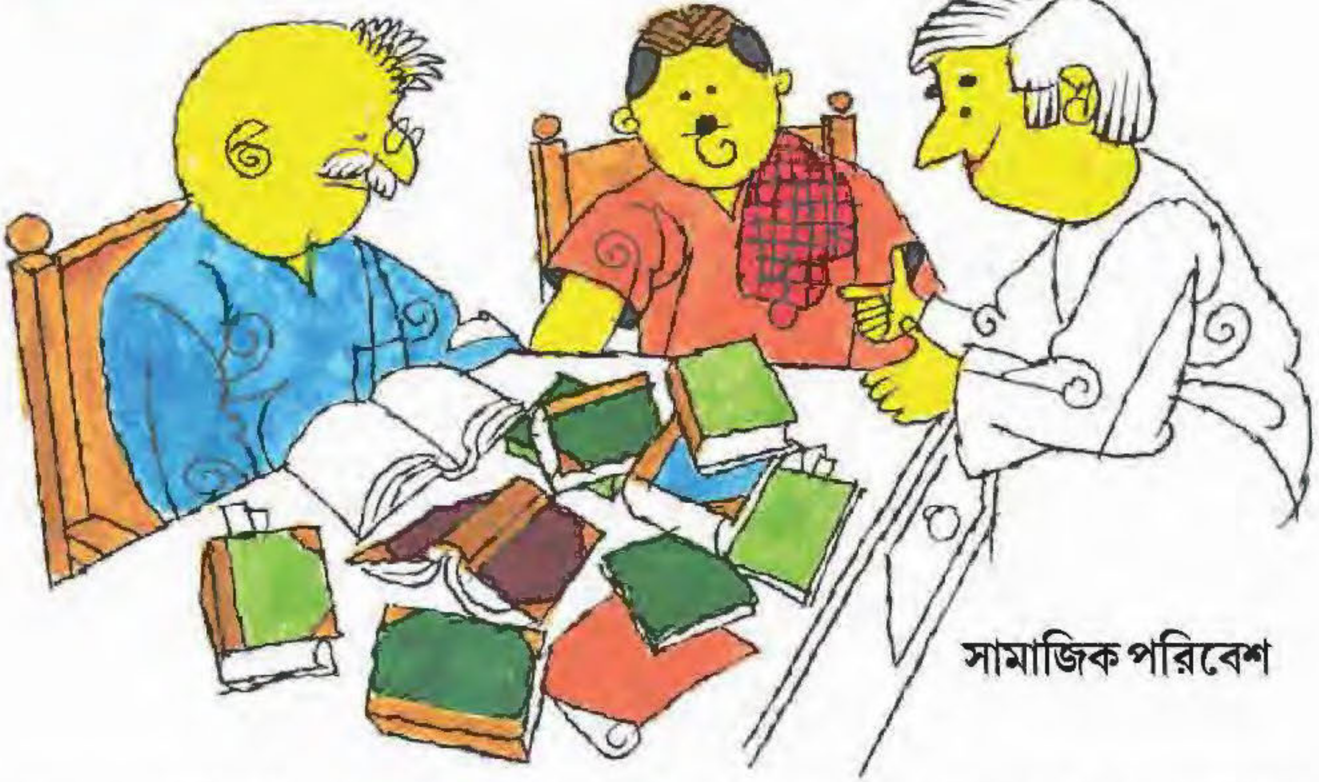

সামাজিক পরিবেশ

ফেরার পথে খুব ভিড় ছিল। বাস, লরি, মোটরগাড়ি, মোটরবাইক, রিকশার ভিড়। মানুষ তো আছেই। কষ্টেসৃষ্টে ভিড় পেরিয়ে নাসরিন বলল — দেশে এত লোক। তাই এত ভিড়। এত দূষণ। এত সমস্যা।

ইলিয়াস বলল — সবাই যদি পরিবেশের কথাটা বুঝত! আর পরিবেশটার যত্ন করত! তাহলে এত সমস্যা থাকত না।

পরদিন ক্লাসে স্যারের সামনেই জনসংখ্যার সমস্যা নিয়ে কথা উঠল।

রুবি বলল — দাদু বলেন, আসল কথা শিক্ষা। সত্যিকারের শিক্ষিত মানুষ দেশের সম্পদ। সমস্যা নয়। তাঁরা অন্যের কথা ভাবেন, বোঝেন। তাঁরা পরিবেশেরও যত্ন করেন।

স্যার বললেন — ঠিক বলেছ। তাঁরা গাছ বাঁচান, গাছ বসান। গাছের যত্ন নেন। বিপন্ন পশুপাখি পতঙ্গদের কথা ভাবেন। চারপাশের জল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করেন না। মানুষজনের পাশে থাকেন। এভাবেই সুস্থ সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। অনেক মানুষকে নিয়ে সমাজ। সবাই সমান সুযোগ নিয়ে জন্মান না। একই রকম সুযোগ পেয়েও কেউ এগিয়ে যান, কেউ পারেন না। এঁরা সবাই পাশাপাশি থাকবেন। প্রত্যেকে নিজের মতো করে বাঁচবেন। কিন্তু কেউ কাউকে ছোটো ভাববেন না। অন্য কাউকে ঘৃণা করবেন না। তবেই সামাজিক পরিবেশ সুস্থ হবে।

বিশু বলল — একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন?

স্যার হেসে বললেন — রুবি, তোমার দাদু তো এমন মানুষের উদাহরণ। তাঁর কথা বলবে নাকি সবাইকে?

রুবি বলল — দাদু ছোটোবেলায় খুব গরিব ছিলেন। সংসারের অনেক কাজ করতেন। নিজেই পড়তেন। বুঝে বুঝে পড়তেন। বন্ধুদেরও পড়া বোঝাতেন। কিন্তু তাঁরা অনেকেই নানা কারণে স্কুলে পড়তে পড়তেই লেখাপড়া ছেড়ে দেন। কেউ মাঠে মুনিষ খাটেন। কেউ বাজারে আলু বেচেন। পরে দাদু হাইস্কুলের হেডমাস্টার হয়েছিলেন। কিন্তু দাদু স্কুলের বন্ধুদের কাজকে সম্মান করেন। চাষ, বাজার-দোকান এসব ব্যাপারে তাদের মত নেন।

বলাবলি করে লেখো

অনেকেই সুস্থ সামাজিক পরিবেশ গঠনের চেষ্টা করেন। তোমার দেখা তেমন একজন মানুষের কথা লেখো :

তাঁর নাম ও ঠিকানা	
তিনি কী করেন বা করতেন	
তোমার সঙ্গে তাঁর কী ধরনের পরিচয়	
জীবিকার জন্য নয়, এমন কী কী কাজ তিনি করেন	
তিনি সুস্থ সামাজিক পরিবেশ গড়ার চেষ্টা করেন ভাবছ কেন	

স্বাস্থ্য ভালো করতে হবে

রুবির দাদুর কথা সবাই জানত। আয়ুব ভাবত, তিনি মাছের চাষ করেন। স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন শুনে অবাক হয়ে গেল। ফেরার পথে রুবিকে বলল — তুই যে বলেছিলি দাদু মাছেদের কথা অনেক জানেন!

রুবি বলল — জানেন তো। পুকুর আছে না! ছোটোবেলায় ওই পুকুরের আয়েই তো সারা বছরের অর্ধেক খরচ চলত। এবার আয়ুব বুঝল ব্যাপারটা।

সুনীল বলল — তোর দাদুর কী এখন অনেক বয়স?

— আমি যেবার ওয়ানে ভরতি হলাম, সেবার অবসর নিলেন। এখন চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি হবে। কিন্তু দেখলে মনে হবে পঞ্চাশ। এখনও সাঁতার কাটেন। রোজ আধ ঘণ্টা। আমাকে সাঁতার শিখিয়েছেন। ছুটিতে যাই। সাঁতার কাটি। এখানে পুকুর নেই। তাই এখানে সাঁতার কাটা হয় না।

— পুকুর তো আছে। তোদের বাড়ির কাছেই তো!

— ওই জল তো নোংরা। ওখানে সাঁতার কাটলে ত্বকের সমস্যা হবে! দাদুর পুকুরের জল ঝকঝকে। অথচ মাছ বোঝাই। এই খাবার দিচ্ছেন। আবার মেশিন দিয়ে জলে বাতাস গুলে দিচ্ছেন। কিছুদিন পরপর পটাশিয়াম পার-ম্যাঙ্গানেট দিচ্ছেন।

নাসরিন বলল — দাদু কি শুধুই সাঁতার কাটেন? হাঁটেন না? অন্য ব্যায়াম করেন না?

— কাজের দরকারে অনেক হাঁটেন। যাঁরা হাঁটাহাঁটি করেন না, দাদু তাঁদের বলেন ব্যায়াম করতে।

বলাবলি করে লেখো

স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য বিভিন্ন বয়সে কী কী করা ভালো? বাড়িতে, পাড়ায়, নিজেরা আলোচনা করে লেখো :

বয়স	সাঁতার কাঁটা	নির্দিষ্ট সময় টি ভি দেখা	ব্যায়াম	অনেক্ষণ কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করা	হাঁটা	সাইকেল চালানো	পরিমিত ঘুমানো	অতিরিক্ত প্যাকেটজাত খাদ্য না খাওয়া
৫-১০ বছর								
১০-১৫ বছর								
১৫-৩০ বছর								
৩০-৪৫ বছর								
৪৫-৬০ বছর								
৬০ বছরের বেশি								

পড়া আর শেখা

পরদিন ক্লাসে আগের দিনের পথের গল্প হলো। সব শুনে স্যার বললেন — রুবির দাদু প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ। উনি নানা পদ্ধতিতে শিখেছেন। শুধু বই পড়ে শেখেননি। ওঁর শেখায় পড়ার সঙ্গে বাস্তবের যোগ হয়েছে। শিক্ষা সার্থক হয়েছে।

নাসরিন বলল — শুধু বই পড়লে ভালো শিক্ষা হয় না?

— পড়ার সঙ্গে অনেক কাজ করার কথা বইতেই রয়েছে। সেগুলো করতে হবে। কী করছ তা লিখতে হবে। এমন করতে করতেই শিক্ষার সঙ্গে বাস্তবের যোগ হবে।

আয়ুব বলল— স্যার, যখন বই ছিল না, লোকে কীভাবে পড়ত?

— তখন পড়ার বদলে শোনায় জোর পড়ত। শুনে শুনে মনে রাখতে হতো। আর মুখে মুখে আলোচনা হতো। তারপর একসময় লেখা শুরু হলো। প্রথমে একরকম গাছের কান্ডের ছিলা শুকিয়ে তার উপরে লেখা হতো। কোথাও কোথাও সেই গাছের ছিলাটাকে *প্যাপিরাস* বলতো। সেই থেকেই কাগজের ইংরাজি নাম পেপার হয়েছে।

রুবি বলল— কাগজ কবে এল স্যার?

— কাগজ এসেছে অনেক পরে। চিন দেশে প্রথম কাজ তৈরি করা হয়। আমাদের দেশে তালপাতায়ও অনেকে লিখে রাখতেন। এই তালপাতায় লেখা বইগুলিকে *পুথি* বলা হয়। তবে শুধু পুথি বা বই পড়ে মানুষ সব শিখত না। রোজকার হাতেকলমে কাজের মধ্যে দিয়েও শিখত। বইতে লেখা কথা যাচাই করে নিত। রুবির দাদুও সেভাবেই বইয়ের পড়াকে হাতেকলমে যাচাই করে শিখেছেন।

— রুবির দাদুর শিক্ষায় সেভাবেই বাস্তবের যোগ হয়েছে ?
— ওঁর বইতে হয়তো তা ছিল না। তবে উনি খুব গরিব ছিলেন। পরিস্থিতি ওঁকে বাস্তবের কাছে ঠেলেছিল।
— বাড়িতে আমাকে বলে, অন্য কিছু করতে হবে না। ভালো করে লেখাপড়া করো।
— এটা ঠিক নয়। শেখার বিষয়ের একটা অংশমাত্র বইতে থাকে।
অজিত বলল — স্যার কত অংশ বইতে থাকে?
— সেটা বলা যায় না। সব বই একরকম নয়। আবার কিছুটা বই ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। তোমরা গত নয়-দশ মাস কীভাবে বই ব্যবহার করছ? যত বিষয়ে আলোচনা করার কথা বলা হয়েছে তা করেছ? তা করে লিখেছ?
কয়েকজন হাত তুলল। কেউ কেউ বলল— হ্যাঁ করেছি।
স্যার আবার বললেন— যেসব বিষয়ে পরীক্ষা করতে বলা হয়েছে, সেগুলো করেছ?

আবার কয়েকজন হাত তুলল।
স্যার এবার বললেন— বইতে করতে বলা হয়নি এমন কী কী কাজ করেছ?
স্বপ্না বলল— শুধু ধানখেত নয়, আমবাগানের আর উইঢিবির মাটি গুঁড়ো করে পরীক্ষা করেছি।
সিরাজ বলল— আমি পুকুরের পাড়ের মাটি আর জলের নীচের পাঁক নিয়ে পরীক্ষা করেছি।
এই তো চাই। বইতে যা বলা আছে তা করলে শেখা শুরু হবে। তখন দেখতে পাবে শেখার আরও কত কী আছে!

বলাবলি করে লেখো

তুমি কীভাবে শিক্ষার সঙ্গে বাস্তবের যোগ ঘটানোর চেষ্টা করছ? ভেবে লেখো :

সংসারের কী কী কাজ তুমি করো	
পরিবারের আয়ের জন্য অন্য কারো কাজ করতে হয়? হলে কী করো	
বইতে যেসব কাজ করার কথা পেয়েছ তার মধ্যে কতগুলো করেছ	
এসব কাজ করতে কেমন লেগেছে	

গীতালির সাইকেল

ক্লাসে এসে স্যার রোজই সবাইকে একবার দেখে নেন। এদিনও তাই দেখছিলেন। মনে হলো, গীতালির মুখটা থমথমে। এমনিতে ক্লাসে বিশেষ কথা বলে না। কিন্তু হাসিখুশি থাকে। কোনো কারণে দুঃখ পেয়েছে। স্যার ওর দিকে হয়তো একটু বেশিক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন।

গীতালি উঠে দাঁড়িয়ে বলল— স্যার বাড়ির কাজ করলে কেউ ভালো বলে না। বরং বাইরের কাজ করাই ভালো।

আরো দু-চার কথার পরে ব্যাপারটা বোঝা গেল। ওর দাদা রতন। ক্লাস নাইন পর্যন্ত স্কুলে আসত। বছর দুই হলো আসে না। শিবু জেঠার কাঠগোলায় কাজে ঢুকেছে। ওখানকার নিয়ম প্রথম ছ-মাস কাজ শিখবে। মাইনে পাবে না। কিছুটা শিখতে পারলে তারপর থেকে মাইনে দেবে। এক বছর পেরিয়ে গেল। কিন্তু এখনও কাজ শেখেনি। মাইনে পায় না। বাড়ি থেকে আধ কিলোমিটার দূরে যাবে। অথচ সাইকেলটা নিয়ে যাবে। সে ন-টায় ঘুম থেকে উঠে টিফিন খেয়ে চলে যাবে। গীতালি ঘরের সব কাজ করবে। তারপর দেড় কিলেমিটার হেঁটে স্কুলে আসবে।

স্যার বুঝলেন সমস্যাটা।

বলে ফেললেন— তোমার মা বাড়িতে থাকেন না?

— মা কাজে যান।

স্যার ভাবলেন, ওর একটা সাইকেল দরকার। তাই বললেন— এতটা রাস্তা হেঁটে আসতেই তোমার কষ্ট, তাই না?

— আমার স্কুল দূরে। তাই সাইকেলটা দাদু আমাকেই দিয়েছে। তাতেই দাদার রাগ। তাই মা বলেছিল, এখন দাদা নিক। দাদা মাইনে পেলে তাকে সাইকেল কিনে দেব। তখন তুমি নেবে তোমার সাইকেলটা। কিন্তু দাদা তো মন দিয়ে কাজ শিখছেই না। মাইনে পাবে কী?

স্যার আবার একটু ভাবলেন। তারপর বললেন— আগের অভিভাবক সভায় কে এসেছিলেন? তোমার মা, নাকি বাবা?

গীতালি মাটির দিকে তাকিয়ে বলল— কেউ আসেননি।

— পরেরবার তোমার মাকে আসতে বলো। আমি ওঁকে বুঝিয়ে বলব।

বলাবলি করে লেখো

গীতালি ও রতনের সমস্যার মতো অনেক সমস্যা চারপাশে দেখা যায়।

তুমি এমন যে সমস্যা দেখেছ তা নিয়ে লেখো:

সমান পরিমাণ খাদ্য	পড়াশুনা	খেলাধুলা	অন্যান্য সুযোগ সুবিধা

প্রাকৃতিক দুর্যোগ : সুনামি, আয়লা

স্কুল থেকে ফেরার পথে গীতালি বলল— অনেক সময় জোরে ঝড় আসে। সে ব্যাপারে কীভাবে সাবধান হওয়া যায়?

অজিত বলল— ঝড় বন্ধ করা যায় না। তবে যেখানে ঝড় বেশি হবে সেখান থেকে সরে যাওয়া যায়।

— কোথায় ঝড় বেশি হবে কী করে বুঝব?

— গাছপালা ঝড়ের ধাক্কা অনেকটা সামলে দেয়। কিন্তু সমুদ্র তো পুরো ফাঁকা। জোরে ঝড় আসে। কোনো বাধা পায় না। তাই ঝড়ের সম্ভাবনা থাকলে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া যাবে না। রেডিয়োতে বলে দেয়।

—সমুদ্রের ধারে যারা থাকেন?

নাসরিন বলল— তাঁদেরও সাবধান হতে হয়। সমুদ্রের ধার থেকে যতটা সম্ভব সরে আসতে হয়।

সুনীল বলল— বাড়িঘর ফেলে আসবেন?

— আগে তো মানুষ নিজেদের প্রাণ বাঁচাবে। ২০০৯ সালে খুব ঝড় হয়েছিল। তার নাম আয়লা। আমার মাসিরা সুন্দরবনে

থাকে। বাড়িঘর সব ভেঙে গিয়েছিল। তারপর আবার ছোটো বাড়ি করেছেন।

— আবার তো ঝড় আসতে পারে। আবার বাড়ি ভেঙে যেতে পারে।

— এবার পোক্ত করে ভিত দিয়েছে। একতলা বাড়ি করেছে। দোতলা-তিনতলা হলে বেশি ঝড় লাগে। ক্ষতি বেশি হয়।

পরদিন ক্লাসে সবাই মিলে এসব বলল। স্যার বললেন— ঝড়ের ব্যাপারটা তোমরা বেশ বুঝেছ। ২০০৪ সালে সুনামি হয়েছিল। সেটা ছিল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। সমুদ্রের ধারের লোকদের খুব ক্ষতি হয়েছিল।

অরূপ বলল— শুনেছি স্যার। সমুদ্রের জল উঠে এসেছিল। আমরা টিভিতে দেখেছি। উঁচু হয়ে জল ছুটে আসছে। সেবারেও অনেক ক্ষতি হয়েছিল।

— আসলে সমুদ্রের নীচে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছিল। আমাদের রাজ্যে তেমন মারাত্মক ক্ষতি হয়নি। কিন্তু দক্ষিণে তামিলনাড়ুর দিকে প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল। কোথাও তিনমিটার, কোথাও বারোমিটার উঁচুতে জল উঠে গিয়েছিল।

— তিন মিটার মানে একতলা বাড়ির ছাদ। আর বারো মিটার মানে তো চারতলা বাড়ির ছাদ!

বলাবলি করে লেখো

সুনামি ও আয়লা বিষয়ে বড়োদের সঙ্গে কথা বলো। তারপর নিজেরা আলোচনা করে লেখো :

পশ্চিমবঙ্গে সুনামিতে কী দেখা গিয়েছিল	
দক্ষিণ ও পূর্বের রাজ্যে সুনামিতে কী দেখা গিয়েছিল	
সুন্দরবনের দিকে আয়লায় কী হয়েছিল	
পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র আয়লায় কী হয়েছিল	

প্রাকৃতিক দুর্যোগ : ভূমিকম্প এবং হড়পা বান

সমুদ্রের নীচে ভূমিকম্প? এই কথাটা বুঝতে পারল না সুনীল। রাস্তায় গিয়ে অরূপকে বলল—সমুদ্রে তো জল থাকে। ভূমি মানে তো মাটি। ভূমিকম্প কী করে হবে রে?

— জল তো কয়েক কিলোমিটার গভীর। তার নীচে তো মাটি কিংবা বালি আছে। নয়তো পাথর আছে। সেইগুলোই ওলটপালট হয়ে যায়। ভূমিকম্প শুরু হয় আরও গভীরে।

— ভূমিকম্প তো বন্ধ করা যাবে না?

আকাশ বলল— তাই যেখানে বেশি ভূমিকম্প হয় সেখানকার মানুষ কাঠের বাড়িতে থাকে। কাঠের বাড়ি ভাঙে কম। ভাঙলেও ঘরের জিনিসপত্র ভাঙার সম্ভাবনা কম। জীবনহানির সম্ভাবনা কম। ওই কাঠ দিয়ে আবার নতুন বাড়িও বানানো যায়।

অজিত বলল — আমাদের এদিকে তো কাঠের বাড়ি নয়। যদি জোরে ভূমিকম্প হয়?

— ফাঁকা জায়গায় চলে যেতে হবে। সময় না পেলে টেবিলের নীচে বা খাটের নীচে ঢুকে পড়তে হবে।

অজিত বলল — বুঝেছি! দেয়াল ভেঙে পড়লে প্রথম ধাক্কাটা কাঠের উপর দিয়ে যাক!

পরদিন ক্লাসে সবাই মিলে স্যারকে এসব বলল। তারপর গীতালি বলল — আর কী প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়?

স্যার বললেন— বন্যার কথা তো সবাই জানো। অনেক জায়গায় এমনিতে বন্যা হয় না। পাহাড়ি জায়গা বা পর্বতের কাছের অঞ্চল। সেখানে হঠাৎ বন্যা হয়ে যায়। আচমকা বন্যায় লোকেরা খুব বিপদে পড়ে।

— কীভাবে? জল তো নদী দিয়ে নীচের দিকে চলে যাবে!

— আসলে নদীগুলো নুড়ি-পাথর জমে ভরাট হয়ে গেছে। হঠাৎ খুব বৃষ্টি হলে অনেক জল আসে নদীতে। অত জল নদী দিয়ে বয়ে যেতে পারে না। বন্যা হয়ে যায়। একে বলে হড়পা বান। গত কয়েক বছরের মধ্যে পুরুলিয়ায়, জলপাইগুড়ি আর উত্তরখণ্ডে এমন হয়েছে।

বলাবলি করে লেখো

ভূমিকম্প ও বন্যার ঘটনা বিষয়ে বড়োদের সঙ্গে কথা বলো। তারপর নিজেরা আলোচনা করে লেখো :

ভূমিকম্পের সময়ে কী কী সাবধানতা নেওয়া দরকার	ভূমিকম্পে কী কী ক্ষতি হতে পারে	বন্যায় কী কী ক্ষতি হয়	বন্যার সময়ে কীভাবে সাবধানতা নেওয়া দরকার

পূর্বাভাস

গীতালি বলল— ঝড়-বৃষ্টির কথা আরও আগে বলা যায় না?

স্যার একটু ভেবে বললেন— আরও আগে আবহাওয়ার পূর্বাভাসের কথা বলছ!

— আবহাওয়া মানে? পূর্বাভাস মানে?

— ঝড়-বৃষ্টি, বাতাসের ঠান্ডা-গরম, হাওয়ার গতি— এসবের আবস্থাকে একসঙ্গে বলে আবহাওয়া। আর সেসব বিষয়ে আগে থেকে জানানোকে বলে পূর্বাভাস। খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন ও ইন্টারনেটে দেখবে এমন পূর্বাভাস দেওয়া হয়। পরিবেশ দূষণের ফলে আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে। বৃষ্টির ধরন বদলাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এসব বোঝার চেষ্টা করছেন। এই বিষয়টাকে বলে আবহাওয়া-বিজ্ঞান। এই বিষয়ের গবেষণা এখনও খুব নিখুঁত হয়নি। তাই ঝড়-বৃষ্টির কথা খুব বেশি আগে বলা যায় না। তবে সুনামি কবে হবে তা আগে থেকে জানা যায়।

নাসরিন বলল— সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণের কথা অনেক আগে বোঝা যায়?

—এই বিষয়ের গবেষণা খুব উন্নত। কয়েক হাজার বছর আগে থেকে মানুষ আকাশ দেখছে। প্রায় পাঁচশো বছর আগে গ্যালিলিও গ্যালিলি টেলিস্কোপ তৈরি করেন। তারপর আকাশ দেখা উন্নত হয়। এখন আরও উন্নত। তাই এসব এত ভালো করে বলা যায়।

— পরিবেশ দূষণের জন্য সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের দিন বদলায় না?

— না। চাঁদ-সূর্য অনেক দূরে আছে। পৃথিবী থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটারের পর আর বাতাস নেই। চাঁদ আছে পৃথিবী থেকে প্রায় চার লক্ষ কিলোমিটার দূরে। আর সূর্য তার তুলনায় প্রায় চারশো গুণ বেশি দূরে। তাই সূর্য বা চাঁদের উপর পৃথিবীর পরিবেশের প্রভাব নেই।

বলাবলি করে লেখো

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কিছু পূর্বাভাস মেলে, কিছু মেলে না।
তোমার জানা এমন কয়েকটা ঘটনার কথা লেখো :

কী ধরনের দুর্যোগ	কবে হবে বলে পূর্বাভাস ছিল	কবে হয়েছিল	পূর্বাভাস পাওয়ায় ক্ষতি কতটা কমেছিল

মেঘের ছায়া, চাঁদের ছায়া ঃ দিনদুপুরে সূর্য ঢাকা

দুপুর বেলা। বেশ রোদ। হাঁটছিল আশা। সামনে একটা মেঘের ছায়া। মেঘটা ভেসে যাচ্ছে। ছায়াটাও সরে যাচ্ছে। আশা ভাবল, মেঘ ছাড়া অন্য কিছু কি দিনের সূর্যকে আড়াল করতে পারে?

ক্লাসে গিয়ে দিদিমণির কাছে জানতে চাইল।

দিদি বললেন— সূর্য আর পৃথিবীর মাঝে কী আসতে পারে? দুয়ের মাঝে আছে, রোজ একটু করে সরে যায়।

চাঁদনি বলল— চাঁদ?

— ঠিক বলেছ। সূর্যকে চাঁদ আড়াল করতে পারে। তেমন একটা ছবি আঁকো তো।

সূর্যগ্রহণের ছবি আঁকো

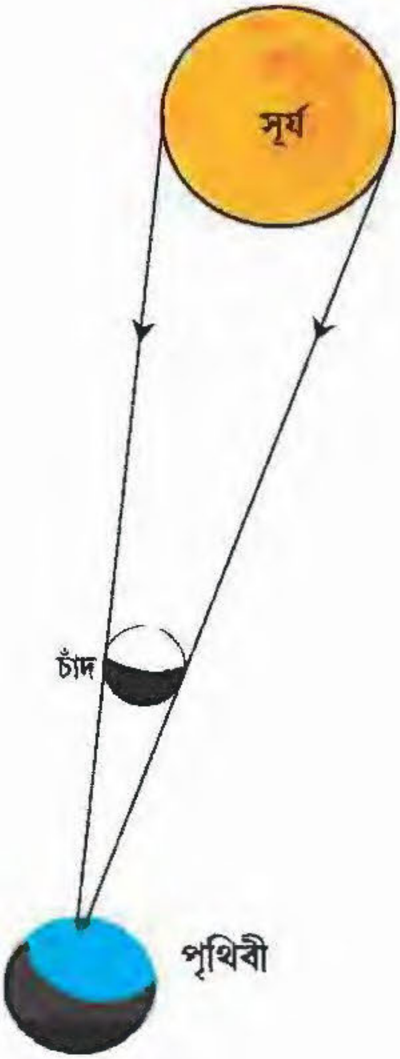

চাঁদনি ছবি আঁকল। চাঁদ রয়েছে সূর্য আর পৃথিবীর মাঝে। চাঁদের ছায়া পড়েছে পৃথিবীর খানিকটা অংশে।

দিদি বললেন— পৃথিবীর ওই জায়গার লোকেরা সূর্য দেখতে পাবে না।

এমিলি বলল — চাঁদটা যতক্ষণ ওখানে থাকবে, সূর্য আড়ালে পড়ে যাবে।

— যারা এমন দেখবে তারা বলবে সূর্যগ্রহণ হয়েছে।

আশা বলল — দিদি, বাড়িতে গিয়ে সূর্যগ্রহণের ছবি আঁকব?

— হ্যাঁ, সবাই আঁকবে।

পুরো ঢাকা, খানিক ঢাকা : পূর্ণগ্রহণ, খণ্ডগ্রহণ

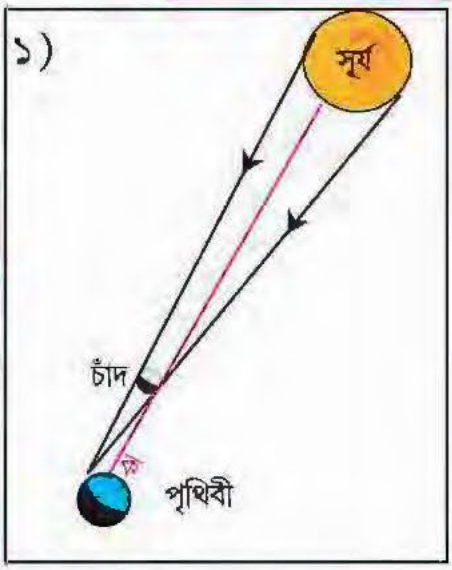

বাড়ি এসে মুজিবর সূর্যগ্রহণের ছবি আঁকল। কিন্তু ছায়াটা পৃথিবীর পাশে রয়ে গেল। কেন এমন হলো? ভালো করে ছবিটা দেখে বুঝল যে চাঁদটা পাশে আঁকা হয়ে গেছে। একটু সরিয়ে আঁকলে ছায়াটা পৃথিবীর উপর পড়ত।

স্কুলে ওর ছবিটা সবাইকে দেখাল। দিদিমণি বললেন— ধরো, পৃথিবীর উপর ক বিন্দুতে কেউ আছে। ক বিন্দু থেকে চাঁদ ঘেঁসে আমি একটা দাগ দিচ্ছি। (১নং ছবি) এই বলে দিদি একটা দাগ দিলেন। দাগটার বাঁদিকে সূর্যের একটা অংশ রইল। সবাই বুঝল— সূর্যের ওই অংশটা চাঁদের আড়ালে পড়বে। দেখা যাবে না। কিন্তু ডান দিক থেকে সূর্যের আলো ক বিন্দুতে আসবে।

আশা বলল— দিদি, সূর্যের খানিকটা দেখা যাবে।

— ঠিক বলেছ। ক বিন্দু থেকে সূর্যের খানিকটা দেখা যাবে।

— পৃথিবীতে ক বিন্দুর বাঁদিকে যারা থাকবে তারা সূর্যের আরো কম অংশ দেখবে।

— ঠিক। এরা সবাই খণ্ডগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখবে।

চাঁদনি এবার আগের দিনের মতো একটা ছবি এঁকে বলল— এই ছবিতে যে সূর্যগ্রহণ দেখেছিলাম সেটার কী নাম?

ওই ছবিতে দিদি পৃথিবীর উপর দুটো বিন্দু দেখালেন, খ আর গ। (২নং ছবি) বললেন— খ থেকে গ-এর মধ্যে থাকলে সূর্য পুরোটাই আড়ালে পড়বে। তাই ওই দুই বিন্দুর মাঝে যারা থাকবে তারা পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখবে।

তারপর দিদি পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের আর একটা ছবি আঁকলেন। সেখানে গ-এর ডান দিকে আর একটা বিন্দু ঘ দেখিয়ে বললেন — ঘ-তে থাকলে কী দেখবে? (৩নং ছবি)

আশা বলল— একটা দাগ দিয়ে দেখব?

— নিশ্চয়ই।

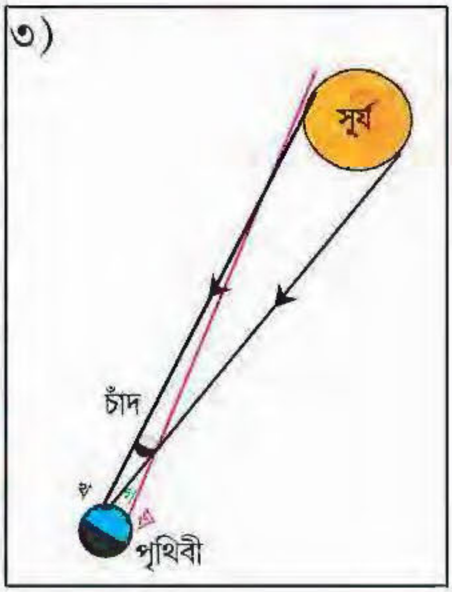

আশা ঘ বিন্দু থেকে চাঁদের গা ঘেসে স্কেল ধরে দাগ দিল। দাগটা সূর্যের পাশ দিয়ে চলে গেল। বাশার বলল— বুঝেছি। ঘ বিন্দু থেকে সূর্যের পুরোটাই দেখা যাবে।

আশা বলল— তাহলে ঘ বিন্দু থেকে সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে না।

— ঠিক বলেছ। সূর্যগ্রহণের দিন তিনরকম ঘটনা ঘটতে পারে।

বাশার বলল— পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ, খণ্ডগ্রাস সূর্যগ্রহণ অথবা কোনো গ্রহণই নয়।

মুজিবর বলল— সূর্য আর পৃথিবীর মাঝে চাঁদ থাকলে কখন গ্রহণ হবে তা এঁকে দেখব?

— এখন এঁকেই দেখো। যখন সূর্যগ্রহণ হবে তখন সত্যি সত্যি কেমন দেখায় তা দেখবে। তবে সূর্যের দিকে খালি চোখে তাকাবে না। অতিবেগুনি রশ্মি চোখে পড়তে পারে। ওই রশ্মি চোখের পক্ষে ক্ষতিকর। একরকম চশমা পাওয়া যায়। সেটা অতিবেগুনি রশ্মি আটকে দেয়। ওই চশমা পরে সূর্যগ্রহণ দেখবে।

সূর্যগ্রহণ: কোথায় কেমন? নিজে আঁকো। বুঝে নাও:

কোথায় পূর্ণগ্রহণ, কোথায় খণ্ডগ্রহণ, কোথায় গ্রহণ নয়?
স্কেল ধরে লাইন টেনে দেখাও। লেখো:

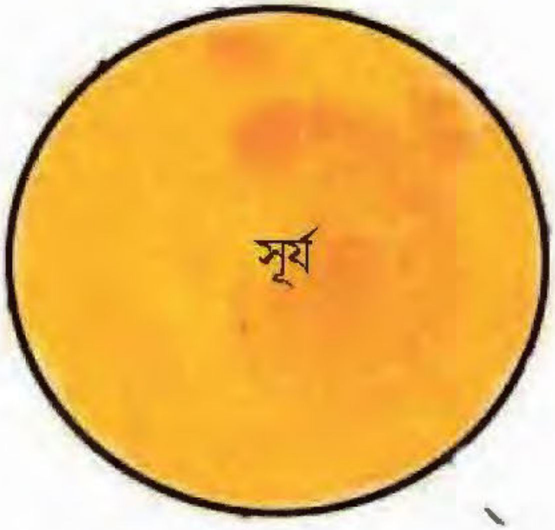

ক বিন্দুতে	
খ বিন্দুতে	
গ বিন্দুতে	
ঘ বিন্দুতে	

চন্দ্রগ্রহণ

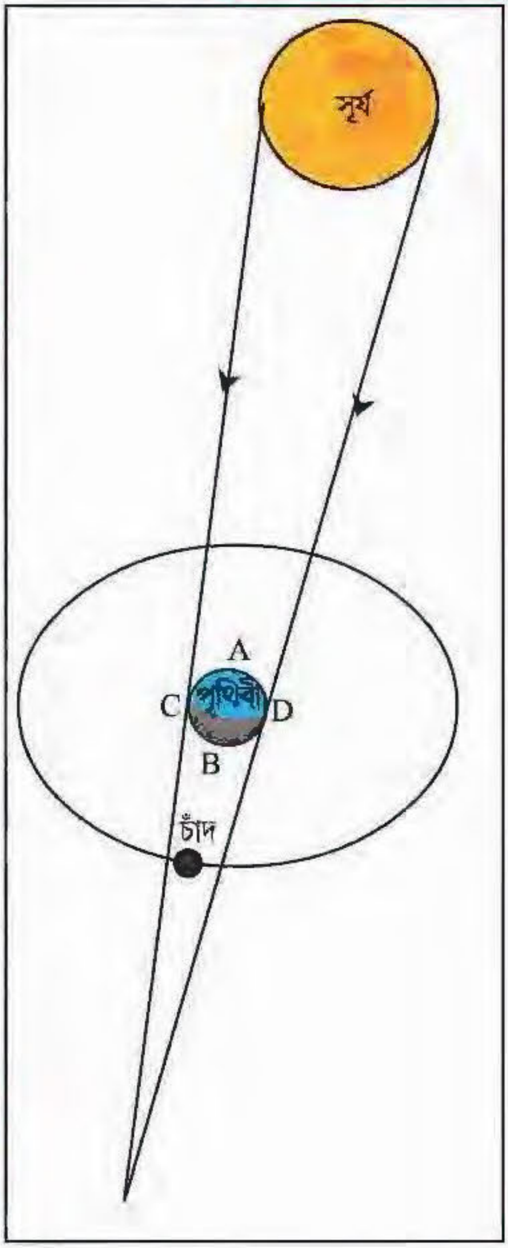

আশা বলল— চাঁদটা সরে গেলে চাঁদের ছায়া আর পৃথিবীতে পড়বেই না। তখন সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে না।

— ঠিক বলেছ। চাঁদটা পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে। পৃথিবীকে ২৯ দিন ১২ঘন্টায় ঘুরে আসে। মনে করো, এভাবে ঘুরতে ঘুরতে চাঁদটা পৃথিবীর যে দিকে সূর্য তার উলটোদিকে চলে গেল। তখন কী হবে?

— চাঁদের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়বে না।

— পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়তে পারে কী?

সবাই খুব ভাবতে লাগল। একটু পরে আশা বলল— পড়তে পারে। তখন চাঁদ দেখা যাবে না। বুঝেছি, তখন চন্দ্রগ্রহণ হবে।

সাগিনা বলল— পুরো চাঁদটা ঢাকা পড়লে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। চাঁদের খানিকটা দেখা গেলে খণ্ডগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ।

তিতলি বলল — দিদি, আমি চন্দ্রগ্রহণ দেখেছি।

— সকলেই বোধহয় দেখেছ। কোন তিথিতে দেখেছ?

সবাই ভাবতে লাগল। ফুলমণি বলল - পূর্ণিমার রাতে দেখেছি।

— ঠিক বলেছ। কতক্ষণ ধরে গ্রহণ হলো?

— অনেকক্ষণ! প্রথমে চাঁদটার খানিকটা ঢেকে গেল। একসময় পুরোটা অন্ধকার হলো। খানিকক্ষণ অন্ধকার রইল। যেন অমাবস্যা। তারপর আবার একটু একটু করে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল চাঁদটা।

— এই তো বেশ মনে রেখেছ।

এই বলে দিদি সূর্য-পৃথিবী-চাঁদের ছবি আঁকলেন। তারপর বললেন — চন্দ্রগ্রহণ দেখার সময় সূর্য-পৃথিবী-চাঁদ এইভাবে ছিল। তাই পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়েছে। তুমি পৃথিবীর কোন জায়গায় ছিলে বলত? A বিন্দুর কাছে, নাকি B বিন্দুর কাছে?

আবার সবাই খুব ভাবতে লাগল। মনসুর বলল— A বিন্দুতে থাকলে সূর্য দেখা যাবে। তখন দিন। চাঁদ কীভাবে দেখব?

সাগিনা বলল — তাই তো। চন্দ্রগ্রহণ দেখার সময় নিশ্চয়ই B বিন্দুর কাছেই ছিলাম।

— B বিন্দু থেকে কিছুটা দূরে থাকলে কী দেখবে?

আবার সবাই একটু ভাবল।

একটু পরে মনসুর বলল— B বিন্দুর দু-পাশে যেখানেই থাকি না কেন, চাঁদকে ছায়ার মধ্যেই দেখব।

দিদি C বিন্দু আর D বিন্দু দেখালেন। তারপর বললেন — C বিন্দু আর D বিন্দুর মধ্যে থাকলেই পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখবে।

এঁকে দেখো লিখে ফেলো

নীচে সূর্য, পৃথিবী আর চাঁদের ছবি আছে। লাইন টেনে দেখো চন্দ্রগ্রহণ হবে কিনা। হলে, খণ্ডগ্রহণ নাকি পূর্ণগ্রহণ হবে? লেখো :

চন্দ্রগ্রহণ ☐ (হবে / হবে না)। গ্রহণ হবে ☐ (খণ্ডগ্রাস / পূর্ণগ্রাস)

চন্দ্রগ্রহণ ☐ (হবে / হবে না)। গ্রহণ হবে ☐ (খণ্ডগ্রাস / পূর্ণগ্রাস)

চন্দ্রগ্রহণ ☐ (হবে / হবে না)। গ্রহণ হবে ☐ (খণ্ডগ্রাস / পূর্ণগ্রাস)

চন্দ্রগ্রহণ ☐ (হবে / হবে না)। গ্রহণ হবে ☐ (খণ্ডগ্রাস / পূর্ণগ্রাস)

পৃথিবী ও চাঁদের কক্ষপথ

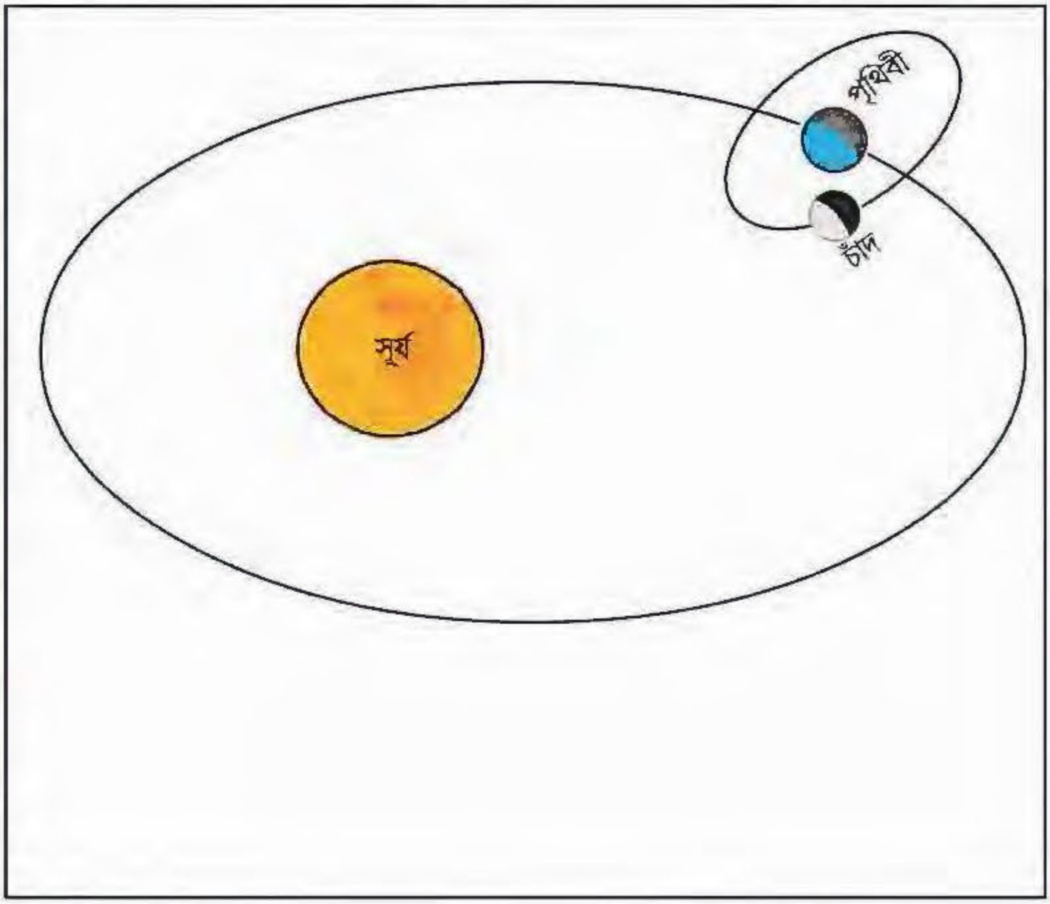

দুপুরে খাওয়ার পরে আশা বলল — কি অদ্ভুত ব্যাপার দেখ! পৃথিবী নিজের অক্ষে ঘুরছে। দিন-রাত্রি হচ্ছে। আবার চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীর চারপাশে।

মুজিবর বলল — এত ঘোরাঘুরি বোঝা মুশকিল। পরের ক্লাসে দিদিমণির কাছে সবাই মিলে এটাই জানতে চাইল।

দিদিমণি একটা ছবি দেখিয়ে বললেন — ছবিটায় সূর্য-পৃথিবী-চাঁদ ছাড়া আর কী দেখছ?

আশা বলল— পৃথিবী যে পথে সূর্যের চারদিকে ঘোরে। আর চাঁদ যে পথে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।

সাগিনা বলল— মানে, পৃথিবীর কক্ষপথ আর চাঁদের কক্ষপথ।

— ধরো, পৃথিবীর কক্ষপথটা সাইকেলের টায়ারের মতো। তবে টায়ারের মতো পুরোটা গোল নয়। অনেকটা উপরের ছবির মতো। তাহলে চাঁদেরটা কিসের মতো?

— আমরা যে রিং চালাই সেইরকম হতে পারে।

— ঠিক বলেছ। পৃথিবীটা টায়ার বরাবর সরে যাচ্ছে। তার সঙ্গে চাঁদের কক্ষপথটাও সরছে। আবার চাঁদটা নিজে সেই কক্ষপথে ঘুরছে। একটা টায়ার আর একটা রিং দিয়ে এমন বানাতে পারবে?

—আমার একটা টায়ার আছে। রিংও আছে। কিন্তু রিংটা টায়ারের মধ্যে যাবে কী করে?

মুজিবর বলল— তার দরকার নেই। একটা তার দিয়ে চাঁদের কক্ষপথটা করে নেব। তুই কাল টায়ারটা নিয়ে আসবি। আমি তার আনব। আর দু-খানা বল আনব। একটা পৃথিবী হবে, অন্যটা হবে চাঁদ ।

পৃথিবী ও চাঁদের কক্ষপথ: টায়ার আর রিং নিয়ে পরীক্ষা

পরদিন। সাগিন আর মুজিবর সব গুছিয়ে রাখল। তার বাঁকিয়ে রিং করল। সেটা চাঁদের কক্ষপথ হলো। আশা বেশ বড়ো একটা ফুটবল এনেছে। সেটা সূর্য হলো। টেবিলে সব সাজিয়ে ফেলল। দিদিমণি ক্লাসে আসার আগেই সব তৈরি।

ব্যবস্থা দেখে দিদি খুব খুশি। বললেন — এসো তো। চাঁদটা কেমন ঘুরছে দেখাও।

মেরি আর সাগিন এগিয়ে এল। মাঝারি বলটা টায়ার বরাবর নিয়ে চলল সাগিন। ছোটো বলটা রিং বরাবর ঘোরাতে ঘোরাতে চলল মেরি। বলল — চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীর চারপাশে।

দিদি বললেন — যে সময়ে চাঁদটা একপাক ঘুরে আসবে, সেই সময়ে পৃথিবী কতটা যাবে?

জন বলল — পৃথিবী পুরো পথ ঘুরবে বারো মাসে। চাঁদ ঘুরবে সাড়ে উনত্রিশ দিনে।

আশা বলল — তাহলে চাঁদ এক পাক ঘুরলে পৃথিবী ঘুরবে প্রায় বারো ভাগের এক ভাগ।

— এসো তোমরা দুজন। চাঁদ আর পৃথিবীকে তাদের কক্ষপথ ধরে সেইভাবে ঘোরাও।

জন আর আশা সেভাবে ঘোরাতে লাগল। চাঁদ বারো পাক ঘুরে গেল। তবু পৃথিবী পুরো একপাক ঘুরতে পারল না!

মুজিবর বলল — পৃথিবীও নিজের অক্ষের চারপাশে ঘুরবে। নইলে দিন-রাত্রি হবে কীভাবে?

— পৃথিবী নিজের অক্ষের চারপাশে ঘুরবে। আর একটু করে সরে যাবে। চাঁদটা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে আসবে। তার মধ্যেই পৃথিবী নিজের অক্ষে উনত্রিশটা পাক খাবে। এসো তো দুজন। সেভাবে ঘোরাও দেখি।

একহাতে চাঁদের কক্ষপথ নিল মুজিবর। অন্য হাতে পৃথিবীটা ধরল। তার নিজের অক্ষে ঘোরাতে থাকল। এভাবে ধীরে ধীরে পৃথিবীর কক্ষপথ বরাবর চলল। চাঁদটা চাঁদের কক্ষপথ বরাবর ঘোরাতে ঘোরাতে চলল বীণা।

— এই তো বেশ হয়েছে। দুজন দুজন করে এসো। সবাই এভাবে ঘুরিয়ে বুঝে নাও।

অনেকে মিলে সূর্যের চারপাশে চাঁদ ও পৃথিবী ঘোরার পরীক্ষাটা করো। টায়ার ইত্যাদির বদলে অন্য জিনিস নিতে পারো। পরীক্ষা করার পর সে বিষয়ে লেখো:

কোথায় পরীক্ষা করেছ: তারিখ: সময়:

সঙ্গে কারা ছিল:

তুমি কী কী জিনিস জোগাড় করেছিলে:

পরীক্ষা করার সময় তুমি কী ঘুরিয়েছ:

সঙ্গে কে ছিল: সে কী ঘুরিয়েছে:

সবমিলিয়ে কী কী জিনিস ব্যবহার করা হয়েছিল:

প্রথমে সেগুলো যেভাবে সাজানো ছিল তার ছবি আঁকো:

কোনটা কীসের বদলে ব্যবহার করেছ

কাজটা করার সময় কী কী অসুবিধা হয়েছে:

অন্য জিনিস নিলে সুবিধা হতো কিনা সে বিষয়ে কী মনে হয়েছে:

আর যা বলতে চাও:

কাজটা করে কী কী বুঝেছ:

জোয়ারভাটা

সবাই একবার করে সূর্যের চারদিকে পৃথিবী আর চাঁদের ঘোরা দেখানোর পরীক্ষা করল। পৃথিবী আর চাঁদ কোথায় থাকলে অমাবস্যা আর পূর্ণিমা হয় তা বুঝে নিল সবাই।

দেখেশুনে পুলক বলল — অমাবস্যা আরপূর্ণিমার দিন সমুদ্রে ও নদীতে জল খুব বাড়ে। সেটাই জোয়ার।

রাবেয়া বলল — জোয়ার কী?

— জানিস না? সমুদ্রের কাছে নদীতে জল বাড়ে। রোজই জোয়ার হয়। পরে জল কমে যায়। তাকে বলে ভাটা।

আলি বলল — কিছু নদীতে এমনিতে জল থাকে না। জোয়ারে জল আসে। তখনই নৌকা চলে। লোক যাতায়াত করে।

রাবেয়া বলল – যখন-তখন জল বেড়ে যায়? আবার কমে যায়?

— না, না। প্রায় সাড়ে বারো ঘন্টা অন্তর বাড়ে। একবার বেশি জোরালো। একবার কম জোরালো।

পরদিন ওদের কথা শুনে দিদি বললেন— চাঁদের আকর্ষণের জন্যই এমন হয়। তবে পৃথিবীর ঘূর্ণনেরও একটা ভূমিকা আছে। মুখ্য জোয়ারের মূল কারণ চাঁদের আকর্ষণ। আর গৌণ জোয়ারের মূল কারণ পৃথিবীর ঘূর্ণন।

একথা বলে দিদি একটা ছবি আঁকলেন। বললেন— পৃথিবীর যে দিকটা চাঁদের সামনে সেদিকের জল যেমন বাড়ে, পিছনের দিকের জলও বাড়ে। ফলে সেখানেও জোয়ার হয়।।

— সামনেও জোয়ার, পিছনেও জোয়ার?

— সামনে বেশি জোরালো। সেটা মুখ্য জোয়ার। পিছনেরটা কম জোরালো। তাই সেটা গৌণ জোয়ার। দুয়ের মাঝের জায়গায় ভাটা।

পুলক বলল— বাড়ার সওয়া ছ-ঘন্টা পরে কমে। তখন ভাটা।

বলাবলি করে লেখো

জোয়ারভাটা বিষয়ে আলোচনা করো। বড়োদের কাছে জেনে নাও। তারপর লেখো :

জোয়ারভাটা হয় এমন পাঁচটা নদীর নাম	
নদীগুলো রাজ্যের কোনদিকে অবস্থিত	
জোয়ারভাটা হয় না এমন পাঁচটা নদীর নাম	
মুখ্য জোয়ারের কত সময় পরে ভাটা হয়	
মুখ্য জোয়ারের কত পরে গৌণ জোয়ার হয়	
আজ দুপুর একটায় মুখ্য জোয়ার হলে কাল ক-টায় মুখ্য জোয়ার হতে পারে	

কেন সাড়ে বারো ঘণ্টা

বিশু ভাবল, পৃথিবীর যেদিকটা যখন চাঁদের সামনে তখন সেখানে মুখ্য জোয়ার। উলটো দিকে গৌণ জোয়ার। পৃথিবী এক পাক ঘোরে ২৪ঘণ্টায়। তাহলে ১২ঘণ্টা পরে পিছনটা সামনে আসবে। পরের জোয়ার হতে প্রায় সাড়ে বারো ঘণ্টা লাগে কেন? দিদির কাছে এটা জানতে চাইল।

দিদি বললেন — সেই সময়ে চাঁদও একটু সরে যায়।

কেউই ভালো বুঝতে পারল না। তা দেখে দিদি একটা ঘড়ি আঁকলেন। বারোটা বাজে। ঘণ্টার কাঁটার উপর মিনিটের কাঁটা। তারপর বললেন — আবার কখন দুটো কাঁটা এভাবে একসঙ্গে দেখা যাবে?

বিশু বলল — একটার কিছু পরে।

অমাবস্যা

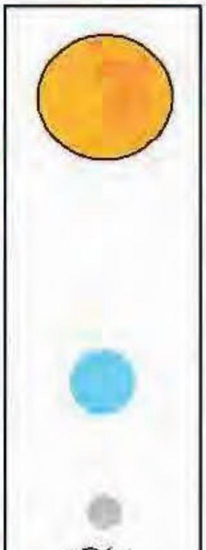
পূর্ণিমা

— একটায় নয় কেন?

আলি বলল — একটায় মিনিটের কাঁটাটা এক পাক ঘুরে আসবে। কিন্তু ঘন্টার কাঁটাও যে এগিয়ে যাবে।

— ঠিক এইরকম। চাঁদ আর পৃথিবী একই দিকে ঘোরে। পৃথিবী ১২ঘণ্টায় আধ পাক ঘুরল। ততক্ষণে চাঁদও এগিয়ে গেছে। তাই চাঁদের সামনে যেতে পৃথিবীর আরো প্রায় ২৬মিনিট লেগে যায়। গৌণ জোয়ারের ১২ঘণ্টা ২৬মিনিট পরে মুখ্য জোয়ার হয়।

পুলক বলল — অমাবস্যা-পূর্ণিমাতে জোয়ারের জল বেশি বাড়ে। কেন?

আলি বলল — তখন তো ভরা কোটাল।

— আর মরা কোটাল কোন সময়ে?

— সপ্তমী-অষ্টমীর সময়ে জোয়ারের জল বেশি ওঠে না। তখনকার জোয়ারকে বলে মরা কোটাল।

— ঠিক বলেছ। অমাবস্যায় পৃথিবীর একইদিকে সূর্য আর চাঁদ থাকে। পূর্ণিমা তারা থাকে বিপরীত দিকে। তাই ভরা কোটাল হয়। এসব নিয়ে পরে আরো ভালো করে বুঝবে।

বলাবলি করে ঠিকটা বেছে নাও

মুখ্য জোয়ার, গৌণ জোয়ার, ভরা কোটাল, মরা কোটাল বিষয়ে পড়ো। বড়োদের কাছে জেনে নাও। নিজেরা আলোচনা করো। তারপর লেখো :

জোয়ারের জল বেশি উঠবে	অমাবস্যার আগের দিন / পঞ্চমীর দিন / নবমীর দিন (ভুল দুটো কেটে দাও)
জোয়ারের জল সবচেয়ে বেশি উঠবে	যে-কোনো অমাবস্যার দিন/ সূর্যগ্রহণের দিন/ যে-কোনো পূর্ণিমার দিন (ভুল দুটো কেটে দাও)
জোয়ারের জল কম উঠবে	ভরা কোটালে / মরা কোটালে (ভুলটা কেটে দাও)
১২টার পর ঘড়ির দুটো কাঁটা এক জায়গায় হবে	১টায় / ১টা ৫মিনিটে/ ১টা ৫মিনিট ৩০সেকেন্ডে (ভুল দুটো কেটে দাও)
আজ সকাল ৯টায় মুখ্য জোয়ার হলে কাল মুখ্য জোয়ার হতে পারে	সকাল সাড়ে ১০টায়/ সকাল ৯টা ৫২মিনিটে/ রাত ১০টা ১৮মিনিটে/ রাত ১০টা ৫২মিনিটে (ভুলগুলো কেটে দাও)

সূর্যই সব শক্তির উৎস

সবাই ভাবল, সূর্যও সমুদ্রের জলকে টানে। বিশু বলল— মনে হয় গোটা পৃথিবীটাকেই টানে । চাঁদ যেমন টানে তেমনি।
পরদিন ক্লাসে দিদি বললেন- ঠিকই ভেবেছ। সূর্যও পৃথিবীকে টানে। তবে জোয়ারভাটায় চাঁদের টানের গুরুত্ব বেশি। চাঁদ পৃথিবীর অনেক কাছে আছে তো তাই।

আশা বলল— তারাগুলো পৃথিবীকে টানে না?

— সবাই সবাইকে টানে। তবে তারা বা নক্ষত্রগুলো বহু দূরে আছে। তাই টান কম।

— কত দূরে আছে? সূর্যের দ্বিগুণ?

— আরো অনেক বেশি। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসে প্রায় ৮মিনিটে। সূর্যের পর সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রের নাম প্রক্সিমা সেনটাউরি। সেখান থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে ৪বছরেরও বেশি সময় লাগে। এই বলে দিদি বোর্ডে দেখালেন সেটা কতগুণ সময়।

আলি বলল— অনেক! প্রায় ৩ লক্ষ গুণ! অন্য তারাগুলো এর থেকেও দূরে?

— হ্যাঁ, আরও বহু দূরে নক্ষত্র আছে।

বিশু বলল— সেজন্যই তারাদের এত ছোটো দেখায়! আসলে অত ছোটো নয়?

— ঠিক তাই। বহু নক্ষত্রই সূর্যের চেয়ে অনেক বড়ো। তবু তাদের বিশেষ কোনো প্রভাব পৃথিবীতে নেই। পৃথিবীর আলো-তাপ সবই সূর্য থেকে আসে। সূর্যই আমাদের সব শক্তির উৎস।

পুলক বলল— গাছের কাঠ পুড়িয়েও তাপ পাই। গাছ চাপা পড়ে কয়লা হয়েছে। কয়লা পুড়িয়ে তাপবিদ্যুৎ হয়। তাহলে কিছু শক্তি তো গাছ থেকেও পাই।

মেরি বলল— কিন্তু গাছের খাদ্য তৈরি করতে সূর্যের আলো লাগে! সূর্যের আলো ছাড়া গাছ বাড়ত না।

আশা বলল— গাছ জন্মাতই না! বীজ ফোটার তাপ কোথায় পাবে?

বিশু বলল— আর গাছ না থাকলে আমরাও থাকতাম না।

বলাবলি করে লেখো

কোন কোন কাজ করার শক্তি সূর্য থেকে পাইনি বলে মনে হয়? সেগুলো নিয়ে নিজেরা আলোচনা করে লেখো:

শক্তি বা কাজের নাম	আলোচনার সিদ্ধান্ত	কেন এমন সিদ্ধান্ত

জীবজগৎ বাঁচিয়ে রাখব আমরা

একসঙ্গে কয়েকজন স্কুল থেকে ফিরছে। দিদিও আজ ওদের সঙ্গে। শনিবার, তাই ছুটি হয়েছে তাড়াতাড়ি। বড্ড গরম। পুলক বলল— সূর্য চিরকাল এভাবে শক্তি ছড়িয়ে চলেছে?

— চিরকাল ঠিক বলা যাবে না। প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে সূর্যের জন্ম। তখন থেকেই শক্তি ছড়াচ্ছে। সেই শক্তির অল্প একটা অংশ পৃথিবীতে আসে।

— সূর্য কী এভাবে শক্তি ছড়িয়েই যাবে?

— এখনও প্রায় ৫০০ কোটি বছর ছড়াবে। তারপর একসময় সূর্যের জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে।

আশা বলল— তখন পৃথিবীর কী হবে? আমাদের কী হবে?

দিদি হেসে বললেন— সে অনেক দেরি! ৫০০ কোটি বছর মানে বুঝেছ? এই ৫০০ কোটি বছরের মধ্যে কত কিছু হয়েছে!

আলি বলল— এর মধ্যে কী কী হয়েছে?

— ডাইনোসরের নাম শুনেছ?

— হ্যাঁ দিদি। টিভিতে দেখেছি। তারা ধ্বংস হয়ে গেছে।

— তারা যখন এসেছিল আমরা ছিলাম না। কয়লা, পেট্রোলিয়াম এল কোথা থেকে? বড়ো বড়ো বন আর প্রাণীদের দেহ মাটির তলায় চাপা পড়েছে। সেখান থেকেই এগুলো এসেছে। আবার নতুন উদ্ভিদ আর প্রাণীরা এসেছে।

— জীবজগৎ যাতে ধ্বংস না হয় তার জন্য কী করা যায়?

— সেই চেষ্টাই করছি আমরা। অবশ্য পুরোটা আমাদের হাতে নেই। পৃথিবীর পরিবেশটা বুঝতে হবে। যাতে নিজেদের দোষে জীবজগতের ক্ষতি না হয় তা দেখতে হবে।

— কিন্তু অনেক কিছু আমাদের জানা নেই। কতরকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়!

— সেসব জানার জন্যই গবেষণা। তোমরাও অনেক গবেষণা করবে। জীবজগৎ টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করবে।

বলাবলি করে লেখো, আঁকো

ডাইনোসরদের সম্পর্কে বড়োদের কাছে জেনে আলোচনা করো, লেখো, আঁকো:

নানারকম ডাইনোসরের নাম লেখো	মাংসাশী ডাইনোসর কারা	ডাইনোসরের ছবি আঁকো

আকাশে কত তারা

পরদিন আলি বলল — অন্য তারাও কি সূর্যের মতো? একসময় জন্মেছে। এখন আলো দিচ্ছে। কিন্তু চিরকাল থাকবে না।

দিদি বললেন— সব নক্ষত্রেরই জন্ম-মৃত্যু আছে। অনেকটা সূর্যের মতনই।

আশা বলল — আকাশে কত নক্ষত্র আছে?

— খালি চোখে কয়েক হাজার নক্ষত্র দেখা যায়। তবে আসলে নক্ষত্রের সংখ্যা অনেক বেশি।

— হয়তো একটা নক্ষত্রের মৃত্যু হলো। তাতে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হবে না?

— না, তাতে পৃথিবীর উপর কোনো প্রভাব পড়বে না। তবে হঠাৎ কোনো নক্ষত্র আমাদের কাছাকাছি এসে পড়লে মুশকিল।

দয়াল বলল — নক্ষত্র পৃথিবীর উপর এসে পড়তে পারে?

— নক্ষত্র পৃথিবীর উপর পড়বে না। তবে অন্য কিছু পড়তে পারে। ১৯৯৪ সালে বৃহস্পতি গ্রহের উপর একটা ধূমকেতু এসে পড়েছিল। ফলে বৃহস্পতির গায়ে অনেক বড়ো বড়ো গর্ত হয়েছে।

— ধূমকেতু কি উল্কার মতো? পৃথিবী আর চাঁদের উপর যেমন উল্কা পড়েছে তেমনি?

— অনেকটা তাই। ধূমকেতু আসলে বরফ জমা পাহাড়ের মতো। ছুটে বেড়াচ্ছে আকাশে। মাঝে মাঝে সূর্যের কাছে চলে আসে। তখন তাকে দেখতে লাগে অনেকটা ঝাঁটার মতো। এমন একটা ধূমকেতুর কিছু অংশ বৃহস্পতির উপর আছড়ে পড়েছিল।

সুনীল বলল — এমন হবে সেকথা কথা আগে থেকেই বোঝা যায়, তাই না?

— যায়। বৃহস্পতির উপর ওই ধূমকেতুটা পড়বে, একথা আগেই বলেছিলেন দুজন বিজ্ঞানী। শ্যুমেকার আর লেভি। তাঁদের নামে ওই ধূমকেতুর নামও হয়েছিল শ্যুমেকার-লেভি।

— এরপর এমন কিছু হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে অনেক আগে জানা যাবে?

— আগে থেকে বোঝার জন্য কত গবেষণা চলছে! আমাদের চারপাশে আকাশের সবকিছু নিয়ে মহাবিশ্ব। এসব নিয়েই মহাকাশ বিজ্ঞান। তা নিয়ে বড়ো বড়ো বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন। তোমরাও অনেকে করবে।

গুনে আর বলাবলি করে লেখো

কয়েকটা পূর্ণিমা আর অমাবস্যার রাতে আকাশের নক্ষত্র গোনো। চারজন করে দল করো। মনে মনে আকাশটাকে চার ভাগ (পূর্ব-দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ইত্যাদি) করো। এক একজন একটা ভাগের নক্ষত্র গোনো। তারপর লেখো।

তারিখ ও তিথি	কে আকাশের কোন অংশ দেখেছ	নক্ষত্রের সংখ্যা	নক্ষত্রের মোট সংখ্যা	গোনার সময় কী কী অসুবিধা হয়েছে

আমাদের মতটাও জরুরি

ফেরার পথে নতুন আলোচনা শুরু হলো। বড়ো হয়ে কে কী করবে? সুনীল বলল — আকাশ আর তারাদের বিষয়ে জানব। আলি বলল — আমার ইচ্ছা কৃষি নিয়ে পড়া। পরিবেশ ভালো রেখে চাষ! কিন্তু বাড়ির সবাই বলে ডাক্তার হতে হবে। আশা বলল — সূর্যের আলো দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা খুব দরকার। ওই বিষয় নিয়ে পড়ব আমি।

নানাজনের নানারকম ইচ্ছা। জন বলল— আমার কী আর অত পড়া হবে! দাদা ক্লাস সিক্সের পর আর পড়েনি। কয়েক বছর একটা দোকানে ছিল। এখন ড্রাইভারি শিখেছে! আমারও ওইরকম কিছু একটা করতে হবে।

মৌমিতা প্রায়ই স্কুলে আসে না। সে বলল — কবে হঠাৎ দেখবি আমি আর আসছি না।

পরদিন ক্লাসে এসব কথা উঠল। জন, মৌমিতার কথাও হলো। দিদি সব শুনলেন। তারপর বললেন — বাড়ির লোকদের কথা শুনবে। তবে নিজের মতটাও বলবে। তোমাদের সে অধিকার আছে।

জন বলল — নিজের ইচ্ছার কথা বলা যাবে?

— নিশ্চয়ই। লেখাপড়ার বিষয়ে তো বলা যাবেই। ১৪বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া করা তোমার অধিকার। তাতে বাধা দেওয়া বেআইনি!

মৌমিতা বলল — আমিও পড়ার কথা বলতে পারব?

— নিশ্চয়ই পারবে।

পুলক বলল — আমি কী পড়তে চাই তা বলব?

— তুমি কি ঠিক করতে পেরেছ? পরে যদি অন্যরকম মনে হয়?

— তখন সেটা বলব। কিন্তু এখন যা ভাবছি সেটা এখন বলব না?

আশা বলল — 'তুই ছোটো, কী বুঝিস?' এসব কথায় আমার রাগ হয়।

— সে কথা বলা ঠিক নয়। ছোটো হলেও তারা অনেক কিছু বুঝবে। ছোটরাই তো ভবিষ্যতের ভরসা। কবি নজরুল ইসলামের একটা কবিতা আছে। একটা ছোটো ছেলে তার মাকে কী বলেছে জানো?

কয়েকজন বলে উঠল — জানি দিদি। বলছে : আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে
তোমার ছেলে উঠলে মাগো রাত পোহাবে তবে।

— এই তো জানো। তাই বলছি, তোমরাই বুঝবে। পৃথিবীর পরিবেশ, জীবজগতের ভবিষ্যৎ সবই তোমাদের হাতে।

শিশুদের কয়েকটা অধিকার:

- বেঁচে থাকা
- খাদ্য ও পানীয় জল পাওয়া
- স্বাস্থ্য ভালো রাখা, অসুখ হলে চিকিৎসা পাওয়া
- অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা লাভ
- নিজের নাম, পরিচয় জানা ও প্রকাশ করা
- নিজের মত প্রকাশ ও আলোচনার স্বাধীনতা
- মারধোর বা মানসিক পীড়ন থেকে সুরক্ষা

বলাবলি করে লিখে ফেলো

গত এক বছরের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে তুমি মত প্রকাশ করেছ। অন্যরা তাতে কী করেছে। এসব নিয়ে লেখো :

কোথায় ঘটেছে	কী বিষয়ে মত দিয়েছ	তোমার মত কী	সে বিষয়ে অন্যরা কী বলেছে	প্রাসঙ্গিক অন্য বক্তব্য

অরুণের ধান রোয়া

ধান রোয়ার সময় মাঠে খুব কাজ। অরুণের বাবা সকালে মাঠে চলে যাচ্ছেন। ফিরতে বিকেল। তাই স্কুলে যাওয়ার আগে অরুণের একটা কাজ হয়েছে। বাবার খাবারটা মাঠে পৌঁছে দেওয়া। খাবার দিতে গিয়ে অরুণ ধান রোয়া দেখল। ও ভাবল, আমি কি পারব কাজটা? আমাদের মাঠে যেদিন কাজ হবে, সেদিন দেখব। বাবাকে বলল সেকথা।

দুই মাঠে অরুণদের দুটো জমি। দুটোই এক বিঘে করে। রবিবারে একটায় ধান রোয়া হচ্ছে। অরুণ খাবার দিতে গিয়ে কিছু ধান রুয়ে দিল। খুব ভালো পারল। লাইন সোজা। দুটো চারার ফাঁক ঠিকঠাক।

রাতে বাবা বললেন— রোয়ার কাজ তো সবাই করতে পারে। কে ছোটো কে বড়ো দেখে না। দিন কয়েক স্কুল কামাই করে কাজ করবে? হাজারখানেক টাকা আয় হয়ে যাবে।

অরুণ ভাবল, টাকা তো দরকার। কিন্তু স্কুল কামাই করব কী করে! তাই বলল — স্কুলে বলে দেখি!

স্কুলে গিয়ে দিদিকে সব বলল অরুণ। দিদি বললেন — তোমার কী ইচ্ছা?

— স্কুল কামাই করতে একদম ভালো লাগে না।

— তাহলে স্কুলেই আসবে। আর একটা কথা। ছোটোদের কাজ করিয়ে আয় করা বেআইনি। বাবাকে সে কথা বুঝিয়ে বলবে।

— পরের রবিবারে যদি নিজেদের আর একটা মাঠে করি?

— সেটা আলাদা কথা। তোমার ভালো লাগলে করতে পারো। কোনো কাজ তো আর খারাপ নয়। আর একদিন করলে শেখাটা আরো নিখুঁত হয়ে যাবে।

বলাবলি করে লিখে ফেলো

খেলাধুলা আর লেখাপড়া ছাড়া অন্য কী কী কাজ করো? এ বিষয়ে লেখো :

বাড়ির কোন কোন কাজ তুমি নিয়মিত করো?	বাড়ির কোন কোন কাজ মাঝে মাঝে করো?	বাড়ির কোন কোন কাজ করতে তোমার ভালো লাগে?

আমাদের দায়িত্ব

শম্পা আর শ্যামল দুই ভাইবোন। দুজনেই ক্লাস ফাইভে পড়ে। শম্পা সকালে উঠে বিছানা গোছায়। ময়লা জামাকাপড় সাবানজলে ভেজায়। রান্নার আনাজ কাটে। কাপড় কেচে মেলে। শ্যামলকে আর বাবাকে খেতে দেয়। তারপর নিজে খেয়ে স্কুলে বেরোয়। মা অঙ্গনওয়াড়ির কাজে আগেই বেরিয়ে যায়। শ্যামল উঠতে দেরি করে। হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসে। দুই-একদিন দুধ আনে।

সেদিন ঘরে দুধ ছিল না। শ্যামল উঠতে দেরি করছে। শম্পা আনাজ কেটে হাত ধুয়ে সবে অঙ্ক নিয়ে বসেছে। মা ওকেই বললেন দুধটা আনতে। শম্পার রাগ হয়ে গেল। বলল — আমি তো এত কাজ করলাম। শ্যামলের কাজটাও আমি করব?

মা বললেন — জানিস তো ও একটু ঘুমকাতুরে। একবার ডেকেছি। উঠছে না। শম্পা আর কিছু না বলে দুধের পাত্র নিয়ে চলে গেল। কিন্তু মনে খুব দুঃখ হলো। স্কুলে গিয়ে আগে দিদিকে সব বলল। দিদি বললেন — আজ শ্যামল এসেছে তো? আমি বুঝিয়ে বলব।

ক্লাসে দিদি একটু ঘুরিয়ে ব্যাপারটা বললেন। দীপু আর দীপা। দুই ভাই-বোনের গল্প। দুধ আনার বদলে হলুদ আনতে বললেন। তারপর শ্যামলকে প্রশ্ন করলেন — বলো দেখি, দীপু কি কিছু অন্যায় সুবিধা ভোগ করছে?

শ্যামল বলল — হ্যাঁ দিদি। দোকানে ওরই যাওয়া উচিত ছিল।

আলি বলল — শুধু তাই নয়। ওর সকাল সকাল ওঠা উচিত।

সাগিন বলল — জামাকাপড় সাবানে ভেজানোটা দীপু করতে পারে।

পুলক বলল — জামাকাপড়গুলোই বা কেচে মেলে দেবে না কেন? বোন কেন অত কাজ করবে?

দিদি বললেন — এই তো চাই। তোমরা এ যুগের মানুষ। এমনই তো তোমাদের ভাবনা হবে।

বলাবলি করে লিখে ফেলো

অনেক অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে অন্যদের চেয়ে বেশি পরিবারের কাজ করে। এমন যাদের দেখেছ তাদের কথা লেখো :

নাম ও পরিচয়	পরিবারের কী কী কাজ করে	কার চেয়ে বেশি কাজ করে	সে পরিবারের কী কী কাজ করে

বয়স্কদের সম্মান করো

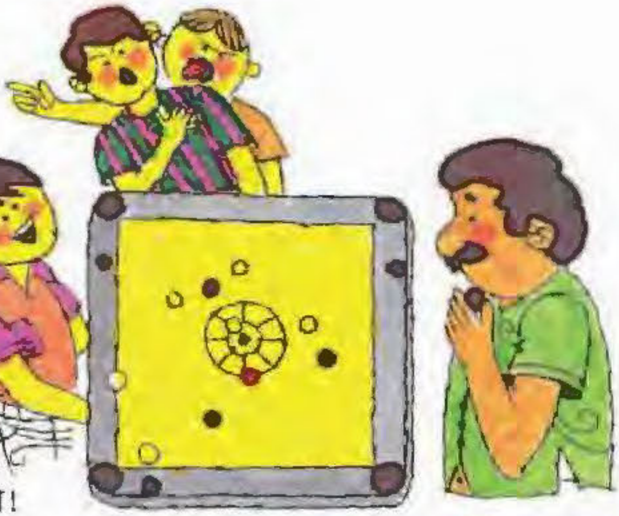

বলাইদের একটা ক্যারাম বোর্ড আছে। ওর ঠাকুরদার ছোটোবেলার। একদম মসৃণ। খেলার মজাই আলাদা। একদিন খেলা হচ্ছে। বলাইয়ের ঠাকুরদা পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বলাইয়ের বন্ধু সুমিত। ওঁকে বলল — দাদু, খেলবে আমাদের সঙ্গে ?

উনি বললেন— আমি আর কি খেলব ? তোমরা খেলো।

কিন্তু সুমিত ওঁকে টেনে নিয়ে গেল।

বলাই বিরক্ত হয়ে বলল— দাদু খেলবে? তোর জায়গা ছেড়ে দে! কথা শুনে দাদুর দুঃখ হলো। ভাবলেন, কী অসভ্য হচ্ছে! বলে কোনো লাভ হয় না। যদি আগের মতো খেলতে পারি তাহলে ওর শিক্ষা হবে! দাদু খুব চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভালো খেলতে পারলেন না। বলাই বলল — এই তোমার দোষ। হাত কাঁপছে। তাও খেলবে! উনি এবার চলে গেলেন। সুমিতও সঙ্গে গেল। তাঁর ছোটোবেলার কথা শুনতে চাইল। তাতে ওঁর একটু ভালো লাগল।

পরদিন স্কুলে সুমিত দিদিকে এসব জানাল। দিদি বললেন — ঠিক আছে। আমি দেখছি।

ক্লাসে দিদি একটা গল্প বললেন। বয়স্কা এক মহিলা। আগে ভালো রাঁধতেন। এখন খুব ভুলে যান। তরকারিতে দু-বার নুন দিয়ে ফেলেন। তাঁকে ঠাট্টা করছে ছোটোরা।

গল্পটা শুনে সবাই বলল — বয়স হলে এমন হতে পারে। কিন্তু তাঁকে অসম্মান করা অন্যায়।

দিদি বললেন — ঠিক বলেছ। সবাই বাড়ির বয়স্কদের সম্মান করো তো?

কয়েকজন 'হ্যাঁ' বলল। কয়েকজন মাথা নীচু করে বসে রইল। দিদি বললেন — বুঝেছি। কেউ কেউ হয়তো বাড়িতে একটু ভুল করেছ। এখন থেকে আর যেন ভুল না হয়।

রুবি বলল — আমার দাদুর যখন আরো বয়স হবে তখন হয়তো অনেক কিছু ভুলে যাবে। তা বলে তাঁকে অসম্মান করব?

— কখনই করবে না। আলাদা করে বাড়িতে দুটো দিবস পালন করতে পারো। ১৫ জুন বিশ্ব বয়স্ক অবমাননা প্রতিরোধ দিবস। আর ১ অক্টোবর বিশ্ব বয়স্ক দিবস।

মুজিবর বলল — পালন করব। এই দু-দিন তাঁদের কাছে তাঁদের ছোটোবেলার গল্প শুনব। তাঁরা আনন্দ পাবেন।

বলাবলি করে লিখে ফেলো

একজন বয়স্ক বা বয়স্কাকে কীভাবে তুমি সাহায্য করতে ও সম্মান জানাতে পারো তা ভেবে লেখো :

তোমার চেনা একজন বয়স্ক মানুষের নাম, তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি	তাঁর সমস্যাগুলো কী কী	তুমি কীভাবে তাঁকে সাহায্য করবে

বাল্যবিবাহ কখনও নয়

প্রভা ক্লাস ফাইভের ছাত্রী। ওর দিদি মীনা এইটে পড়ে। হঠাৎ তার বিয়ের একটা সম্বন্ধ এল। একটা রবিবারে মীনার মা বললেন — সামনের শুক্রবার তোমার বিয়ে। কি ভালো হবে বলো!

মীনা অবাক হয়ে বলল— সে আবার কী? আঠারো বছর বয়স না হলে কি মেয়েদের বিয়ে হয়?

মা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন— ওসব কথা বাদ দাও। তখন যদি ভালো পাত্র পাওয়া না যায়?

মীনা মাকে আর কিছু বলল না। প্রভাকে সব বলল। শেষে বলল— আমি এখন কিছুতেই বিয়ে করব না।

প্রভা বলল— বাবা রাগ করবে। মারতেও পারে।

মীনা বলল— মারলে মারবে। কিন্তু বিয়ে আমি করব না।

সোমবারই স্কুলে গিয়ে বড়দিকে মীনা সব বলল। সঙ্গে গেল প্রভা আর তার বন্ধু রাবেয়া। বড়দি প্রভাকে বললেন— হাতে সময় কম। তোমার বাড়ির লোকরা দিদিকে হয়তো কাল থেকে স্কুলে আসতে দেবেন না। বাড়িতে কী ঘটে আমাকে জানিয়ো।

রাবেয়া বলল— ওকেও যদি আসতে না দেয়, আমিই সব জানাব।

তারপর বড়দি স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও.)-কে ফোন করলেন, থানায়ও জানালেন।

মীনা বাড়িতে ফিরে শান্তভাবে বলল— মা, আমি এখন বিয়ে করব না। বিয়ের কেনাকাটা বন্ধ করো।

উত্তরে মা বললেন— কাল থেকে তোমার আর স্কুলে যেতে হবে না। আত্মীয়রা কাল থেকেই আসবেন।

মঙ্গলবারে প্রভা আর রাবেয়া স্কুলে গেল। বড়দিকে প্রভা বলল— দিদিকে মা স্কুলে আসতে বারণ করেছেন।

বড়দি সব বুঝলেন। বললেন— আচ্ছা। আমি দেখছি। তুমি ক্লাসে যাও।

বুধবার দুপুরে মীনাদের বাড়িতে স্থানীয় যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (জয়েন্ট বিডিও.) আর থানার দারোগাবাবু এলেন। মীনাকে আর বাড়ির বড়োদের ডাকলেন। মীনার মা সব সত্যি কথাই বললেন। হয়তো উনি অন্তর থেকে বিয়েটা চাইছিলেন না। যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বললেন— এ বিয়ে বেআইনি। বিয়ের সব ব্যবস্থা বন্ধ করুন। নাবালিকার বিয়ে দেওয়া যেমন আইনত অপরাধ তেমনি কারো অমতে বিয়ে দেওয়াও অন্যায়। সেই হিসাবে আপনারা দুটো অন্যায় করছিলেন। আর হ্যাঁ, এরপরও ওকে মারা বা বকাও কিন্তু অপরাধ। আমরা পরে আবার খবর নেব।

বাড়িতে পুলিশ আসার খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বিয়ে বন্ধ হয়ে গেল। স্কুলের সবাই জেনে গেল ব্যাপারটা।

পরদিন প্রভাকে ডেকে বড়দি বললেন— মীনাকে কাল স্কুলে আসতে বলবে। স্কুলের আগের বড়দি সব শুনেছেন। কাল উনি আসবেন। মীনার সঙ্গে আলাপ করবেন। একটা অনুষ্ঠান হবে। মীনার সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দেব।

পরদিন। স্কুলে আগের বড়দি এসেছেন। মীনা, প্রভা আর রাবেয়াকে মঞ্চে ডেকে আশীর্বাদ করলেন তিনি। তারপর বললেন — সাহসী হও। এভাবেই

রেখা কালিন্দী, সম্মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী প্রতিভা দেবী সিং পাতিল,আফসানা খাতুন, সুনীতা মাহাতো (রাষ্ট্রপতি ভবন:১৪মে, ২০০৯)

অন্যায়ের প্রতিবাদ করো।

তারপর সকলের দিকে ফিরে বললেন--- তোমরা পুরুলিয়া জেলার আফসানা খাতুন, রেখা কালিন্দী, সুনীতা মাহাতোর নাম শুনেছ? এরাও মীনার মতো সাহস দেখিয়ে কম বয়সে বিয়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল। এজন্য ওদের রাষ্ট্রপতি ভবনে ডেকে ভারতের রাষ্ট্রপতি ২০০৯ সালের ১৪মে তারিখে শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠানের একেবারে শেষে স্কুলের বড়দি বললেন— বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে রেখা, আফসানা ও সুনীতার লড়াইকে উৎসাহ দিতেই রাষ্ট্রপতি তাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। ওটাই ছিল এই ধরনের প্রথম অনুষ্ঠান। হয়তো সেই ঘটনায় সাহসী হয়েছে আরও অনেকে। তাই তারপর এই ধরনের লড়াই বেড়ে গেছে। রেখা, আফসানা, সুনীতা এবং তাদের বয়সি আরও অনেকে এখন শিশুদের অধিকার রক্ষা আন্দোলনের কর্মী হয়ে কাজ করছে। ২০১১সালের ৭ডিসেম্বর তারিখে রাষ্ট্রপতি ভবনে একই ধরনের কাজের জন্য আবার ডাক পায় রেখা, আফসানা ও সুনীতা। এবার তাদের সঙ্গে বীণা কালিন্দী, সঙ্গীতা বাউরি এবং মুক্তি মাঝিও ডাক পায়। রাষ্ট্রপতি তাদের সাহসিকতার জন্য শুভেচ্ছা জানান।

সুনিতা মাহাতো, বীণা কালিন্দী, সম্মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী প্রতিভা দেবী সিং পাতিল,সঙ্গীতা বাউরি, আফসানা খাতুন, মুক্তি মাঝি (রাষ্ট্রপতি ভবন:৭ডিসেম্বর, ২০১১)

আরো অনেকে আছে যারা শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সফল আন্দোলন করেছে ও করছে। তাদের অনেকেই বিভিন্নজনের কাছে সাহস ও বুদ্ধির স্বীকৃতি পেয়েছে। অন্যান্য জেলায়ও এমন অনেকে আছে। বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, কোচবিহারে এমন ঘটনার কথা তোমরা নিশ্চয়ই খবরের কাগজে পড়েছ। তবে স্বীকৃতিটাই বড়ো কথা নয়। অন্যায় দেখলে সবসময় তার প্রতিবাদ করবে। কারো বাড়িতে বাল্যবিবাহের সম্ভাবনা দেখলেই স্কুলে জানাবে। আমরা নানাভাবে বাড়ির লোকদের বোঝাব। দেখবে, যাঁরা আজ এই ভুল করছেন, পরে তাঁরাই বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ও মেয়েদের শিক্ষার পক্ষে প্রচার করবেন। সুনীতা মাহাতোদের গ্রাম এর উদাহরণ। সেখানকার নেতৃস্থানীয় লোকেরাও এখন বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এবং মেয়েদের শিক্ষার পক্ষে প্রচার করছেন।

যাচাই করে তবেই কেনো

একদিন মা চন্দনকে দোকান থেকে তেল আনতে বললেন। চন্দন এক প্যাকেট তেল কিনে এনে দিল। মা প্যাকেটটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কি যেন দেখতে শুরু করলেন। তারপর চন্দনকে বললেন, মনে হচ্ছে এই তেলটা ভালো নয়। প্যাকেটের গায়ে কোথাও আগ মার্কা নেই। তাই তেলটায় ভেজাল থাকতে পারে। যাও এখনই ফেরত দিয়ে এসো। তখন মা চন্দনকে একটা মশালার প্যাকেটের গায়ের আগ মার্কাটা দেখালেন। এবার চন্দন দোকানে গিয়ে আগ মার্কা দেখেই তেলের প্যাকেট কিনে আনল।

পরে মা চন্দনকে বললেন, কেনাকাটার সময় আমাদের সবসময় সচেতন থাকা দরকার। যাতে আমরা ঠকে না যাই। তবে যাই কেনাকাটা করা হোক তার রসিদ নেওয়া দরকার। দেখা দরকার রসিদে যেন জিনিসের নাম, পরিষেবার বিবরণ আর তারিখ থাকে। চন্দন জিজ্ঞাসা করল-মা পরিষেবা কি? মা বললেন-পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সরবরাহ প্রভৃতি সরবরাহ প্রভৃতি একধরনের পরিষেবা। এছাড়া সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে টাকার বিনিময়ে চিকিৎসা নেওয়াও পরিষেবা। এককথায় যা কিছু টাকার বিনিময়ে কেনাকাটা করা হয় সবই হল পরিষেবা। আর যারা এই পরিষেবা নেয় বা ভোগ করে তারা হল উপভোক্তা।

APPROVED BY : ISI | ভারত সরকার GOVERNMENT OF INDIA | FPO | Bureau of Indian Standards | SILK MARK®

চন্দন বলল, -তার মানে আমি একজন উপভোক্তা। মা বললেন-ঠিক। তাহলে দেখো দোকানদার আমাদের পরিষেবা দিচ্ছেন। তারপর মা চন্দনকে কিছু প্যাকেট আর শিশি এনে দেখালেন। জেলির শিশিতে ভারত সরকারের F.P.O ছাপ দেখালেন। ঘি-এর শিশির গায়ে আগ মার্কা, প্রেসার কুকারের প্যাকেটে ISI ছাপও দেখালেন।

মা বললেন, কোনো জিনিস বা পরিষেবা নিজের ব্যবহারের জন্য দাম দিয়ে আমরা কিনি। কেনার পর জিনিসটার দাম, ওজন, পরিমাপ বা মান নিয়ে ঠকে গেলে বা পরিষেবার ঘাটতি হলে সেটা নিয়ে উপভোক্তা সুরক্ষা আইনে আবেদন করা যায়। চন্দন বলল- আবেদন করলে টাকাও ফেরত দিতে পারে? মা বললেন - হ্যাঁ, একদম তাই। জিনিসটা বদলে দিতে পারে। ক্ষতিপূরণও দিতে পারে। চন্দন বলল -দোকানদার যদি ওজনে কম দেয় তাহলে কোথায় নালিশ করতে পারি মা? মা বললেন - ডিস্ট্রিক্ট কনজ্যুমার ডিসপিউটস রিড্রেসাল ফোরাম বা সংক্ষেপে জেলা উপভোক্তা ফোরামে। তাছাড়া উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের ওয়েবসাইট থেকেও দরকারি তথ্য পাওয়া যেতে পারে। তবে তার আগে সবরকম প্রমাণ যোগাড় করে রাখতে হবে। প্রায়ই দেখা যায় যে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে উপভোক্তারা তাদের অভিযোগ ঠিকভাবে তুলে ধরতে পারে না। তার ফলে যথাযথ প্রতিকারও পান না।

বলাবলি করে লেখো

নিচের জিনিসগুলো কেনার সময় কি কি বিষয় নজর দেওয়া দরকার বলে মনে করো তা লেখ।

জিনিসপত্রের নাম	কি কি বিষয় নজর দেওয়া দরকার
১। বাল্ব / জামা	
২। আচার / বোতলে ভরা ফলের রস	
৩। মাখন / বেবিফুড	
৪। গ্যাস সিলিন্ডার/ কাপড় মাপার স্কেল	

রাস্তার কলের জল

সাবিনাদের স্কুল বাড়ি থেকে পনেরো- ষোলো মিনিটের হাঁটাপথ। এদিকে অটো চলে না। তিনদিন অসুখের পর সাবিনা স্কুলে যাবে। ওর মা বললেন— চলো। আমি তোমাকে দিয়ে আসি।

পথে সাবিনা দেখল একটা কল খোলা। জল পড়ে যাচ্ছে। কেউ জল নিচ্ছে না। এরকম কল বন্ধ করে দেয় সাবিনা। সাত-আট মাসের অভ্যাস। সে গেল কল বন্ধ করতে।

মা অবাক হয়ে বললেন— অসুস্থ শরীরে এসব কী?

সাবিনা বলল— মা জল নষ্ট হলে সর্বনাশ। আমরা যখন বড়ো হব তখন খাবার জল পাওয়া কঠিন হবে।

মিনিট দুই হাঁটার পর আবার একটা কল খোলা। সাবিনা আবার গেল। এবারে মা একটু অধৈর্য। বললেন — সবাই কল খুলে রেখে যাবে। আর তুমি সব বন্ধ করবে? কলটা যদি ভাঙা থাকে তাহলে কি মিস্ত্রি ডাকতে যাবে?

সাবিনা বুঝল মা খুব রেগে গেছেন। তাই মুখ নীচু করে বলল— প্রথম প্রথম ভাঙা কল দেখলে খুব কষ্ট হতো। এখন ওইরকম দেখলে বড়দিকে জানাই। বড়দি পৌরসভায় ফোন করে খবর দেন।

সাবিনা চুপ করে হাঁটতে লাগল। ভাবতে লাগল, আর কোনো কল যেন খোলা না থাকে।

কিন্তু হায়! স্কুলের কাছে, রাস্তার শেষ কলটাও খোলা। মায়ের দিকে তাকাল। এবার মা নিজেই কলটা বন্ধ করতে গেলেন। তা দেখে সাবিনার খুব আনন্দ হলো। সে এবার বলল — মা, কবি নজরুল ইসলাম আমাদের কী ভাবতে বলেছেন জানো?

আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে
তোমার ছেলে উঠলে মাগো রাত পোহাবে তবে।

আমরা সকলে মিলে জল, মাটি, বাতাসের যত্ন করব। সচেতনভাবে এগুলোর যথাযথ ব্যবহার করব। তৈরি করব সুস্থ সামাজিক পরিবেশ। সেই সমাজে কোনোরকম বিভেদ থাকবে না। তফাত থাকবে না ছেলের ও মেয়ের। গায়ের রং বা জীবিকা দেখে কেউ মানুষের বিচার করবে না। গরিব বা বড়োলোক বলে সুযোগ সুবিধা পাওয়ার হেরফের হবে না। শহর, গ্রাম ও জঙ্গল সব জায়গাতেই সমস্ত মানুষ সমানভাবে সুযোগ-সুবিধা পাবে। সেভাবেই গড়ে উঠবে নতুন সমাজ ও পরিবেশ-ভাবনা।

আমার পাতা-১

এই বই তোমার কেমন লেগেছে? লিখে, এঁকে বুঝিয়ে দাও :

আমার পাতা-২

এই বই তোমার কেমন লেগেছে? লিখে, এঁকে বুঝিয়ে দাও :

আমাদের পরিবেশ
পাঠ্যসূচি

১. মানবদেহ

ক) মানবদেহে ত্বকের গঠন ও গুরুত্ব।
খ) ত্বকের উপবৃদ্ধি চুল, লোম, নখ।
গ) অস্থি, অস্থিসন্ধি, পেশি।
ঘ) মানবদেহের হৃৎপিণ্ড।
ঙ) মানবদেহে বায়ু ও জলবাহিত রোগ (যক্ষ্মা ও কলেরা)

২. ভৌতপরিবেশ: মাটি

ক) মাটির উপাদান।
খ) মাটি ও খাদ্য উৎপাদন।
গ) মাটির ক্ষয়।

ভৌত পরিবেশ: জল

ক) স্থানীয় জলাশয়ের বৈচিত্র্য।
খ) জলাশয়ের মানচিত্র।
গ) জলদূষণ ও শোধন।
ঘ) স্থানীয় ব্যবহার্য জলের উৎসের প্রকারভেদ ও মানচিত্র।
ঙ) মাটির নীচের জল ও তার অপচয়।
চ) জলসংকট।
ছ) আঞ্চলিক জলাভূমি ও জল সংরক্ষণের ইতিহাস।

ভৌত পরিবেশ: জীববৈচিত্র্য

ক) উদ্ভিদ ও প্রাণী।
খ) বন্য ও পালিত জীব
গ) স্থানীয় উদ্ভিদের খোঁজখবর
ঘ) স্থানীয় প্রাণীর খোঁজ খবর।
ঙ) মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী।
চ) স্থানীয় কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণীর আকর্ষণীয় আচার-আচরণ।
ছ) স্থানীয় জীবের অবলুপ্তির কারণ।

৩. পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ পরিচিতি

ক) পশ্চিমবঙ্গের ভূমিরূপ।
খ) পশ্চিমবঙ্গের নদ ও নদী।
গ) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সদর ও অন্যান্য শহর

৪. পরিবেশ ও সম্পদ

ক) সম্পদ সৃষ্টির উপাদান।
খ) স্থানীয় মানুষের জ্ঞান সম্পদ।
গ) সংস্কৃতির ইতিহাস।
ঘ) আঞ্চলিক মানব ঐতিহ্য।
ঙ) সম্পদের সর্বজনীন ও সমান অংশীদারিত্ব।

৫. পরিবেশ ও উৎপাদন: কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন

ক) কৃষিকাজ পদ্ধতির ইতিহাস।
খ) আঞ্চলিক কৃষি বৈচিত্র্য
গ) স্থানীয় ভিত্তিক উৎপন্ন ফসল মানচিত্র নির্মাণ।
ঘ) স্থানীয় মাছের বৈচিত্র্য।
ঙ) স্থানীয় মাছের বৈচিত্র্য ও সংকট।
চ) মাছ ধরার পদ্ধতির ইতিহাস।

৬. পরিবেশ ও বনভূমি

ক) বনের উপাদানসমূহ।
খ) বনের ইতিহাস।
গ) স্থানীয় বনখণ্ড ও তার ইতিহাস
ঘ) বন্যপ্রাণী সুরক্ষা।

৭. পরিবেশ, খনিজ ও শক্তি সম্পদ

ক) কয়লা ও কয়লা সৃষ্টির ইতিহাস।
খ) কয়লার ব্যবহার ও বায়ুদূষণ
গ) কয়লার উত্তোলন ও সমস্যা
ঘ) প্রচলিত ও অপ্রচলিত শক্তি ব্যবহার ও সম্ভাবনা।

৮. পরিবেশ ও পরিবহণ

ক) সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব।
খ) পরিবহণ ব্যবস্থার ইতিহাস।
গ) আঞ্চলিক পরিবহণ মাধ্যমের মানচিত্র নির্মাণ।
ঘ) দূষণ ও পরিবেশবান্ধব পরিবহণ।

৯. জনবসতি ও পরিবেশ

ক) জলসম্পদ ও তার যথার্থ ব্যবহার।
খ) জনসম্পদ ও স্বাস্থ্য।
গ) জনসম্পদ ও শিক্ষা।
ঘ) বৈষম্য ও সমতা।
ঙ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নিরাপত্তা।

১০. পরিবেশ ও আকাশ

ক) সূর্যগ্রহণ।
খ) চন্দ্রগ্রহণ।
গ) চাঁদ, সূর্য ও পৃথিবীর গতিপথ।
ঘ) জোয়ার ভাটা।
ঙ) সূর্য সকল শক্তির উৎস।
চ) নক্ষত্র মণ্ডল।

১১. মানবাধিকার ও মূল্যবোধ

ক) শিশুর অধিকার।
খ) শিশুশ্রম ও মানবাধিকার।
গ) লিঙ্গ বৈষম্য ও মানবাধিকার।
ঘ) বার্ধক্য ও মানবাধিকার।
ঙ) বাল্যবিবাহ ও মানবাধিকার
চ) ক্রেতা সুরক্ষা

তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি	
১) প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন : মানবদেহ, ভৌত পরিবেশ (মাটি, জল ও জীববৈচিত্র্য)।	(পৃ.১—৫৭)
২) দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন : পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ পরিচিতি, পরিবেশ ও সম্পদ, পরিবেশ ও উৎপাদন।	(পৃ.৫৮—১১৩)
৩) তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন : পরিবেশ ও বনভূমি, পরিবেশ খনিজ ও শক্তি সম্পদ, পরিবেশ ও পরিবহণ, জনবসতি ও পরিবেশ, পরিবেশ ও আকাশ, মানবাধিকার ও মূল্যবোধ।	(পৃ.১১৪—১৭৮)

প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য সক্রিয়তামূলক কার্যাবলী	প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নে ব্যবহৃত সূচকসমূহ
১) সারণি পূরণ	১) অংশগ্রহণ
২) ছবি বিশ্লেষণ	২) প্রশ্ন ও অনুসন্ধান
৩) তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ	৩) ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য
৪) দলগত কাজ ও আলোচনা	৪) সমানুভূতি ও সহযোগিতা
৫) কর্মপত্র পূরণ ও সমীক্ষার বিবরণ	৫) নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ
৭) সঙ্গী মূল্যায়ন ও স্ব-মূল্যায়ন	
৮) হাতের কাজ ও মডেল প্রস্তুতি	
৯) ক্ষেত্র সমীক্ষা (Field work)	

প্রশ্নের নমুনা

(এই ধরনের নমুনা অনুসরণ করে পার্বিক মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র তৈরি করা যেতে পারে। প্রয়োজনে অন্যান্য ধরনের প্রশ্নও ব্যবহার করা যেতে পারে। কী কী ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে তার একটি নকশা দেওয়া হলো।)

১. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো। (প্রশ্নের মান - ১)

(i) হৃৎপিণ্ডের শব্দ বোঝা যায় যে যন্ত্রে তা হলো (a) থার্মোমিটার (b) স্টেথোস্কোপ (c) ব্যারোমিটার (d) ফোটোমিটার

(ii) মাছের বাজারে গেলে নীচের কোন মাছটি আর সহজে চোখে পড়ে না (a) রুই (b) বাটা (c) কাতলা (d) ন্যাদোস

(iii) নীচের কোনটি অপ্রচলিত শক্তি (a) সৌরশক্তি (b) জৈব গ্যাস (c) বায়ুপ্রবাহ (d) সবগুলি

(iv) ORS বানাতে নীচের কোনটি লাগে (a) নুন ও জল (b) নুন ও চিনি (c) চিনি ও জল (d) নুন, চিনি ও জল

(v) উত্তর ২৪ পরগনার নদী হলো (a) বিদ্যাধরী (b) কুলিক (c) তোর্সা (d) দামোদর

২. ঠিক বাক্যের পাশে '✓ ' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও। (প্রশ্নের মান - ১)

(i) ট্যাংরা মাছের আঁশ নেই। (ii) সমভূমি অঞ্চলে সিঁড়ির মতো জমি তৈরি করে ধানচাষ করা হয়। (iii) গাঙ্গেয় সমভূমির উত্তর অংশটার বিরাট বন হলো সুন্দরবন। (iv) আসানসোল-রানিগঞ্জে লোহার খনি দেখা যায়। (v) কয়লার ধোঁয়ায় সালফারের অক্সাইড গ্যাস থাকে না। (vi) আত্রেয়ী নদীর পশ্চিমপাশে অবস্থিত শহর হলো বালুরঘাট। (vii) পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট জলশোধন করে। (viii) মরা নদী থেকে জলাভূমি তৈরি হয়। (ix) মালভূমির উচ্চতা ২০০ মিটারের বেশি।

৩. বাম ও ডানদিকের স্তম্ভ মেলাও। (প্রশ্নের মান – ১)

বাম দিকের স্তম্ভ	ডান দিকের স্তম্ভ
(i) টাইগার হিল	(a) নরম কাণ্ডের গাছ
(ii) কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত বিস্তৃত হাড়	(b) দার্জিলিং জেলা
(iii) টিয়াপাখি	(c) হিউমেরাস
(iv) কলা ও পেঁপে	(d) বন্যপ্রাণী
(v) শিক্ষক দিবস	(e) সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের জন্মদিন

৪. শূন্যস্থান পূরণ করো। (প্রতিটি শূন্যস্থান পূরণের মান - ১)

১. ত্বকের উপরের স্তরে ________ থাকে না। ২. গাছ সার থেকে ________ , ________ ও ________ উপাদান বেছে নেয়। ৩. সাপ, বেজি ও চড়াই ________ প্রাণী। ৪. পৃথিবীর প্রায় সব সভ্যতাই ________ ধারে গড়ে উঠেছিল। ৫. পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ ________। ৬. তিস্তা ও ________ নদীর তীরবর্তী শহর হলো জলপাইগুড়ি। ৭. ________ মোরব্বার শহর। ৮. অলিখিত জ্ঞানসম্পদ সাধারণত ________ সম্পদ। ৯. খুব অল্প বয়সে দুই বন্ধু লড়তেগেছিলেন দেশের জন্য। এঁরা হলেন ________ ও ________। ১০. ________ভারতের সংবিধান রচনা করেছিলেন।১১. ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের ________ দিবস। ১২. বীরসা মুন্ডা, সিধু ও কানহু, ________ ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। ১৩. চায়ের কাজে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে ________ ব্যবহার করা হয়। ১৪. ________ নদীকে কেন্দ্র করে ডিভিসি তৈরি করা হয়েছিল। ১৫. ________ একটি সামুদ্রিক মাছ। ১৬. ________ শিশুর একটি মৌলিক অধিকার।

৫. একটি বাক্যে উত্তর দাও। (প্রশ্নের মান – ১)

১. শরীরের কোন জায়গার চামড়া খুব পাতলা? ২. চামড়ায় মেলানিন থাকার সুবিধা কী? ৩. হৃদপিণ্ড কীভাবে রক্তকে মানবদেহের সর্বত্র পাঠিয়ে দেয়? ৪. থুথু থেকে কোন রোগের জীবাণু ছড়ায়? ৫. মাটিতে প্লাস্টিক থাকলে গাছের শিকড়ে কী সমস্যা হয়? ৬. মাটির নীচে পানীয় জল কোন কাজে ব্যবহারের ফলে বেশি নষ্ট হয়? ৭. কলকাতার জলাভূমি কোন নদীর অংশ? ৮. ইঁদুরকে তুমি কেন বন্যপ্রাণী বলবে? ৯. পিঁপড়ে ছাড়া কোন প্রাণী পরিবেশের পরিবর্তন বুঝতে পারে? ১০. বাঁকুড়া জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রের কোনদিকে তুমি চিহ্নিত করবে? ১১. কোন জেলায় বেড়াতে গেলে তুমি অজয় নদ দেখতে পাবে? ১২. নদীতীরের কোন সভ্যতার কথা তুমি জানো বা পড়েছ? ১৩. নবদ্বীপ শহর প্রসিদ্ধ কেন? ১৪. তোমার কাছাকাছি অঞ্চলে কোন উৎসব হয়? ১৫. অরণ্য সপ্তাহে কী করা হয়? ১৬. উত্তরবঙ্গের বনভূমি কোন প্রাণীর জন্য বিখ্যাত? ১৭. ঘুনি কী কাজে লাগে? ১৮. পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ কখন দেখা যায়? ১৯. মুখ্য কোটাল ও গৌণ কোটাল কী? ২০. কোন অতিকায় প্রাণী পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে? ২১. খুব সম্প্রতি শিশুদের কোন মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে?

৬. দুই-তিনটি বাক্যে উত্তর দাও। (প্রশ্নের মান – ২)

১. গোড়ালির চামড়া পুরু হয় কেন? ২. ফোসকা কীভাবে পড়ে? ৩. চামড়ার রং দেখে মানুষের ভেদাভেদ এক ধরনের অপরাধ—ব্যাখ্যা করো। ৪. গায়ে রোদ লাগলে ভালো কেন? ৫. নখের যত্ন না নিলে কী কী সমস্যা হতে পারে? ৬. রক্তাল্পতার দুটি লক্ষণ উল্লেখ করো। ৭. মানুষের শরীরে দুটি জায়গার নাম লেখো যেখানে বড়ো ও ছোটো হাড় দেখা যায়। ৮. হাড় ভালো রাখা যায় কীভাবে? ৯. জিভের পেশি কী কী কাজ করে? ১০. যক্ষ্মা রোগ কী কী ভাবে ছড়ায়?১১. মাটির অস্বাভাবিক উপাদানের উৎস কী? ১২. লেন্দ কী? ১৩. বিভিন্ন মাটির জলধারণের ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন কেন? ১৪. মাটির পুষ্টিতে কোন কোন খনিজ উপাদান খুব গুরুত্বপূর্ণ ও কেন? ১৫. পাথর ফেটে কীভাবে মাটি তৈরী হয়? ১৬. ভূমিক্ষয়ের ফলে প্রধান সমস্যাগুলি কী কী? ১৭. জলে কী কী ভাবে

নোংরা এসে পড়ে? ১৮. জলশোধনের নানা পদ্ধতিগুলির নাম বলো। ১৯. মাটির নীচে জল আসার পদ্ধতিগুলি উল্লেখ করো। ২০. ব্যবহৃত জলকে কী কী কাজে আবার ব্যবহার করা যায়? ২১. জলাভূমির দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। ২২. সমাজজীবনে জলাভূমির গুরুত্ব কী? ২৩. কে বন্য আর কে পোষা—তুমি কী করে বুঝবে? ২৪. গাছ চিনলে কী কী সুবিধা তুমি পেতে পারো? ২৫. তোমার জানা ঝোপ-জঙ্গলের কয়েকটি বন্যপ্রাণীর নাম লেখো। ২৬. চিংড়িকে মাছের থেকে কোন কোন বৈশিষ্ট্য দিয়ে আলাদা করা যায়? ২৭. পিঁপড়ের আচরণের দুটি গুরুত্ব উল্লেখ করো। ২৮. তোমার দেখা দুটি প্রাণীর আকর্ষণীয় আচরণ উল্লেখ করো। ২৯. শকুনের সংখ্যা হঠাৎ খুব কমে যাওয়ার কারণ কী কী? ৩০. তোমার অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যের দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। ৩১. কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের বেশি ব্যবহারে কোন কোন জীববৈচিত্র্য হ্রাস পেতে পারে বলে তোমার মনে হয়? ৩২. রাঢ় অঞ্চলের ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য কী? ৩৩. বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ মানুষ কীভাবে করেছিল? ৩৪. উত্তরবঙ্গের জঙ্গলের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করো যেগুলো পশ্চিমদিকে গেলে দেখা যায় না? ৩৫. বিষ্ণুপুর শহরকে কেন্দ্র করে কোন কোন সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছে? ৩৬. পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন শহর কৃষিবাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত? ৩৭. প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষ কী কী সম্পদ তৈরিতে ব্যবহার করেছে তা দুটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও। ৩৮. সমাজ সংস্কারে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার অবদান কী কী? ৩৯. রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরকে আমরা আজও স্মরণ করি কেন? ৪০. ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষদের লড়াইয়ের দুটি ঘটনা উল্লেখ করো। ৪১. চাষের কাজ কীভাবে শুরু হয়েছিল? ৪২. আধুনিক চাষে কী কী পরিবর্তন ঘটেছে? ৪৩. ডিভিসি করার ফলে কী সুবিধা ও সমস্যার সৃষ্টি হলো? ৪৪.পঞ্চায়েত কীভাবে লুপ্তপ্রায় মাছ বাঁচাতে পারে? ৪৫.তোমার এলাকায় জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করা হলে ভবিষ্যতে কী কী সমস্যা হতে পারে? ৪৬. কয়লা ও পেট্রোলিয়াম কীভাবে তৈরি হয়? ৪৭. কয়লাখনিতে ধসের ভয় কীভাবে কমানো যেতে পারে? ৪৮. জলের স্রোত থেকে কীভাবে বিদ্যুৎ তৈরি হয়? ৪৯. সূর্যের শক্তিকে আমরা প্রাত্যহিক জীবনে কীভাবে কাজে লাগাই? ৫০. অপ্রচলিত শক্তি কোনগুলো এবং কেন? ৫১. ট্রেন চালানোর সময় চাকা ঘোরানো কীভাবে শুরু হয়েছিল? ৫২. ট্রেনে চড়ে যাতায়াতের ফলে কী কী সুবিধা পাওয়া গিয়েছিল? ৫৩. অল্প বয়সে স্বাস্থ্য ভেঙে গেলে কী কী সমস্যা হতে পারে? ৫৪. তোমার অঞ্চলে বৈষম্যের কোন কোন ঘটনাতুমি দেখেছ তা উল্লেখ করো। ৫৫. ভূমিকম্পের ফলে কী কী সমস্যা হতে পারে? ৫৬. সূর্যগ্রহণের সময় কতরকম ঘটনা ঘটে? ৫৭. জোয়ারের কারণ কী কী? ৫৮. সূর্যের আলো ঠিকমতো না পেলে গাছের কী কী সমস্যা হয়? ৫৯. 'ছেলে ও মেয়েরা নানাকাজ সমানভাবে করে ও করতে পারে'— উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও। ৬০. বাল্যবিবাহের কোনো ঘটনা তুমি জানতে পারলে কী করবে? ৬১. তোমার জানা বা দেখা দুটি ঘটনা উল্লেখ করো যেখানে তোমার বয়সি শিশুদের শ্রম অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা হয়।

৭. নীচের বিষয়গুলো সম্পর্কে পাঁচ-ছয়টি বাক্য লেখো বা বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করো। (প্রশ্নের মান = ৩)

১. মানুষের চামড়ার গঠন। ২. মানবদেহের বিভিন্ন হাড় ৩. জীবাণু ও ফুসফুসের অসুখ। ৪. ভূমিক্ষয়। ৫. নানা ধরনের জলাশয়। ৬. বৃষ্টির জল ধরে রাখার নানা প্রচলিত পদ্ধতি। ৭. জলাভূমির গুরুত্ব ও সংরক্ষণ। ৮. বিভিন্ন প্রাণীর আকর্ষণীয় আচার-আচরণ। ৯ পরিবেশের নানা পরিবর্তন ও জীবের সংখ্যাহ্রাস। ১০. পশ্চিমবঙ্গের ভূমিরূপের বৈচিত্র্য। ১১. বঙ্গভঙ্গ। ১২. নদীমাতৃক সভ্যতা। ১৩ সুন্দরবনের মানুষদের জীবিকা। ১৪. দক্ষিণবঙ্গের নদী। ১৫. উত্তরবঙ্গের বনভূমি। ১৬. মুর্শিদাবাদ শহরের অতীত কথা। ১৭. হাওড়া শহরের শিল্পের কথা। ১৮. তমলুক ও অতীতদিনের ব্যাবসা-বাণিজ্য। ১৯. শৈলশহর দার্জিলিং ও টয়ট্রেন। ২০. খড়গপুরের রেলস্টেশন। ২১. পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক সম্পদ। ২২. তোমার জানা অলিখিত জ্ঞানের কথা। ২৩. স্মরণীয় সমাজ সংস্কারক। ২৪. সাধারণতন্ত্র দিবস। ২৫. স্বাধীনতা দিবস। ২৬. পরিবেশ দিবস। ২৭. চাষের নানা যন্ত্রপাতি। ২৮. পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক ফসল। ২৯. লুপ্তপ্রায় মাছ। ৩০. বনের ব্যবহার। ৩১. বন সমীক্ষা। ৩২. তোমার জানা লুপ্তপ্রায় প্রাণী। ৩৩. বাঘের সংখ্যাহ্রাস ও সংরক্ষণ। ৩৪. কয়লা সৃষ্টির আদি কথা। ৩৫. পশ্চিমবঙ্গের কয়লাখনি ও কয়লার উত্তোলন। ৩৬. প্রচলিত জ্বালানি ও তার ভবিষ্যৎ। ৩৭. বিকল্প শক্তি ও তার ব্যবহার। ৩৮. নানা ধরনের জলযান। ৩৯. ট্রেন চলাচলের আদি কথা। ৪০. নানাধরনের বৈষম্য। ৪১. আয়লা ও সুন্দরবনের সমস্যা। ৪২. ভূমিকম্প ও সাবধানতা। ৪৩. শিশুশ্রমের নানা ক্ষতিকারক প্রভাব সমূহ। ৪৪. সমাজের নানা ধরনের লিঙ্গবৈষম্য। ৪৫.বার্ধক্যের সমস্যা ও তোমার ভূমিকা। ৪৬. লিঙ্গবৈষম্য ও বাল্যবিবাহ রোধে তোমার ভূমিকা।

শিখন পরামর্শ

মুখবন্ধ

স্বাগত, বন্ধুরা। আসুন, আমরা সবাই মিলে শিশুদের বৃহত্তর পরিবেশ চেতনা গড়ে তোলার চেষ্টা করি।

যে পরিবেশে শিশু বড়ো হয়ে উঠছে সেই পরিবেশই তার শিক্ষার প্রাথমিক ও মৌলিক ভিত্তি। সেই পরিবেশ সম্পর্কে তার আরও ভালো বোধ গড়ে ওঠা দরকার। পাশাপাশি যথার্থ সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলায় নিজেদের যৌথভূমিকা সম্পর্কে প্রত্যেকের নিজস্ব বিচার-বিবেচনা গঠন ও বিকাশ আবশ্যক। তবেই সে ভৌত ও জৈব পরিবেশ যথাযথ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ গড়ে তুলতে পারবে।

শিশু পাঠক্রমের প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ-শিক্ষার তৃতীয় ধাপে পৌঁছেছে। তার পরিবেশ চর্চা ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যশিক্ষা ইত্যাদি বিষয় খণ্ডিত না হয়ে সমগ্রতার সূত্রে গাঁথা থাকবে এই ধাপ পর্যন্তই। বিষয় নিরপেক্ষভাবে কৌতূহল মেটাতে মেটাতেই সে যেন ভবিষ্যতের বছরগুলোয় আলাদাভাবে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ চর্চার জন্য প্রস্তুত হয় তার প্রতি লক্ষ রাখাও আমাদের কর্তব্য। তাই তাকে ছোটো ছোটো ও মজার পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও নানা বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ এবং আলোচনার মাধ্যমে সমাজ ও পরিবেশের বিশ্লেষণ শুরু করার উৎসাহ দিতে হবে এখন থেকেই।

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা - ২০০৫ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাভাবনায় উদবুদ্ধ হয়ে আমরা শিশুকে সক্রিয় শিক্ষার্থী বলে মনে করেছি। কথা বলার অধিকার পেলেই তারা চারিপাশের পরিবেশ থেকে আহৃত নানা বিষয়ে তাদের জ্ঞানের কথা বলবে। স্বাধীন চিন্তার পরিসরে নিজেরাই জ্ঞান বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করবে ।

শ্রেণিতে শিশুদের শিক্ষণীয় বিষয়ের বিন্যাস এমনভাবে করা হয়েছে যাতে তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হতে পারে। তাই তাদের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষণীয় বিষয়ের বেশিটাই উপস্থিত সকলের জানা হয়ে যাবে। শিক্ষক/শিক্ষিকা শুধু সজাগ থাকবেন যে তাদের আলোচনা যেন কোথাও আটকে না যায়। তেমন সম্ভাবনা দেখা দিলে তিনি আলোচনাটার একটু সূত্র ধরিয়ে দেবেন মাত্র। এই বইয়ের প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় একজন শিক্ষক/ শিক্ষিকা সেই ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের ভূমিকাটা দেখে নিলেই সমগ্র আদলটা স্পষ্ট হবে।

শিশুকেন্দ্রিক ও শিশুবান্ধব শিক্ষার এই ধারায় আমরা অভ্যস্ত হলেই শ্রেণিকক্ষে শিশুর মন ভয়শূন্য হবে। স্বশিখন (Self learning)-এর দিকে এগিয়ে যাবে প্রতিটি শিশু। এভাবে নতুন দিগন্ত খুঁজে নেবে শিশুর শিক্ষা।

নিজের শরীরের ত্বক থেকে বৃহত্তর পরিণত পরিবেশ-চেতনায় উত্তরণ

মানুষের ত্বক নিয়ে গল্প শুরু হয়েছে বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠায়। সেখান থেকেই পদে পদে শিশুরা আবিষ্কার করবে, তাদেরই কেউ না কেউ, নানা বিষয়, সম্পর্কে কত জানে। নখ টিপে, চিমটি ধরে এমন করে নতুন নতুন জ্ঞানের সন্ধান তাদের উদবুদ্ধ করবে। মানুষের শরীরের চামড়া কতটা পুরু, নখের কী ভূমিকা, শরীরে কতগুলো হাড় থাকতে পারে এসব বিষয়ে। নিজেরা সন্ধান করার সুযোগ পেলে **শিশুরা** সে সুযোগ কাজে লাগাবে বলেই মনে হয়।

আমাদের কী বুঝতে হবে? নিজেদের শরীরের হাড় গুনে দেখার চেষ্টা করে যদি কেউ বুঝতে পারে যে শরীরে হাড়ের সংখ্যা ১৫০ থেকে ২৫০-এর মধ্যে তাহলে তার সেই বোধ, শরীরে ২০৬টা হাড় আছে— এই মুখস্থবিদ্যার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

বইয়ের প্রথম ১৮ পৃষ্ঠায় মানুষের ত্বক, নখ, চুল-লোম, হৃৎপিণ্ড, রক্ত, অস্থি-অস্থিসন্ধি, মাংসপেশি আর জীবাণুঘটিত রোগের সন্ধান করার সময় পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ ও দলগত আলোচনা শুরু হয়ে যেতে পারে পুরোদমে। আপনি (শিক্ষক/ শিক্ষিকা)পাশে থাকবেন আলোচনার হাল ধরে থাকবেন। যদিও সরল ভাষায় বই লেখার চেষ্টা করা হয়েছে, তবুও যারা ভালোমতো পড়তে শেখেনি তাদের একটু অসুবিধে হবে। সেখানে আপনি সাহায্য করবেন। বইয়ের নানা চরিত্রে তাদের অভিনয় করার সুযোগ করে দেবেন। ক্রমে তারা প্রথমে কথা বলায় ও কিছু পরে পড়ায় সাবলীল হয়ে উঠবে।

আর একটা কথা। প্রসঙ্গত এখানে যক্ষ্মার জীবাণু ও চিকিৎসার ইতিহাস বিষয়ে কিছু কথা আছে। শিশুরা উৎসাহিত হয়ে কলেরা বা অন্য অসুখ নিয়ে জানতে চাইলে তাদের হতাশ করবেন না। গ্রন্থাগারে বা ইনটারনেটে এসব বিষয়ে তথ্য অতি সুলভ। দেখে বলে দেবেন। জানিয়ে দেবেন যে আপনি দেখে নিয়েই বললেন। নানা তথ্য মুখস্থ রাখাটা শিক্ষা নয়। প্রয়োজন মোতাবেক তথ্য

সংগ্রহ করার শিক্ষা এখান থেকেই শুরু হোক।

১৯ থেকে ২৭ পৃষ্ঠায় আলোচ্য বিষয় মাটি। বিভিন্ন ধরনের মাটি, মাটির যত্ন, ফসল, ভূমিক্ষয় প্রভৃতি অংশে আলোচনা এগিয়েছে। আগের অধ্যায়ে যদি সংকোচে ও জড়তার বাঁধ ভেঙে থাকে তবে বইয়ের গন্ডি ছাড়িয়ে নানা স্বাধীন উদ্যোগ নেবে ছাত্রছাত্রীরা। আপনি উদ্যোগ নেবেন তাদের সংকোচ কাটানোর।

মাটি প্রসঙ্গে আলোচনায় এখানে একটু সিমেন্টের ইতিহাস এসেছে। নানা অঞ্চলের মাটির কথাও একটু এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমিরূপের বিষয় পরে আছে। তবে সারের ইতিহাস জানতে চাইলে আবার একটু গ্রন্থাগারে বা ইনটারনেটে দেখে নেবেন। শহরের ছাত্রছাত্রীরা ধান চাষ বিষয়ে হয়তো জানে না। জানতে চাইলে আপনি হতোদ্যম করবেন না। নিজে জেনে নিয়ে একটু ভালো করে বোঝাবেন।

২৮ থেকে ৪৫ পৃষ্ঠায় জলের আলোচনার প্রথম দিকেই জলাশয় মানচিত্রের কথা আছে। একটা জায়গার বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্য মানচিত্র বিষয়ক ধারণা খুব দরকার। এই ধারণা শুধু পরিবেশ-চর্চা নয়, পরে ভূগোল ও ইতিহাস-চর্চাকে অনেক সহজ, আনন্দময় ও প্রাণবন্ত করবে। যারা ২০১২ সাল পর্যন্ত 'পুরোনো ধাঁচে' পড়াশোনা করেছে তারা এবিষয়ে হয়তো সচেতন নয়। ঘরের মানচিত্র, পাড়ার মানচিত্র ইত্যাদি দিয়ে শুরু করে তাদের এই বিষয়ে উৎসাহ দেবেন।

পানের জন্য এবং অন্য বিভিন্ন কারণে জল কত গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা এবং শিশুদের জল ব্যবহারের হদিশ দেওয়ার মাধ্যমে সামাজিকভাবে জল ব্যবহারের বিষয়ে অভ্যাস বদলাতে উৎসাহিত করা বর্তমান পাঠক্রমের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য। অদূর অতীতে যে, পুকুরের জল পান করত মানুষ এই ইতিহাসের কথা বলা হয়েছে। সচেতন না হলে অদূর ভবিষ্যতে পানের জন্য মাটির নীচের জল পাওয়া যাবে না, এটা বোঝানোর জন্যই এসব বলা। আশা, জল বিষয়ে যেসব কাজ দেওয়া আছে সেগুলো করলে একথা তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে। তাই প্রতিটি অংশের শেষে দেওয়া কাজগুলো করায় ও দলগতভাবে অংশ নেওয়ায় তাদের বিশেষ উৎসাহ দেবেন।

জীববৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৪৬ থেকে ৬১ পৃষ্ঠায়। উদ্ভিদ ও প্রাণীদের নিয়ে গড়ে ওঠা জীবজগতের সঙ্গে মানিয়ে মানুষ কীভাবে জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে পারে তা নিয়ে নিরীক্ষা আর আলোচনায় ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দিন। সাপ বা বিশেষ কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ নিয়ে কেউ উৎসাহী হলে তাদের হতাশ করবেন না। শহরের ছাত্রছাত্রীদের দুই-একটা কাজ ওই অঞ্চলের প্রাকৃতিক উপাদানের লভ্যতা বা বৈচিত্র্যের সাযুজ্য অনুসারে বদলে দিতে হলে দেবেন।

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ পরিচয় নিয়ে আলোচনা আছে ৬২ পৃষ্ঠা থেকে ৮৩ পৃষ্ঠায়। মানচিত্রে কীভাবে বিভিন্ন উচ্চতা বোঝানো হয় তা খুব সহজে বোঝার জন্য ৬৩ পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু। গ্রাম-শহর নির্বিশেষে সব ছাত্রছাত্রীদের নিজের কাছাকাছি অঞ্চলের উঁচু-নীচু ভূমিরূপ দেখে মানচিত্র আঁকায় উৎসাহ দিন। প্রয়োজনে সাহায্য করুন। বিভিন্ন অঞ্চলের নদনদী, ভূমিরূপ, বন একসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। তাতে প্রকৃতির এই তিন উপাদান সম্পর্কে বুঝতে সুবিধা হবে। এক্ষেত্রে সম্পর্ক বোঝাটাই দরকার, মুখস্থ করা নয়। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে পুরোনো সভ্যতা বলে স্বীকৃত অঞ্চলের কথাও বলা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গ থেকে প্রত্যেকে তার নিজের কাছাকাছি অঞ্চলের অতীত ইতিহাস খোঁজ করায় উদ্যোগী হলে ভালো। তাদের এবিষয়ে উৎসাহ দিন। শহর বিষয়ের আলোচনাও মুখস্থ করার জন্য নয়। মানচিত্রে জায়গাটা খুঁজুক। সেখান থেকে তার নিজের চেনা জায়গা কত দূরে এসব ভাবুক। এগুলোই বাস্তবসম্মত ও জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা।

পরিবেশ ও সম্পদ বিষয়ে সাধারণ আলোচনা আছে ৮৩ থেকে ৯৭ পৃষ্ঠায়। সম্ভাব্য প্রসঙ্গ ধরে নানারকম গল্প করে বোঝানো হয়েছে যে মানুষের জ্ঞান এবং সংস্কৃতিও সভ্যতার সম্পদ। নানা আলোচনা ও স্থানীয় বিষয়ে খোঁজখবর করে শিশুমনে এসব বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা গড়ে উঠবে। স্থানীয় ইতিহাস সম্পর্কে এসব সন্ধান তার মনে ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক ধারণার জন্ম দেবে। আপনি কর্মপত্রগুলি নিয়ে ভাবায় ও সেগুলি পূরণ করায় তাদের উৎসাহ দিন।

৯৮ থেকে ১১৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কৃষিজ সম্পদের আলোচনায় কৃষির ইতিহাস ও মাছচাষ নিয়ে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা আছে। কিছুটা অনেক দূরের ইতিহাস। কিছুটা অদূর অতীতের ইতিহাস। পাশাপাশি অত্যাধুনিক কৃষি পদ্ধতির কথাও বলা হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই না করে প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া পরিবেশ-চর্চার আধুনিক ও উন্নততর ভাবনা। ইতিহাস-চর্চার

মাধ্যমে অতীত জেনে এই মানিয়ে নিতে শেখার কথা বলতে চাওয়া হয়েছে। এই অংশে মুখ্যত ধানচাষকে কেন্দ্র করেই আলোচনা আবর্তিত করা হয়েছে। এরপর অঞ্চলভিত্তিক বৃষ্টিপাত, নানা কৃষি উৎপাদনের কথা এসেছে। নিজের কাছাকাছি অঞ্চলে কী হয় তা দেখায় উৎসাহিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কর্মপত্রগুলিও সেই অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে। স্থানীয় কৃষিসম্পদ বিষয়কে বিস্তৃতভাবে অথচ সংক্ষেপে বোঝার উপায় ফসল মানচিত্র। এটা বুঝতে পারলে নিজের এলাকার ফসল মানচিত্র তৈরি করায় ছাত্রছাত্রীরা সকলেই উৎসাহ পাবে।

তারপর মাছের কথা। জীববৈচিত্র্য প্রসঙ্গেও মাছের কথা ছিল। তার পরবর্তী ধাপ থেকেই এখানে আলোচনা শুরু করা হয়েছে। কৃষিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার পরিবেশের যে পরিবর্তন করছে তাতে মাছের কী সমস্যা হচ্ছে তা বোঝানো হয়েছে। যারা উৎসাহী তাদের আরও বোঝাতে পারলে ভালো হয়। মানুষ অনেক আগে থেকেই মাছ ধরত। মাছ ধরার উপকরণ সম্পর্কে আলোচনা সেই ইতিহাস বিষয়ে ধারণা দেবে। এখন অন্য সব প্রাণী শিকার করা আইনবিরুদ্ধ। কেবলমাত্র মাছ শিকার করারই অনুমতি আছে। সেই অনুমতির অপব্যবহার করা উচিত নয়। এটা বোঝা দরকার। তাই মাছ নিয়ে এত কথা।

এরপর ১২০ থেকে ১২৮ পৃষ্ঠায় বন, বনজ সম্পদ এবং বন্য পশু নিয়ে সাধারণ আলোচনা। সুস্থ পরিবেশের জন্য যতটা বন দরকার আমাদের রাজ্যে বনের পরিমাণ তার অর্ধেকেরও কম। কিন্তু কাছাকাছি অন্য জায়গায় বন আছে বলেই আমরা সবাই মারাত্মক শ্বাসকষ্টে ভুগি না। শহুরে সভ্যতার দিকে অবিবেচকভাবে ছুটে যাওয়ার ফলে এই সমস্যা হয়েছে। ছোটোবেলা থেকেই শিক্ষার্থীদের এই সমস্যা উপলব্ধি করা দরকার। এই লক্ষ্যে তাদের যাতে বন সম্পর্কে আগ্রহ গড়ে ওঠে তেমন করে এই অংশটি নির্মিত হয়েছে। আপনি উৎসাহ দিলে তারা বন দেখতে যাবে। বনের ইতিহাস জানবে। তাদের মনে বন সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে।

১২৯ থেকে ১৩৫ পৃষ্ঠায় খনিজ সম্পদ ও শক্তিসম্পদ নিয়ে আলোচনা। কয়লাকে উদাহরণ হিসাবে নিয়ে খনিজ বিষয়ে শিশুর যথাসম্ভব স্পষ্ট ধারণা গঠন করার চেষ্টা হয়েছে। দেখবেন বইয়ের ছাত্রছাত্রীদের কথোপকথন পড়ার পর কেমন করে কয়লা তৈরি হয়ে থাকতে পারে সেবিষয়ে শিশুরা ভাবার উদ্যম পাবে। আপনি চেষ্টা করবেন তাদের প্রাসঙ্গিক কৌতূহল মেটাতে। প্রয়োজনে আপনি নিজেও একটু ওয়াকিবহাল থাকবেন। খনি থেকে কয়লা তোলার ফলে পরিবেশের কী সমস্যা হতে পারে তা বুঝতে না পারলে টেকসই উন্নতির (Sustainable development) ধারণা গঠন সম্ভব নয়। এবিষয়ে বিশেষভাবে নজর দিয়ে শিক্ষার্থীদের শেখায় সাহায্য করবেন। অধিকাংশ শিশুই কয়লা ব্যবহারের ফলে বায়ুদূষণের কথা জানে। এই ধারণা একটু বিস্তৃত করার জন্য কিছু আলোচনা আছে। শক্তির উৎস হিসাবে যেগুলো বেশি প্রচলিত সেগুলো ক্রমে ফুরিয়ে যাবে। তার বদলে সরাসরি সৌর ও অন্যান্য অপ্রচলিত শক্তি ব্যবহার বিষয়ে একটা প্রাথমিক ধারণা গড়া দরকার। এবিষয়ে এখানে আলোচনা সীমিত। প্রয়োজনে আপনি প্রসঙ্গ ধরে আরও গল্প করবেন।

এরপর ১৩৬ থেকে ১৪৮ পৃষ্ঠায় যানবাহন। যানবাহনের ইতিহাস ও বর্তমান নিয়ে আলোচনা সংক্ষিপ্ত রাখা হয়েছে। আপনি কথোপকথনের মাধ্যমে সেই আলোচনা আরও বাড়িয়ে নিয়ে গেলে খুব ভালো হয়। বর্তমানে যানবাহন প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রে পরিবহণ মাধ্যমের মানচিত্র দেখানো হয়েছে। আপনি সাহায্য করলে নিজেদের কাছাকাছি অঞ্চলের পরিবহণ মানচিত্র আঁকায় শিশুরা উৎসাহী হবে। এভাবে মানচিত্র গঠন ও ব্যবহারে তাদের দক্ষতা বাড়বে। পরবর্তী পর্যায়ের বিষয়ভিত্তিক পরিবেশ শিক্ষার মান উঁচু করার বনিয়াদ গড়ে উঠবে। ভবিষ্যতে পরিবেশ-বান্ধব পরিবহন ছাড়া টেকসই উন্নতি হতে পারে না। এই ধারণা গঠনে আপনি আরও অনেক আলোচনা করার সুযোগ পাবেন।

১৪৯ থেকে ১৫৮ পৃষ্ঠায় সুস্থ সামাজিক পরিবেশ, শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য, স্বাস্থ্যসচেতনতা, বৈষম্য ও সমতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়গুলো সংক্ষেপে এসেছে। এসব বিষয়ে এই বয়সে প্রাথমিক ধারণা জন্মানো সম্ভব এবং দরকার। একথা মনে রেখে এই অংশের অবতারণা। আপনিও সেভাবেই দেখবেন এই অংশটাকে।

১৫৯ থেকে ১৭১ পৃষ্ঠায় আকাশ ও পরিবেশ অধ্যায়ে এসেছে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ, জোয়ারভাটা, সূর্য ও নক্ষত্রদের নিয়ে আলোচনা। সব আলোচনাই একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত গেছে। বিশেষত, জোয়ারভাটার আলোচনা। এনিয়ে এর বেশি আলোচনা এই পর্যায়ে সম্ভব নয়। অন্য বিষয়ে যদি কেউ আরো জানতে চায়, যতদূর সম্ভব কথোপকথনের ভিত্তিতে এগিয়ে যাবেন।

সবশেষে ১৭২ পৃষ্ঠা থেকে ১৮৩ পৃষ্ঠায় মানবাধিকার ও মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যদিও এই বিষয়ের শিক্ষা পুরো বইতেই নানা স্তরে বিন্যস্ত রয়েছে, বিভিন্ন পাঠ-এককে তা অঙ্গীভূত আছে। তবু শিশুর অধিকার ও দায়িত্ব নিয়ে আলাদাভাবে আবার আলোচনা করা হয়েছে বইয়ের শেষ ছয় পৃষ্ঠায়। বিভিন্ন আর্থিক ও সামাজিক অবস্থায় শিশুরা আছে। একেকজন একেকভাবে এইসব সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে চলেছে । যার যেটা নিজস্ব অভিজ্ঞতা সেটা নিয়েই সে বেশি ভাববে ও বুঝবে। শিশুর অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক সেই ভাবনাকেই আমরা সম্মান জানাব। সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি নতুন দায়বদ্ধতা নিয়ে শিখনের পরবর্তী ধাপে উত্তীর্ণ হবে, শিশু এই আশা প্রকাশিত হয়েছে। তারপর নতুন পরিবেশ আর সমাজ ভাবনায় উদ্দীপিত শিশুর আনন্দ-উচ্ছ্বাসের চিত্র দিয়ে শেষ হয়েছে বই।

উপসংহার

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা- ২০০৫-এ জীবনকেন্দ্রিক, শিশুকেন্দ্রিক ও শিশুবান্ধব শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানগঠনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে আনন্দময় সম্পর্ক স্থাপন করে তাড়নাহীন ও পীড়নহীন শিক্ষার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই বইয়ের পথ চলা।

চারপাশের পরিবেশ থেকে যে ধারণা নিয়ে শিশুরা বিদ্যালয়ে আসে তা থেকে জ্ঞানগঠন হতে গেলে সবচেয়ে বেশি দরকার কার্যকর প্রশ্নোত্তর। শিশু যদি তার ধারণা প্রকাশ করার জন্য আন্তরিকভাবে আগ্রহী ও মনোযোগী হয় এবং নির্ভয়ে কথা বলতে পারে তবেই সে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে উপযুক্ত প্রশ্ন করতে পারবে। বন্ধুদের প্রশ্নের সামনে নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য ধারণা প্রকাশ করতে পারবে। এই বইতে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করা ও উত্তর দেওয়ার যে অসংখ্য নমুনা সে পাবে তাতে এই বিষয়ে তার দক্ষতা বাড়বে।

প্রাথমিকভাবে কারো একথা মনে হতে পারে যে পাঠ্যবইতে প্রশ্নোত্তর মাধ্যমে আলোচনা করায় অনেক বেশি কথা আসছে। সরাসরি বিষয়ের ঘনীভূত সারাৎসার লিখে দিলে কম পড়ে বেশি শেখা হতো। কিন্তু সেকথা সত্য হলে এতদিনে অনেক ভালো শিক্ষা হতো। শিশুরা ওইধরনের সারাৎসার কেবল মুখস্থ করতে পারে। বিশেষ কিছু শিখতে পারে না। খুব ভালো নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও এর ব্যতিক্রম কমই।

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা - ২০০৫-এ একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো ঃ শিক্ষার্থীর বিষয়কে পাঠ্যপুস্তকের সীমার মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ না রাখা। তার জন্য প্রয়োজন হল অনুসন্ধান। সেই সন্ধানই তাকে উৎসাহ দেবে বইয়ের বাইরের জগতে গিয়ে খুঁজতে।

এই বিষয়টা বিশেষভাবে মনে রেখে এই বইয়ের পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ করায় শিশুদের নানাভাবে উৎসাহিত করার চেষ্টা হয়েছে। আমাদের আশা বিষয়ের সমগ্রতা, তত্ত্ব ও কাজের মেলবন্ধন, খোলামেলা গল্পের আবহাওয়া শিশুর অনুসন্ধিৎসু মনের উন্নয়ন ঘটাবে। আপনারা কাজ করতে গিয়ে সাফল্য পাবেন এবং আরও উৎসাহিত হবেন।

প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে আনন্দময় সম্পর্ক স্থাপন করে তাড়নাহীন, পীড়নহীন শিক্ষার দিকে আমরা এগিয়ে যাব, শতবর্ষেরও বেশি আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া দিকদর্শন নিয়ে।

বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় কর্মপত্র রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা ওই কাজগুলো কীভাবে সম্পন্ন করছে আপনি সেগুলি নথিভুক্ত করুন। এবং তার ভিত্তিতে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের অতিরিক্ত এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য করুন। এভাবেই হতে পারে শিক্ষার্থীর নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রিক মূল্যায়ন (CCE)। তবে লক্ষ রাখতে হবে, বই-এ দেওয়া সাল, তারিখ, স্থান/অঞ্চলগুলি মুখস্থ করা থেকে শিক্ষার্থীরা যেন বিরত থাকে।

শিক্ষার্থীদের বিভিন্নরকম পারদর্শিতা বুঝতে প্রতিটি পাঠের পর দেওয়া কর্মপত্র নানাভাবে আপনার কাজে লাগবে। শিশুরা আলোচনায় ও পরীক্ষা করায় কীভাবে অংশ নিচ্ছে দেখবেন। কে কী লিখছে দেখবেন। কারোর লেখা ভুল বলবেন না। তবে যা দেখছেন সে বিষয়ের তথ্য আপনি সংরক্ষণ করবেন। কীভাবে সংরক্ষণ করবেন তা আপনারা ভাবুন। নিজের স্কুলের ও বিভিন্ন প্রতিবেশী স্কুলের সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করুন। প্রথমে পারদর্শিতার কয়েকটি ক্ষেত্র বেছে নিন। সেই বিষয়গুলিতে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণে অভ্যস্ত হওয়ার পর আরো কয়েকটি ক্ষেত্র বেছে নিন। এভাবে আপনাদের পর্যবেক্ষণ সংবলিত যে নথি তৈরি হবে তা শিক্ষার নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।